দলবেঁধে

পঞ্চাশং লেখনীর সরস রচনা

রথযাত্রা
১৩৪৭

চয়নিকা পাবলিশিং হাউস
৭ নবীন কুণ্ডু লেন কলিকাতা

চয়নিকা পাবলিশিং হাউস
৭ নবীন কুণ্ডু লেন থেকে
সনৎকুমার নাগ কর্তৃক
'দলবেঁধে' প্রকাশিত হয়েছে

১০ মদন গোপাল লেনের
এইচ্ এম্ প্রেস থেকে
চন্দ্রমাধব বিশ্বাস কর্তৃক
'দলবেঁধে' মুদ্রিত হয়েছে

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওআলিশ স্ট্রীট

ডি এম্ লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওআলিশ স্ট্রীট
কলিকাতা

দলবেঁধে

দলবেঁধে

সম্পাদনা করেছেন—

অদ্বৈত মল্ল বর্মন
কালিদাস মুখোপাধ্যায়
রাখালদাস চক্রবর্তী
সতীকুমার নাগ

যাঁদের সহায়তায় এই গল্প-সঞ্চয়নে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত করতে পেরেছি, আমরা তাঁদের একান্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এপ্রসংগে চিত্রশিল্পী শ্রীযুত যতীন সাহা, মুদ্রাকর শ্রীযুত চন্দ্রমাধব বিশ্বাস, সুকবি অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ এবং গায়ত্রী পত্রিকার স্বত্বাধি-কারী শ্রীযুত কালিপদ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ না করে পারলুম না

দু' টাকা

পরিচয়

দলবেঁধে

যাঁদের সমবেত লেখনীচালনায়
'দলবেঁধে' সৃষ্টি হলো, তাঁদের
পরস্পর ঐক্য, মৈত্রী ও
মমত্ববোধের স্থায়িত্বের বেদিকায়
'দলবেঁধে'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোক

আলাপন

'দলবেঁধে'র একটু ভূমিকা লেখা দরকার। এর মলাটে অংকিত নাম আর ভিতরে মুদ্রিত পঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে যোগাযোগের সেতু রচনার জন্যে কিছু লেখা দরকার। এই দুইয়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক আছে।

নবজাত শিশু থেকে নবজাগ্রত কংগ্রেস-ভবন পর্যন্ত সবকিছুরই একটা নাম দিতে হয়। এবং এই নামকরণের জন্য কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন হয়। আধুনিক বাংলা গল্পের একখানা সংকলন গ্রন্থ মাত্র প্রকাশের বাসনা গোড়াতে আমাদের মনে জাগে। সংকলন গ্রন্থখানি কেমন আকারের, প্রকারের বা প্রকৃতির হওয়া উচিত, বাংলা কথাসাহিত্যের কোন্ স্তর থেকে এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ গল্পলেখকগোষ্ঠির বিভিন্ন গোত্র বা 'স্কুল' থেকে কোন্ ধারাকে বর্জন আর কোন্ ধারাকে গ্রহণ বিধেয় এসকল প্রশ্ন মীমাংসিত হওয়ার অবকাশ হয় নাই। কারণ গোড়াতে পরিকল্পনা ছিল অব্যাপক—শুধু একখানা গল্প-সংচয়ন-গ্রন্থ প্রকাশ।

'দলবেঁধে' নামকরণের সংগে সংগেই আমাদের পরিকল্পনা ব্যাপকতর ও বিস্তৃততর হয়। এই নামটি যাঁর দেওয়া, শৈশবের খেলা-ঘর তাঁর এখনও সু-সাজানো, চাপল্য ও সারল্য এঁর মনের আনাচে-কানাচে এখনো ক্রিয়াশীল—গংগাফড়িং, প্রজাপতি আর লালঘুড়ির পশ্চাতে এখনো এঁর মন সুদূরলোকে ধাওয়া করে। বয়স এঁর এখনো নয় বছরের এপারে। এঁর শিশুমনের রহস্য-নিংড়ানো নাম-নির্বাচন আমাদের যেন সহসাই পথের সন্ধান দিল। সতত যিনি ফুল, পাখী, ঘুমন্ত রাজকন্যা, অচিন দেশের টিয়াপাখী আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার জগতে, রূপকথার মণিময় জগতে বিচরণ করেন, তাঁর কাছ থেকে আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল, অর্থবাচক ও ভাববোধক নামটি আমরা

ঐশী ইংগিতের মতই নিতে চাই। কারণ যে-মন চিন্তা জানে না, সমালোচনা মানে না, সে-মন থেকে এ নাম স্বতঃ উৎসারিত। মণ্টু খেলাঘর থেকে আমাদের বই-এর যে নাম দিল গাল্পিক জগতের বৈচিত্রময় ব্যঞ্জনার মাঝে তাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করি। এজন্য মণ্টুকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

জ্ঞানের দুরধিগম্য বন্ধুর পথে চশমা-চোখে যাদের আনাগোনা, চিন্তাধারার প্রবীণতা যাদের বর্ণাঢ্য সহজের গায়ে ভাবের উৎকর্ষের বদলে অর্থোৎকর্ষের জটিলতার সৃষ্টি করে, এই নামকরণে তাঁদের গাম্ভীর্যের অভাব আবিষ্কারে আমাদের বেদনাবোধের অবকাশ কই? সাহিত্যজগৎ আর চিন্তাজগৎ দুই আলাদা জিনিষ। চিন্তা সর্বদাই সমালোচনার সংগে বিজড়িত। কোন কিছুর চিন্তা করা মানেই সেই জিনিষের এপিঠ-ওপিঠ, তলদেশ ও বহির্দেশ ভালোমন্দের বেড়াজালে জড়ানো-পাকানো ভাবে দেখা। গল্পের জগতে এর প্রাথমিক পর্বের প্রবেশ নিষেধ। এজন্য প্রবন্ধলেখক আর গল্পকথক। সংসারে জোড়াতালিকে প্রত্যক্ষভাবে সূচের ফুঁড়ে রিপু করাকে লোকে সমালোচকের কাজ মনে করে। গল্পকথকের বর্ণিত গল্পের রাজ্যে সে কখনো কখনো সূঁচ চালায়। সে অধিকারও তার আছে। কিন্তু গল্পকথকের সূঁচ-চালনার বালাই থাকা নিষ্প্রয়োজন। মানব-মনের সহজ অনুকরণ সহজ কথায় বলাই তার কাজ। শুধু মানব নয় লৌকিক ও অলৌকিক জগতের শরীরী অশরীরী প্রাণী ও অপ্রাণী সহ তার কারবার। তুচ্ছ জড় পদার্থের অবচেতনাকেও তার রূপ দিতে হয়। চিন্তারাজ্যের কুশলী শীলগণ মরণশীল নর-জগতের বিভিন্ন দেশ ও জাতির কয়েকটি স্থবীর ও গতিশীল ভাষা শিক্ষার দ্বারা, বিবিধ শব্দ ও বাক্য বিন্যাস দ্বারা কার্য সিদ্ধি করেন। বহুভাষার চিন্তারাজির স্বজাতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট রূপদানও চিন্তা-নায়কগণের কাজের মধ্যে একটি। কিন্তু ভাষার ব্যাপারে বহুভাষাবিদ্

জ্ঞানগর্বী পণ্ডিত অপেক্ষা গল্পকথকের স্থান অনেক উপরে। ইংরাজী, সংস্কৃত, গ্রীক্, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ কিন্তু তার ভাষাবোধের মাপকাঠী নয়। তার কাজ আরও ব্যাপক। পশু পাখী, জড় ও কায়াহীনের নীরব ভাষায় জ্ঞান তাকে হৃদয়ের অনুভূতির বেসাতিতে লাভবান করে। সুখদুঃখ, আশাআকাংখা, হাসিকান্না—মনস্বিগণের (মন যাদের আছে তারাই মনস্বী) অন্তর্লোকের এই ত্রিধারাবিকাশকারী কথাতিনটি বহুশ্রুত, বহুবার বলা ও বহুবার লেখা। কথাতিনটি সকলের কানেই একঘেয়ে বোধ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমানতার বন্দরে দালালী করার জন্য গল্পকথকগণের এই কথাত্রয় দ্বারা স্বাক্ষরিত বিষয়বস্তুই প্রধান উপজীব্য। এতে যা আমাদের বক্তব্য বিষয় তা এই যে, উদ্দিষ্ট বস্তু ঘটনার পুষ্পরথে মনের ক্রমবিকাশপথে চলে—গল্পকথক কথার মধ্যে তাই বলে—আর তা গল্পের পাঠকের মধ্যে আপনা আপনি বিশ্লিষ্ট হয়। পরে হয় তা রসগ্রাহীর রসগ্রহণের বিষয়, বা সমালোচকের সমালোচনার বিষয়।

সাহিত্য চলে সমাজের জীবনের সংগে পাশাপাশি ভাবে। সমাজের জীবন ভাংগে, সমাজের জীবন গড়ে—সাহিত্য কিন্তু সর্বকালেই সৃষ্টিশীল। ভাংগাগড়ার অধীন সমাজের পরিবর্তনকামী স্থিতিস্থাপক সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান থাকে সাহিত্য। কিন্তু এর স্থিতি-স্থাপকতা বিশ্বস্রষ্টার দর্শনগ্রাহ্য প্রকৃতিগ্রন্থের বহুপঠিত অথচ চিরসবুজ পৃষ্ঠাগুলির মত নয়। এ কতকগুলি মংগলময় চিরসত্যের অনুবিকাশ। মনুর রক্ষণশীলতা এখানে ধূল্যবলুণ্ঠিত। কিন্তু দুরাকাংখা হয় হোক, বিশ্বামিত্রের নবসৃষ্টির—ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মত্ব লাভের এবং মর্তবাসীর অমৃতত্বপ্রাপ্তির চিরন্তন প্রেরণার স্থিতি-স্থাপকতা এ।

সাহিত্য কি না করে? বৃদ্ধসমাজকে ভাংগে, অথর্বমনের অন্তঃ-

প্রকোষ্ঠে হানে আঘাত—আনে বিপ্লব, আবার ভাংগা সমাজকে গড়ে—এতসব করার পরও ভাংগাগড়ার ইতিহাস সযত্নে রক্ষা করে বুকে বুকে। সাহিত্য থেকে কথাসাহিত্যকে বাদ দিলে যা থাকে তা গৌণ সাহিত্য। জনগণের মনে এর প্রভাব সুষ্ঠুরূপে অল্প। মানুষ তা পড়ে, ভাবে, কিছু কিছু মনে রাখে, অধিকাংশটুকু ভুলে। ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, ভূবিদ্যা প্রভৃতি কুড়ি বাইশটি বিষয় আছে, যা সাহিত্য সম্মেলনসমূহের কল্যাণে সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। সাহিত্যের এই পরিধি-বিস্তৃতির প্রয়োজন কেবল সভাগৃহে। একান্তে নিভৃতে সাহিত্যচর্চায় এগুলি উপচরিত ফুলরাশির উপর অগোছানো কাঁটার ঝাক্‌ড়া। পণ্ডিতগোষ্ঠির সংরক্ষণীর বাহিরে জনগণের যে সাহিত্য-নারায়ণ, তার বুকে এতসব ভৃগুপদলাঞ্ছনার আভাস দেখি না। আর উক্ত সব বিষয়ের যে-যে অংশ জোরের সহিত সাহিত্য পদবাচ্য, সেগুলি হ্রস্বদীর্ঘ আকারের খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধ মাত্র। ধারাবাহিক সত্তা এমন চীজের থাকা সম্ভব নয়। কালের বুকে জাতির ক্রমবিকাশের যে নিশানা সাহিত্যের একমাত্র সার্থকতা, কথাসাহিত্যে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এককথায় সাহিত্য অর্থে বোঝায় কথা-সাহিত্যকে। আদিম মানব সভ্যতার আভাসপ্রাপ্তির পর যেদিন সাহিত্য সৃজন করে—সে আরম্ভ করে কথাসাহিত্য থেকে। ভারতের গোড়ার সাহিত্য ধর্মসাহিত্য। কিন্তু ধর্মের পটভূমিকায় এ খাঁটী কথাসাহিত্য। বেদ, পুরাণ, দর্শন, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত সবকিছুই যুগোপযোগী কথাসাহিত্য বা কথাচ্ছলে উপদেশ-সাহিত্য। অন্যান্য দেশ সংবন্ধেও একই কথা। গ্রীস রোমের উপকথা, হোমার, সেক্‌সপীয়ার, কালিদাসের গ্রন্থ গদ্য-পদ্যের কথাসাহিত্য ছাড়া আর কী! সমাজজীবনে প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা যদি সাহিত্যের থাকে—তা আছে কেবল কথাসাহিত্যের। রুশিয়ার আবর্তনে কথাসাহিত্যের কতটুকু কাজ তা কারও কি অজানা আছে?

কথাসাহিত্যের সঠিক রূপ গল্প উপন্যাস ও নাটক। এ তিন বস্তুর

মূল বিষয় গল্প। নাটকে স্রষ্টা থাকেন প্রচ্ছন্ন। পাত্রপাত্রীরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলে। উপন্যাসে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বচ্ছ। তারই ইংগিতে তারই গড়া পরিস্থিতিতে সৃষ্ট পাত্রপাত্রীরা কথা বলে—আবার তারা যখন থাকে মূক—তাদের না-বলা কথা বলার সময়ে স্রষ্টার মুখচোখ হয় উজ্জ্বল। উপন্যাস ও নাটকের পার্থক্য সংক্ষেপতঃ এই। আমাদের দেশে নাটক কই? যা আছে তা রংগমঞ্চে কিছু কিছু জমে, কিছুটা রংচং আর কিছুটা নটনটীর নামের জৌলুসে। পাশ্চাত্যের নাট্যসাহিত্যের দেখা এদেশে পাই কি? স্টাডী-রুমে পড়ার নাটক সংবন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার কথা মনে পড়ে। কিন্তু তা জীবনের সংগে সম্পৃক্ত নয়, জীবনাতীতের ঊর্ধাসনে পদ্মাসনগ্রস্ত। নব্যবাংলার কথাসাহিত্যের বাহিরের রূপ উপন্যাস আর ছোট গল্প। এ দুয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা ও পার্থক্য নির্দেশ সংবন্ধে লেখা বক্তৃতা ও বচসার অপ্রতুলতা আছে মনে করি না। এ সংবন্ধে প্রচণ্ড বিতর্কের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা এই—ছোটগল্প, উপন্যাসেরই স্বয়ংপ্রভ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ক্ষুদ্রাবয়বে স্বল্পায়োজিত কাঠামোর আবেষ্টনে গল্পের একটি পরিপূর্ণ বিকাশরূপ বালখিল্য সংস্করণ। বালখিল্য কথাটা তুচ্ছার্থে নয়—আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু প্রকারে সুপক্ক এই অর্থে নিলে বাধিত হই।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে ছোট গল্প ছিল না। দ্বিতীয় যুগে পাই রবীন্দ্রনাথকে। তখন ছোটগল্প তাঁর হাতে প্রথম খেলে। তখন ছোট গল্প যে ধারা নেয় তার চরম রূপ এদের স্রষ্টার হাতেই এরা লাভ করে। এবং আজও এ ধারা ঐখানেই স্তব্ধ অবস্থায় আছে। তখন ছোটগল্পের বিষয়ের প্রাচুর্য ছিল, বর্ণাঢ্য বৈচিত্র ছিল—কিন্তু টেক্‌নিক ছিল না। তৃতীয় যুগে শরৎচন্দ্রের হাতে কিছু কিছু ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সে-সব গল্পের ভাব ছিল, ছিল ভাবের প্রবণতা, ছিল মর্মস্পর্শীতার যাদু—কিন্তু তার গতিপথ ছিল শোচনীয় ভাবে সংকীর্ণ—তার মধ্যে বস্তু ছিল মারাত্মকভাবে অপ্রচুর। ছোটগল্প তখনও পর্যন্ত লেখকারণ্যে বিস্তৃতির যোগ্যতা অর্জনে অসমর্থ।

চতুর্থ যুগের সন্ধিকাল বিরোধ ও বিসংবাদের জনগ্রাহ্যতায় স্মরণীয়। বাংলার সাহিত্যে প্রকৃত ছোটগল্পের তখন থেকেই আরম্ভ। নবীন প্রবীণে তখন যে সংঘাত বাধে আজও তার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে মাথা তোলে। যে দুঃসাহসী দল ছিল তখন সাধনায় তৎপর, তাদের নীরব ও সশ্রদ্ধ উপেক্ষা ছিল রক্ষণশীল প্রতিপক্ষের সহস্রমুখী বিষমাখা তীর ক্ষেপণের অপেক্ষা অনেক বেশী জোরালো। এজন্য এঁদের শ্রদ্ধাপ্রাপ্তির দাবী আজও অমলিন। বাংলার ছোটগল্পে এদের স্থান ও দান অল্পদিনেই স্বীকৃত হয়। এবং শুধু এদের জন্যই ছোটগল্পের আজিকার ব্যাপক চর্চা সম্ভাব্যের মুখ দেখে। এদের পশ্চাতে যে সীমারেখা—তার ওপারে কোন মজবুত পটভূমিকার এতটুকু উজ্জ্বলতা দেখা যায় না। এখানে কৃষ্ণ যবনিকা দিলেও ক্ষতি আছে মনে হয় না।

এই নবীনপ্রবীণের দ্বন্দ্ব সংবন্ধে অনেক কথা বলা এবং অনেক বিষয় লেখা আছে। অনেক সাময়িকপত্রের বস্তাবন্দী ফাইলে আর অনেক পুস্তকের ভূমিকায় তার পরিচয় নিহীত আছে। প্রবীণ কলমের মর্মস্পর্শী খোঁচা সোজা বস্তু ছিল না, তাদের দাবী দিল দেবীর অংগনে দুর্নীতিস্রাবী কোন-কিছু যেন না ঢোকে। অপর পক্ষের দাবী—সত্য যা, শাশ্বত যা, হোক তা নির্মম, হোক তা নগ্ন—তা দৃপ্ত কণ্ঠে না বলা কাপুরুষের কাজ। যা আছে তা না দেখার ভান করা ভণ্ডামী—অস্তিত্বশীল বস্তুকে অস্বীকার করা মিথ্যাচার।

কিন্তু একটা কথা আমরা বুঝি না : নবীন ও প্রবীণের মূলগত পার্থক্যটি কোথায়? প্রাচীনপন্থীদের উপদেশ : কমলবনে পূজারী তোমরা—এখানে শ্লীলতা যেন বজায় থাকে। এ নিয়ে অনন্ত লেখালেখি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ নবীনপন্থী লেখক অশ্লীল সাহিত্য সৃষ্টির ফলে বরণীয়? জনগণের মনে যাদের আসন পাতানো তারা ভাল লেখার জন্যই জনপ্রিয়, অশ্লীল লেখার জন্য নয়। অশ্লীলতার দিকে যাদের ঝোঁক তাদের পাকাহাতের পাকানো সলিতাও নিবন্ত কারণ প্রদীপের

প্রাণবস্ত যে তেল—তাই সাহিত্যের মজ্জা। এ মজ্জা নির্বিকার থাকা পর্যন্ত সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য মারে কে? তবে একথা সত্য যে সর্বকালের সহনশীলতার মাপ সমান নয়। তবু কুরুচি সর্বকালেই কুরুচি, চন্দনের গন্ধ সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত একইরূপ আছে।

বাংলা গল্পের এখন মাঝামাঝি অবস্থা! রাজাজমিদারের জীবন থেকে আজ তার নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে বিস্তৃতিলাভ। সম্মুখে তার কুলীমজুর ও চাষীজীবনের ব্যথার রঙীন আকুতি। কিন্তু আমাদের মনে হয় আপাতত আমাদের সাহিত্যের কুলীমজুর ও চাষীজীবনের ত্রিবেণীসংগমে অধিকতর বিস্তৃতিপ্রাপ্তির প্রয়োজন গৌণ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন পর্যন্তই আপাতত এর সীমারেখা হওয়া বিধেয়। এ জীবনের বহুমুখী বিচিত্র বিকাশের এখনও অনেক কিছুই বাকী। এখন আমাদের লেখা চাষীমজুরজীবনকথা আমরা ভিন্ন পঠনীয় কার? দেশের লোকের সেণ্টপারসেণ্ট অক্ষরজ্ঞান লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রসংগ ধামাচাপা থাক।

যখন স্থির চিত্তে ভাবি, মনে হয়—গত একদশকের মধ্যে বাংলা গল্পসাহিত্যের সংগতিপূর্ণ অংগের অস্বাভাবিক বিস্তৃতিকে অস্বীকার করায় লাভ নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন-প্রসংগে নবীন বাংলা যুবক ভারত প্রভৃতি কথাদ্বারা দশ বিশ ত্রিশ বৎসর কালবিস্তৃতিকে বোঝায় কিন্তু বাংলা গল্পসাহিত্যক্ষেত্রে গত দশ বৎসর পূর্বে বাংলার চেহারা আর আজিকার চেহারা এক নয়। কালের একটি কঠোর নিয়ম আছে। রাজশাসনের শিথিলতা আছে, কিন্তু এ শাসন নির্মম। একদা যারা রাজদণ্ড হাতে নেয় কালগতে তারা উত্তরাধিকারীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চায়—কিন্তু সংগে সংগে আপনাদের প্রতিও জাগে করুণা। একদা যাদের লেখনী চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিত তরুণ রূপে আধুনিক রূপে নবীন রূপে যাদের খ্যাতি ও অখ্যাতি সমানরূপে ছিল বেগবান—সাহিত্যে তাদের সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শন পরবর্তীয়দের শ্রদ্ধার সামগ্রী।

পরবর্তীয়গণ আবার নূতনভাবে প্রস্তুত। বিরোধের আয়ুধ হস্তে নয়, সশ্রদ্ধ সম্মেলনের স্রক্‌চন্দন হস্তে। একদা যাঁরা নবীন ছিলেন আজ তাঁরা কিঞ্চিৎ প্রবীণ—পশ্চাতের দলকে নবীনরূপে গ্রহণ করার পর একথা স্বীকার না করায় সার্থকতা আছে কিছু? আজিকার এই নব-অর্থের নবীনপ্রবীণদের মিলনের একটি চেষ্টা ও সার্থকতা লক্ষ করা যায়। এই চেষ্টাকে কিঞ্চিৎ রূপ দেওয়ার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

'দলবেঁধে'র কলেবরস্ফীতির জন্যই যে এখানে দলবাঁধানো তা নয়। একে যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক করার চেষ্টাও লক্ষ করা যায়।

এখন আমরা যাঁদের প্রবীণ বলি, তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন কয়েকটি 'স্কুল' আছে—এরা স্বকীয়ত্বে সমুজ্জ্বল। শহর ও শহরতলীর জীবন, কয়লাখনির জীবন, নাগরিক জীবন এবং গ্রামের খাঁটি বাস্তবজীবনের রূপ প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, বিভূতিবাবু ও সরোজ রায়চৌধুরীর হাতে কেমন খোলে পাঠকগণের জানা আছে। উপন্যাসে স্থান ও পাত্রের বৈচিত্র ও বিস্তৃতি অন্নদাশঙ্করের বিশিষ্টগুণ। নবগোপাল বাবু, নন্দগোপাল বাবু এবং নিত্যনারায়ণবাবু অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সারল্যের প্রতীক অবনীনাথের স্থান নবীনপ্রবীণ সকলের মাঝে। এঁদের লেখনী-লব্ধ ফলরাজিকে একদিকের প্রতিনিধিরূপে রাখা ও তারপরে অন্যদিকে নবীনগণের মধ্যে থেকে বাছা বাছা সংখ্যাপ্রাচুর্য গ্রহণ করা—তারই প্রচেষ্টা আমাদের 'দলবেঁধে' প্রকাশে রূপায়িত। প্রবীণ দল থেকে নবীনদের পার্থক্য খুব বেশী বোধ হয় না—প্রবীণদের সংগে চলার মত যোগ্য সংগতি নবীনদের একেবারে নগণ্য মনে হয় না, এইটি দেখানোর জন্যেই আমাদের এই চেষ্টা। এই চেষ্টাতে সাহিত্যানুরাগিগণের আন্তরিক সমর্থন আছে—এই বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সংবল।

কলিকাতা

৭ নবীন কুণ্ডু লেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র: জন্ম—উনিশশো চার সাল, ছাত্রজীবন কাশী, কলিকাতা ও ঢাকা। ষোলো-সতেরো বছর বয়সে এঁর প্রথম বই 'পাঁক' প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা'। ছোট গল্প লেখক হিসাবে এঁর বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন। 'বাংলার কথা' ও 'বংগবাণী' দৈনিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং 'সংবাদ', 'নবশক্তি' ও 'রংমশালের' সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে ইনি সিনেমা জগতের সংগে সংশ্লিষ্ট।

সহযাত্রিনী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চলিয়াছি ইণ্টার ক্লাসে। একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে কি একটা পর্ব উপলক্ষে রেলের ভাড়া দেড়ার নীচে বেশ খানিকটা নামিয়াছে। সুতরাং গরমের সংগে অসম্ভবরূপ ভীড় হওয়ায় প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল।

মানুষ শুনি সামাজিক জীব, মানুষের সংগ না হইলে তাহার নাকি চলে না। কিন্তু তখন মানুষের সংগ লাভের জন্য তেমন কিছু ব্যাকুলতা বোধ করিতেছিলাম না, মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহও নয়। বরং মনে হইতেছিল ধরণীর ভার সত্যই বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে, একটা উপায় দরকার।

ঘর্মাক্ত কলেবরে খবরের কাগজখানিকে হাত-পাখা করিয়া গাড়ির অসহ্য উষ্ণ বায়ুকে সঞ্চালিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে যখন সমস্ত মনুষ্য সমাজের বিলোপ সম্বন্ধে এমনি অসামাজিক অভিলাষ পোষণ করিতেছি তখন গৃহিণী কিন্তু অবিচলিত ভাবে পার্শ্ববর্তিনীর সহিত নাতি মৃদু-কণ্ঠে বেশ আলাপ জুড়িয়া দিয়াছেন।

সহযাত্রিনী

গৃহিণী কথা কহিতে একটু বেশী ভালবাসেন। পনেরো বৎসর ধরিয়া তাঁহার সাহচর্য করিয়া সে কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। প্রথম ফুলশয্যার রাত্রি হইতে তাঁহার বাক্য-সুধাবর্ষণের বিরাম কোন দিন হয় নাই। আমার উত্তর দিবার অপেক্ষা না করিয়া পনেরো বৎসর তিনি একাই অবিশ্রান্ত ভাবে আমাদের আলাপ আলোচনা চালাইয়া আসিয়াছেন। আমাকে সামান্য 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়া কমা সেমিকোলন গুলি যোগাইতে হইয়াছে মাত্র। ভাবিয়াছিলাম বয়সের সংগে বাক্যের এ অমিতব্যয়ের ফল ফলিবে, কথার ভাণ্ডার তাঁহার ফুরাইবে। এখনও পর্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ কিন্তু দেখা যায় নাই। যাক সে ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের আলোচনা আর করিব না। আপাততঃ এই অসহ্য অবস্থাতেও তাঁহার বাক্যালাপের উৎসাহ আছে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম।

পার্শ্ববর্তিনীকে দেখি নাই, দেখিবার উপায়ও ছিল না; এই দারুণ গ্রীষ্মের মাঝে আপাদমস্তক সাদা চাদরে মুড়ি দিয়া তিনি যেভাবে আত্মগোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কোন পরিচয় লইবার উপায়ও ছিল না। পনেরো বৎসর ধরিয়া আমি যাহা সহ্য করিয়া আসিতেছি তিনি দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহা কিরূপ উপভোগ করিতেছেন জানিবার কৌতুহল যে একটু না হইতেছিল এমন নয়।

আলাপ অবশ্য একতরফাই হইতেছিল। গৃহিণীর যেটুকু দয়ামায়া আছে অপরের নীরবতা তিনি নিজের কথাতেই পূরণ করিয়া লন। তবু অপরিচিতার দুরবস্থা অনুমান করিয়া একবার মৃদু অনুযোগ করিয়া গৃহিণীকে থামাইবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, "এত বেটা ছেলের ভীড়ের মধ্যে কি যা তা বক্‌বক্ করছ বলত? লজ্জা করেনা?"

আধুনিক শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিতা, শৃংখলিতা ভারত রমণী

ঘোমটার ভিতর হইতে ধমক দিয়া বলিলেন, "বেটা ছেলে ত হয়েছে কি? তাদের সংগেত' কথা কইতে যাইনি।"

অগত্যা চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু বিপদ এবার বাড়িল। অপরের উপর যতক্ষণ অত্যাচার চলিতেছিল ততক্ষণ মনে মনে প্রচুর সহানুভূতি জানাইয়াছিলাম। এবার কিন্তু নিজের উপর উৎপীড়নের উপক্রম হইল এবং দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল ইহার চাইতে আগের ব্যবস্থাই ভালো ছিল।

কুনুইয়ের গুঁতা দিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গৃহিণী চুপি চুপি স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "এই মেয়েটির পাশে যে লোকটা বসে আছে তাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ দিকি!"

সামান্য একটু প্রতিশোধের সুযোগ অবহেলা না করিতে পারিয়া বলিলাম, "তোমাদের পছন্দই আলাদা। লক্ষ্য করবার মত সুপুরুষ বলে'ত মনে হচ্ছে না।"

গায়ে সজোরে চিমটি কাটিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আহা কথার কি ছিরি! আমি কি সুপুরুষ বলে দেখতে বল্লাম। লোকটাকে বদমায়েস বদমায়েস বলে মনে হচ্ছেনা?"

বলিলাম, "বদমায়েস-তত্ত্ব সম্বন্ধেও তোমার চেয়ে জ্ঞান আমার অল্প স্বীকার করতেই হবে। স্কুল কলেজে যা কিছু শিখেছি তার মধ্যে মুখ দেখে বদমায়েস চেনবার কোন বিদ্যা ছিলনা।"

"খুব বক্তৃতাবাগীশ হয়েছ," বলিয়া বিরক্ত হইয়া স্ত্রী তখনকার মত আমায় রেহাই দিয়া আবার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে একটি স্টেশনে গাড়ী থামিলে স্ত্রীর তথাকথিত বদমায়েস লোকটি গাড়ী হইতে নামিয়া এক ঠোংগা খাবার কিনিয়া মেয়েটির হাতে দিল দেখিলাম।

খাবার খাইয়া মুখ ধুইবার জন্য অন্য দিকের জানালায় তাহারা সরিয়া যাওয়া মাত্র সজোরে হাত ধরিয়া টানিয়া স্ত্রী চুপি চুপি যাহা বলিলেন তাহা গাড়ীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়।

"ওগো এইবার ঠিক হয়েছে।"

তাঁহার আকস্মিক ব্যস্ততায় ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "কি ঠিক হয়েছে?"

আমার মূর্খতায় বিরক্ত হইয়া গৃহিণী আরো ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "মেয়েটা ও লোকটার বউ নয়।"

এবার হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "লোকটাও হলফ করে সে কথাত' কখনও বলেনি। গাড়ীতে বউ ছাড়া অন্য আত্মীয়কে সংগে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে কোন আইনও নেই।"

আমার বুদ্ধির স্থূলতায় বোধহয় হতাশ হইয়া গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে ভাণ করিয়া বলিলেন, "না গো না, বদমায়েস লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাচ্ছে।"

আশপাশের সকলে তখন উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদের কথা শুনিতেছে। স্ত্রীর এই কল্পনাতিশয্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "কি যা তা বলছ। পাগল হয়েছ নাকি। ওরা শুনতে পেলে কি মনে করবে।"

আমার পাশে যে স্থূলকায় ভদ্রলোকটি কোমরের উপর হইতে সমস্ত দেহ অনাবৃত করিয়া গরমে এতক্ষণ হাঁস ফাঁস করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ অযাচিত ভাবে আলোচনায় যোগ দিয়া বলিলেন, "না মশাই, ব্যাপারটা শুনুনই না! ওরা যখন আসানসোলে গাড়ীতে উঠল তখনই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।"

সংগে সংগে দেখা গেল আরো অনেকেই পূর্ব হইতে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমার কথা টিকিল না। গৃহিণী আমার কাণে এবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "মেয়েটা যে প্রথমে আমায় বল্লে ও স্বামীর সংগে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। স্বামী বলে এই লোকটাকেই দেখিয়ে দিলে কিনা।"

বলিলাম, "তাহলে ত গোল মিটেই গেল।"

কিন্তু সমবেত সকলের প্রতিবাদে আমার এ সহজ মীমাংসা গেল চাপা পড়িয়া।

স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, "আহা তারপরের কথাই শুনুন না মশাই।"

যাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে তাহারা এখনই আসিয়া পড়িবে ভাবিয়া আমি শংকিত হইয়া উঠিতেছিলাম। সেদিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ী আছে, অথচ শ্বশুরবাড়ী কোথায় জিজ্ঞেস করলে থতমত খেয়ে যায়। একবার বল্লে, 'শ্যামবাজারে আর একবার ভুলে বলে ফেল্লে—'কলকাতা কখনও দেখিনি ভাই, বড় ভয় করছে।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কলকাতায় তোমার শ্বশুর বাড়ী অথচ কলকাতা দেখোনি কি রকম!' তখন আর কোন কথা বলতে পারে না।"

ব্যাপারটা এখন একটু সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হইতেছিল। আমাদের আলোচনার বিষয় বুঝিতে পারিয়া কিনা জানিনা তাহারা আর দূরের জানালা হইতে নড়িবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছিল না।

গৃহিণী বলিতেছিলেন, "শুধু তাই নয়, হাত দুটো কাপড় দিয়ে ঢেকেই রেখেছে, একবার চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, হাতদুটো একেবারে ন্যাড়া, সধবা মেয়েছেলের হাতে একটা নোয়াও থাকে না নাকি!"

সকলেই উৎসুক হইয়া শুনিতেছে জানিয়া গৃহিণীর কণ্ঠ এখন লজ্জায়

সত্যই মৃদু হইয়া আসিয়াছিল। অনেকেই সকল কথা শুনিতে পায় নাই। কিন্তু শুনিতে না পাইলেও লোকটা যে বদমায়েস এবং স্ত্রীলোকটীকে লইয়া যে পলায়ন করিতেছে একথা সকলেই যেন আগে হইতে টের পাইয়াছিল বলিয়া মনে হইল। সামনের এক ভদ্রলোক বলিলেন, "ওকে ধরে এই খানে মার দেওয়া উচিত।"

এ কথাতেও সকলের সায় আছে দেখা গেল।

গৃহিণীর বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই। বলিলেন, "প্রথমে এঁকেও আমার সন্দেহ হয়নি, বাপের বাড়ী কোথায় তাও পর্যন্ত যখন বলতে চাইল না তখনও এতটা বুঝিতে পারিনি। কিন্তু খাওয়ার সময় ঘোমটা একটু ফাঁক করতেই দেখি—সিঁথিতে একটু সিঁদুর পর্যন্ত নেই। লোকটার বদমায়েসের মত চেহারা তোমায় আগেই আমি বলিনি!"

আশেপাশে বদমায়েস লোকটিকে শাস্তি দিবার উপযুক্ত উপায় সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। স্থূলকায় ভদ্রলোক সকলকে থামাইয়া বলিলেন, "আপনারা থামুন আমি মজা করছি দেখুন।"

মজার প্রত্যাশায় সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। গাড়ীর ভিতর কেলেংকারীর সম্ভাবনায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়াও বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ধীর পদক্ষেপে স্থূলকায় ভদ্রলোক আমাদের সকলের বর্তমান আসামীর নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বিচারকের মত জলদ-গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম!"

লোকটা সত্যিই কেমন যেন ভড়কাইয়া গিয়াছিল, বলিল, "আপনার তাতে দরকার?" স্বর রুক্ষ হইলেও তাহার ভিতর যেন ভীতির আভাষ ছিল।

"আহা নাই বা রইল দরকার মশাই, নাম বলতেই বা আপনার এত ভয় কিসের !"

লোকটা নাম বলিল।

"তারপর মশায়ের কোথায় থাকা হয় ?"

লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বলিল, "আপনার কোথা থাকা হয় ?" মুখ চোখ তাহার তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের স্ব-নিযুক্ত প্রতিনিধি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "শ্রীরামপুরে—আপনি ?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটা বলিল, "ইটিলি"। সকলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। হাত নাড়িয়া গাড়ীর মৃদুগুঞ্জন থামাইতে বলিয়া প্রতিনিধি মহাশয় বলিলেন, "কোথা হতে আসা হচ্ছে ?"

লোকটা এবার উগ্রকণ্ঠে বলিল, "আদালতের কাঠগড়ায় ত দাঁড়াইনি মশাই যে আপনার জেরার পর জেরার জবাব দেব।"

"আদালতে শীগ্‌গীরই দাঁড়াতে হবে যে !"

লোকটা রুখিয়া বলিল, "কেন শুনি ! মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই !"

স্থূলকায় ভদ্রলোকের মজা করা আর হইলনা। মারিবার প্রস্তাব যে ভদ্রলোক করিয়াছিলেন তিনি বেঞ্চি হইতে সবেগে লাফ দিয়া উঠিয়া সদর্পে বলিলেন, "চোপরও বদমায়েস, মেয়েমানুষ বার করে নিয়ে পালাচ্ছ আবার তম্বী ! জুতিয়ে মুখ ভেংগে দেব।"

লোকটাও রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কী !"

"কি আবার—ন্যাকা সাজা হচ্ছে ! কি করেছ জাননা !" ভদ্রলোক

মারেন আর কি! গৃহিণী এবার ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিলেন।

লোকটা বলিল, "সাবধান হয়ে কথা বলবেন মশাই। জানেন উনি আমার স্ত্রী!"

"খুব জানি, জানিয়ে দিচ্ছি এই যে!"

নেতৃত্ব যাওয়ায় বিরক্ত হইয়াই স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, "আহা আপনি আবার কথা কইতে এলেন কেন মশাই! দেখছেন আমি ব্যাপারটা বুঝছি।",

বাক্যযুদ্ধের মধ্যে ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিয়া গেল। মারমুখ ভদ্রলোক বলিলেন, "ব্যাপার আর কি বুঝবেন মশাই! এই যে দিচ্ছি আমি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে।"

"কি পুলিশে ধরিয়ে দেবে! এই যে আমি নিজেই যাচ্ছি পুলিশ ডাকতে! ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে ট্রেনের মাঝে অপমান করা বার করচি আপনাদের।"

লোকটা রাগে গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং সংগে সংগে গাড়ীর লোকদের মধ্যে অপূর্ব এক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

স্থূলকায় ভদ্রলোকের মুখ ভয়ে কালো হইয়া উঠিল। যিনি মারিতে গিয়াছিলেন তিনি খানিক হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে নিজের জায়গায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং খানিক বাদে হঠাৎ নিজের পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভাই-ভাইপোগুলোকে অন্য গাড়িতে তুলে ভীড়ের চোটে এ গাড়ীতে উঠে পড়েছিলাম। যাই মশাই একবার দেখে আসি।"

স্থূলকায় ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন,

"যাচ্ছেন কি মশাই! বেশ লোকত আপনি! কেলেংকারী বাধিয়ে এখন চুপি চুপি সরে পড়ছেন।"

"আমি কেলেংকারী বাধিয়েছি কি রকম!"

"তা নয়ত কি আমি বাধিয়েছি! আমি ত ধীরে সুস্থে সব জেনে নিচ্ছিলাম। আপনিই ত একেবারে মারতে উঠলেন মেয়েছেলে বার করে নিয়ে যাচ্ছে বলে।"

"বা বেশ, আপনারাই বল্লেন—ওর স্ত্রী নয়! আপনিই আগে থাকতে সায়েস্তা করতে এগিয়ে গেলেন! দোষ হল আমার?"

আমার স্ত্রীর প্রতি এবার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোক এবার বলিলেন, "স্ত্রী নয়, আমি আগে বলেছি?"

এতক্ষণ কেহই কম আস্ফালন করেন নাই। এখন তাঁহাদেরই একজন পরম বিজ্ঞের মত বলিলেন, "স্ত্রী নিয়ে ভদ্রলোক ট্রেনে যাচ্ছেন। ভালো করে খোঁজ না নিয়ে এত বড় অপবাদ আপনাদের দেওয়া কি উচিত হয়েছে? বেশ বড় রকমের ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন মশাই।"

দুই জনেই গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসি পাইতেছিল, বলিলাম, "ট্রেন ত ছেড়ে দিলে মশাই। তিনি ত এলেন না পুলিশ নিয়ে।"

ভূতপূর্ব প্রতিনিধি উষ্ণস্বরে বলিলেন, "এ স্টেশনে না আসে অন্য স্টেশনে ত আসবে মশাই! আপনাদের জন্যেই এই ফ্যাসাদ।"

হাসিয়া বলিলাম, "আমরা কি ভদ্রলোককে মারতে যেতে বলেছিলাম?"

"আপনারাই ত কথা তুললেন!"

"তা হতে পারে। কিন্তু তখনত শুনছিলাম। সন্দেহ আপনাদেরও আগে থাকতে হয়েছিল।"

'আমাদের? কখনো না। স্ত্রী কি না, আমরা কেমন করে জানব মশাই।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পরের স্টেশনেও লোকটির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল এবং খানিক বাদে বিস্মিত হইয়া দেখিলাম অপরিচিতা মেয়েটি কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এ মন্দ বিপদ নয়। স্ত্রীকে বলিলাম; "ওঁকে ওঁর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস কর। "ওঁর স্বামী হয়ত ট্রেনে উঠতে পারেন নি। যদি তিনি কোন টেলিগ্রাম না করেন, আমরা তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি তাঁরা স্টেশনে এসে নামিয়ে নেবেন।"

গৃহিণীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। কথাগুলি জোরেই বলিয়াছিলাম। মেয়েটি তাহা শুনিবার পর আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে একটা সন্দেহ জাগায় সচকিত হইয়া বলিলাম, "লোকটা চালাকি করে সরে পড়লনা ত!"

সেই সন্দেহই বোধহয় মেয়েটির মনে জাগিয়াছিল, সে আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আশপাশের লোকরা বিপদের সম্ভাবনা হইতে উদ্ধার পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন মনে হইল।

বলিলাম, "লোকটাকে ত তাড়ালেন, এখন মেয়েটির উপায়!"

ফ্যাসাদের আশঙ্কা কাটিয়া যাওয়ায় সাহস সকলের ফিরিয়া আসিয়াছিল। যিনি গারিতে উঠিয়াছিলেন তিনি উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "তাড়াবে নাত কি, একাজে সাহায্য করতে বলেন নাকি আপনি!"

"না, তাড়িয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু মেয়েটিরও ত একটা উপায় করা দরকার।"

কোন দিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক বিবেককে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আর তাঁহাদের দায় কিসের?

স্থূলকায় ভদ্রলোক তাঁহার জিনিষ পত্র গুছাইতে সুরু করিয়াছেন শ্রীরামপুরে তাঁহাকে নামিতে হইবে। মোট ঘাট দরজার কাছে আগাইয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন, "উপায় আমরা কি করব। আমাদের কি উপায় জিজ্ঞেস করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল!"

কারা-বাসর

লীলাময় দে

লীলাময় দে: প্রকৃত নাম প্রফুল্লকুমার দে। জন্ম—উনিশশো আট, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে। পৈতৃক বাস বিক্রমপুর শেথরনগর গ্রাম। ছাত্রজীবন—সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, বহরমপুর। এঁর প্রথম রচিত কবিতার বই—'অভিযান' এবং গল্পগ্রন্থ—'অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা'। ছোট গল্প লেখায় এঁর পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের রিটায়ার্ড জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নিশীথ মজুমদারের ছোট মেয়ে চিত্রা অনার্সের পড়াটা বুঝিয়ে নেবার পর অবসর সময়ে প্রাইভেট টিউটার দীপায়নকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দীপায়নদা, বাংলাকে আপনি খুব ভালবাসেন না?

দীপায়ন রায় বাংলা দেশের একজন উদীয়মান বিদ্রোহী কবি, আবার এম-এ. ক্লাসের ছাত্রও সে।

উত্তরে দীপায়ন হেসে বলল—বাংলার মাটিতে যার জন্ম, বাংলার জল-বায়ু সযত্নে যার দেহকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে, শ্যামল সৌন্দর্যে নয়নের তৃপ্তি সাধন করেছে, সে হতভাগ্য বাংলাকে ভালবাসবে না ত আর কা'কে ভাল-বাসবে চিত্রা?

—কেন, সমস্ত ভারতবর্ষকে? শুধু বাংলাকে ভালবাসলে ত' আর সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালবাসা যায় না?

উত্তরে দীপায়ন বলল—কে বলল যায় না? হ্যাঁ চিত্রা, শুধু বাংলাকে ভালবাসলেই সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালবাসা যায়। বাংলাকে কেন্দ্র করেই ভারতের জাগরণ।

চিত্রা জিজ্ঞেস করল—কেমন করে দীপায়নদা?

—জান না চিত্রা, বাংলা প্রথম হারিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা, বাংলাই দেখে প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন আর বাংলাই পারবে তার বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করতে। আজ বাংলার তরুণ ভুলে গিয়েছে তার স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর স্নিগ্ধ কোল, ভুলে গিয়েছে ঘরের মায়া, ভুলেছে আত্মীয় স্বজনের স্নেহের ছায়া। দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে বন্দীশালার কঠিন বন্ধন।

চিত্রা বলল—তাতে ত, কোন লাভ হয়নি দীপায়নদা?

দীপায়ন বলল—তুমি ভুল বুঝছ চিত্রা, কোন লাভের আশায়, কোন স্বার্থের সন্ধানে তারা বন্দীশালাকে ভালবাসেনি—তারা ভালবেসেছে, শুধু বাংলাকে নিদারুণ কলংকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।

চিত্রা বলল—বাংলার গায়ে এমন কি কালী পড়েছে যে, তা মোছাবার জন্য বাংলার তরুণদলকে বন্দীশালা বরণ করে মরণের পথে ছুটে যেতে হবে?

দীপায়ন একটু উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল—তুমি জান না চিত্রা, সমস্ত ভারতবর্ষ যে এ পরাধীনতার জন্য একমাত্র বাংলাকেই দায়ী করছে। সকলে কি বলে জান? সকলে বলে বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর বাঙ্গালী ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বাধীনতা খুইয়ে বসে আছে। আজ তাইত বাংলার প্রতিঘর থেকে মায়ের কোল খালি করে গর্ভধারিণীর বুকে হাহাকার তুলে আশার প্রদীপ বাংলার তরুণ দল সুদূর পশ্চিমের বন্দীশালায় বন্দী হ'য়ে তিলে তিলে নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। দীপায়ন চুপ করল। চুপ করে ভাবতে লাগল চিত্রার সাথে এসব আলোচনা করা কি ভাল হচ্ছে। মনের ভাবনা মুখে ফুটে উঠে মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। চিত্রা তা লক্ষ্য না করে আপন মনে নখ খুঁটতে খুঁটতে মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করল—তবে আপনি বিলেত

কারা-বাসর

লীলাময় দে

লীলাময় দে: প্রকৃত নাম প্রফুল্লকুমার দে। জন্ম—উনিশশো আট, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে। পৈতৃক বাস বিক্রমপুর শেথরনগর গ্রাম। ছাত্রজীবন—সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, বহরমপুর। এঁর প্রথম রচিত কবিতার বই—'অভিযান' এবং গল্পগ্রন্থ—'অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা'। ছোট গল্প লেখায় এঁর পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের রিটায়ার্ড জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নিশীথ মজুনদারের ছোট মেয়ে চিত্রা অনার্সের পড়াটা বুঝিয়ে নেবার পর অবসর সময়ে প্রাইভেট টিউটার দীপায়নকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দীপায়নদা, বাংলাকে আপনি খুব ভালবাসেন না?

দীপায়ন রায় বাংলা দেশের একজন উদীয়মান বিদ্রোহী কবি, আবার এম-এ. ক্লাসের ছাত্রও সে।

উত্তরে দীপায়ন হেসে বলল—বাংলার মাটিতে যার জন্ম, বাংলার জল-বায়ু সযত্নে যার দেহকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে, শ্যামল. সৌন্দর্যে নয়নের তৃপ্তি সাধন করেছে, সে হতভাগ্য বাংলাকে ভালবাসবে না ত আর কা'কে ভাল-বাসবে চিত্রা?

—কেন, সমস্ত ভারতবর্ষকে? শুধু বাংলাকে ভালবাসলে ত' আর সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালবাসা যায় না?

উত্তরে দীপায়ন বলল—কে বলল যায় না? হ্যাঁ চিত্রা, শুধু বাংলাকে ভালবাসলেই সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালবাসা যায়। বাংলাকে কেন্দ্র করেই ভারতের জাগরণ।

চিত্রা জিজ্ঞেস করল—কেমন করে দীপায়নদা?

—জান না চিত্রা, বাংলা প্রথম হারিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা, বাংলাই দেখে প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন আর বাংলাই পারবে তার বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করতে। আজ বাংলার তরুণ ভুলে গিয়েছে তার স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর স্নিগ্ধ কোল, ভুলে গিয়েছে ঘরের মায়া, ভুলেছে আত্মীয় স্বজনের স্নেহের ছায়া। দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে বন্দীশালার কঠিন বন্ধন।

চিত্রা বলল—তাতে ত, কোন লাভ হয়নি দীপায়নদা?

দীপায়ন বলল—তুমি ভুল বুঝছ চিত্রা, কোন লাভের আশায়, কোন স্বার্থের সন্ধানে তারা বন্দীশালাকে ভালবাসেনি—তারা ভালবেসেছে, শুধু বাংলাকে নিদারুণ কলংকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।

চিত্রা বলল—বাংলার গায়ে এমন কি কালী পড়েছে যে, তা মোছাবার জন্য বাংলার তরুণদলকে বন্দীশালা বরণ করে মরণের পথে ছুটে যেতে হবে?

দীপায়ন একটু উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল—তুমি জান না চিত্রা, সমস্ত ভারতবর্ষ যে এ পরাধীনতার জন্য একমাত্র বাংলাকেই দায়ী করছে। সকলে কি বলে জান? সকলে বলে বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর বাঙ্গালী ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বাধীনতা খুইয়ে বসে আছে। আজ তাইত বাংলার প্রতিঘর থেকে মায়ের কোল খালি করে গর্ভধারিণীর বুকে হাহাকার তুলে আশার প্রদীপ বাংলার তরুণ দল সুদূর পশ্চিমের বন্দীশালায় বন্দী হ'য়ে তিলে তিলে নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। দীপায়ন চুপ করল। চুপ করে ভাবতে লাগল চিত্রার সাথে এসব আলোচনা করা কি ভাল হচ্ছে। মনের ভাবনা মুখে ফুটে উঠে মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। চিত্রা তা লক্ষ্য না করে আপন মনে নখ খুঁটতে খুঁটতে মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করল—তবে আপনি বিলেত

যাবার স্বপ্ন দেখেন কেন? বলে মুখ তুলে চাইতেই দীপায়নকে কুঞ্চিত ললাটে ভাবতে দেখে চিত্রা ব্যস্ততার সাথে জিজ্ঞেস করল—একি দীপায়নদা, আপনি কি ভাবছেন বলুন ত?

চিত্রার ডাকে দীপায়ন সজাগ হয়ে উঠে বসে ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে বলল—ও কিছু না!—হ্যা, তুমি কি জিজ্ঞেস করলে না?

চিত্রা বলল—জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাহ'লে বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখেন কেন?

দীপায়ন প্রসন্ন আননে উত্তর দিল—ও, এই কথা! তা সে কথার উত্তর ত' তোমার বাবাই একদিন তোমায় দিয়েছেন চিত্রা? পরাধীনতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে হাড়ে ঘুন ধরে গিয়েছে তারই চিকিৎসায়। স্বাধীন দেশের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে সতেজ হ'য়ে আসতে চাই।

চিত্রা আবদারের সুরে বলল—তাহ'লে আমিও আপনার সাথে বিলেত যাব দীপায়নদা?

দীপায়ন হেসে উত্তর দিল—বেশ ত তোমার বাবা যদি অনুমতি দেন যেও। এখন সমুখিন বিপদ থেকে ত' আগে উদ্ধার হওয়া যাক্। তা না হলে বিলেত যাবার মুখ তোমারও থাকবে না আমারও না। এসো অনেকখন গল্প করা গেছে, এবার বই নিয়ে বসা যাক্।

চিত্রা আবদার করে বলল—না দীপায়নদা, আজ আর পড়াশুনো করতে ইচ্ছে করছে না। আজ শুধু আপনার সাথে গল্প করতে ইচ্ছে করছে—এই সব গল্প।

দীপায়ন গম্ভীর হয়ে বলল—জান, তুমি একজন রিটায়ার্ড জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে? এসব গল্প করা বা এ রকম ভাবধারা পোষণ করা তোমার মোটেই সাজে না।

চিত্রা হেসে উত্তর দিল—জানি, বেশ ভাল করেই জানি। আর এটুকুও জানি, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে ছোট বেলা থেকে বিদেশী শাসনের অত্যাচার-নীতি যতটা চোখে দেখে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে অন্যেরা তা পারে না। জানেন দীপায়নদা, যারা বেশী করে আইন কানুন জানে, তারাই আবার উগ্র আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সব দেশে সব যায়গায় যতবড় বড় বড় দেশ নেতা দেখতে পাওয়া যায় তারা হয় উকীল না হয় ব্যারিষ্টার। বলে চিত্রা চুপ করল।

চিত্রার মুখ থেকে এসব কথা শুনে দীপায়ন অবাক হয়ে গেল।

চিত্রা দীপায়নের পানে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল—দীপায়নদা তুমি আমায় স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা দেবে?

দীপায়ন হেসে উত্তর দিল—দারিদ্র বরণ করতে পারবে ত?

চিত্রা সরল ভাবে বলল—তোমার কথার অর্থত' ঠিক বুঝতে পারলাম না দীপায়নদা?

দীপায়ন বলল— বুঝতে পারলে না? শোন তবে, মুষ্টিমেয় বড়লোক নিয়ে আমাদের দেশ নয়! আমাদের দেশ দীন দরিদ্র গরীব চাষীদের নিয়ে। তুমি তোমার আভিজাত্য ছেড়ে ওদের সকলকে যদি তোমার মাতৃত্ব দিয়ে বাঁধতে পার দেখবে স্বাধীনতার মন্ত্রে তুমি নিজে থেকেই দীক্ষিত হ'য়ে গেছ।

চিত্রা চুপ করল। দীপায়ন ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখল, বেলা সাড়ে ন'টা। চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল—তাহ'লে আজ আমি চললাম চিত্রা।

দীপায়ন চলে গেলে পর চিত্রার বৌদি ছন্দা ঘরে ঢুকে চিত্রার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলল—কি গো ঠাকুর-ঝি, পড়াশুনো বন্ধ করে দীপায়নবাবুর সাথে কানে কানে কি কথা হচ্ছিল? পাকাপাকি ভাবে বন্দোবস্ত করছিলে বুঝি?

চিত্রা বইগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলল—তোমার মাথা করছিলাম।

—হ্যাঁ, মাথাইত করছিলে। তবে আমার নয়, তোমার সুন্দর সুপুরুষ শিবের মত মাষ্টারটির।

চিত্রা চটবার ভান করে বলল—যাও বৌদি, তুমি এ সব কি বলছ? আমরা একটু দেশের স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা করছিলাম।

ছন্দা চমকে উঠে বলল—ও বাবা, সে আবার কি! তোমার আবার এ রোগ কবে থেকে ধরল? যে বাংলা দেশের ছেলেরা 'পলিটিক্স' করে পাত্তা পায় না, সেখানে মেয়েদের মাথা ঘামানো কি অন্যায় নয় ঠাকুর-ঝি?

চিত্রা বইগুলো গুছিয়ে তুলে ছন্দার পানে চেয়ে বলল—জান বৌদি, বাংলা দেশের মেয়েলী পুরুষগুলো, সরল শুভ্র সুন্দর বলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের স্থান নেই। সরলতায় সম্মান পাওয়া যায় সত্যি কিন্তু 'পলিটিক্স্' চলে না। শিবের মত যেন স্বামী পাই, সে আগেকার মেয়েরা চাইত। কিন্তু বাংলা দেশের মেয়েরা এখন আর তা চায় না। মাকাল ফলের মত সুন্দর চেহারা নিয়ে বসে থাকাকে তারা আন্তরিক ঘৃণা করে। এখন তারা কি চায় জান? তারা চায় তেমনি ধারা কুৎসিত কূটনীতিজ্ঞ পুরুষ যারা ছলে বলে কৌশলে দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

ছন্দা বলল—এ ত গেল সমগ্র বাংলা দেশের মেয়েদের কথা। কিন্তু তোমার কথা কি বল'ত ঠাকুরঝি? দীপায়নবাবুকে তুমি আপন করে বিয়ের বাঁধনের মাঝে পেতে চাও কি না? বলে ছন্দা হাসতে লাগল।

চিত্রা মাথা নেড়ে বলল,—না বৌদি বিয়ের বাঁধনে আমি তাকে বাঁধতে

চাই না। বিয়ের বাঁধনে মানুষ সাধারণত স্বার্থপর হয়ে পড়ে। পূর্ণমাত্রায় পারে না দেশ-মাতৃকার সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিতে। আমি তাঁকে আমার জীবনের যাত্রাপথে গুরুরূপে পেতে চাই।

ছন্দা বলল—স্বামীরূপে পেলে কি আর গুরুরূপে পাওয়া হল না? চিত্রা বলল—না বৌদি, সংসারধর্মের দিক দিয়ে হয়ত হ'ল কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রের দিক দিয়ে হল না। স্বামী আর গুরুকে ঠিক এক কোঠায় আমি ফেলতে পারি না বৌদি। স্বামী হচ্ছে সারা জীবনের জীবন্ত সাথী। সংসারক্ষেত্রে সব সময় সব বিষয়ে তাকে সম্মান দিয়ে সমীহ করে কথা বলা চলে না। কিন্তু গুরুর বেলায় সেটুকু অনায়াসেই পারা যায়। তাই আমি দীপায়নদাকে গুরুরূপে পেতে চাই স্বামীরূপে নয়, বুঝলে?—বলে চিত্রা ক্লাসে যাবার জন্য তৈরী হ'তে চলে গেল।

এক বছর পরের ঘটনা।

চিত্রা ইংলিশে ফার্ষ্টক্লাস অনার্স পেয়ে বি-এ, পাস করেছে, আর দীপায়নও এম-এ. তে ইকনমিক্সে ফার্ষ্টক্লাস পেয়েছে।

বাড়ীর সকলেরই ইচ্ছা দীপায়নের সাথে চিত্রার বিয়ে হয়, এমন কি নিশীথবাবুরও।

একদিন নিশীথবাবু চিত্রাকে তার নিজের কামরায় ডেকে তার মতামত জিজ্ঞেস করলেন।

চিত্রা প্রথমে কোন উত্তর দিল না, তারপর বাবার অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বলল—তোমার যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, এ বিষয়ে আমার কোন নিজস্ব মতামত নেই।

নিশীথবাবু তখন সন্তুষ্ট চিত্তে মেয়েকে বিদায় দিলেন। তারপর

বিকেল বেলা দীপায়নকে ডাকিয়ে তার মতামত জিজ্ঞেস করতেই সেও প্রথমে আপত্তি করল। তারপর নিশীথবাবুর চোখের কোণে জল ভেসে উঠতে দেখে বলল—আমায় দু'টো দিন সময় দিতে হবে কাকাবাবু, একবার ভাল করে ভেবে দেখব এখন আমার বিয়ে করা চলে কি না। বলে সে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। নিশীথবাবুও সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা তুমি এ দু'টো দিন ভেবে দেখ, আমাদেরও অত তাড়াতাড়ি নেই। তবে এ বিষয়ে তোমার যেন মতই হয়। বলে তিনি দীপায়নকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

দীপায়ন মাথা নীচু করে নিশীথবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে, একটা দারুণ চিন্তার বোঝা মাথায় করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা।

নিশীথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার একদিন পর দীপায়ন গঙ্গার ধারে একা বসে বসে ভাবছে, দু'দিন পর নিশীথবাবুকে কি জবাব সে দেবে। এমন সময় সুমুখে এক নারীমূর্তি দেখে সে চমকে উঠল, জিজ্ঞেস করল—কে? দীপায়নের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটী জলের পানে এগিয়ে চলল। দীপায়ন পুনরায় জিজ্ঞেস করল—আপনি কে?—এত রাত্তিরে এখানে কেন? তবু কোন উত্তর না পেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—দাঁড়ান।

দীপায়নের কণ্ঠের গুরুগম্ভীর স্বরে মেয়েটী তখন থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে চাইল। চাঁদের মুখে ছিল তখন কালো মেঘের একখানা পর্দা, তাই দীপায়ন তার মুখখানা ভাল করে দেখতে পেল না। তবু যতটা দেখল তাতেই সে অনুমান করল, নিশ্চয়ই এ কোন ভদ্রঘরের মেয়ে। সংসারের কোন আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করতে ছুটে এসেছে। দীপায়ন ছুটে নিকটে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটী তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে

কাঁদতে বলল—আপনি কে জানি না, তবু মনে হয় আপনি যেন আমাকে বাঁচাতে ছুটে এসেছেন, আপনি আমায় বাঁচাবেন?

দীপায়ন তাকে পা' ছেড়ে উঠতে বলে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ভয় নেই, আপনি খুলে বলুন আপনার কি হ'য়েছে। আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় আমি নিশ্চয়ই আপনাকে রক্ষা করব।

মেয়েটি তখন আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মোটামুটীভাবে সব ঘটনাই খুলে বলল। বলতেই দীপায়ন পকেট থেকে 'রিভলভার'খানা বের করে বলল—ওরা যদি এখানে আসে তাহ্‌লে জানবেন এর হাত থেকে কেউ ওরা নিস্তার পাবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে অস্ত্র আমার হাতে তা দিয়ে আজ আপনার সতীত্ব রক্ষা করতে আমি এতটুকু দ্বিধা বোধ করব না—বলে রিভলভারটা পকেটে পুরলো।

দীপায়নের কথা শুনে মেয়েটীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। আর ঠিক সেই সময় চাঁদের মুখ থেকে মেঘের পর্দাটা সরে যেতেই তার রূপ দেখে দীপায়ন চমকে উঠল। ভাবল এত রূপ যার তার বিপদ ত প্রতি মুহূর্তেই।

দীপায়ন জিজ্ঞেস করল—আপনার নাম?

উত্তরে মেয়েটি বলল—আমার নাম চিত্রালী চ্যাটার্জী।

—তবে শুনুন চিত্রালী দেবী, আপনাকে আমি আমার কাজে লাগিয়ে সৎপথে থাকার বন্দোবস্ত করছি। বলে দীপায়ন চিত্রালীকে ফিরিয়ে নিয়ে বাকি রাতটার মত একটা হোটেলে গিয়ে উঠে তার পরদিন ভোরের ট্রেনেই তাকে নিয়ে বেনারস রওনা হ'ল।

কবি দীপায়ন পাড়ার নাম-করা ছেলে। চিত্রালীকে নিয়ে চলে যাবার কথা অতিরঞ্জিত করে কাগজে প্রকাশ করতে তার গোপন শত্রুরা ত্রুটী করল না।

পরদিন সকাল বেলা নিশীথবাবু কাগজ পড়তে পড়তে সে খবরটুকু নজরে পড়তেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে পাশে উপবিষ্ট ছন্দাকে দেখিয়ে বললেন—দেখেছ ছোকড়ার কাণ্ড, এর সাথেই না চলেছিলাম চিত্রার বিয়ে দিতে? যাক, বাঁচা গেছে, আজ তার মত দেবার কথা ছিল। মত দেবে কোত্থেকে? যে 'স্কাউন্‌ড্রেল' তার কি কখন মনের জোর থাকতে পারে। বলে নিশীথবাবু একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। চিত্রাও সেখানে উপস্থিত ছিল, আপত্তির স্বরে বলল—না বাবা তা নয় দীপায়নদা কখন 'স্কাউন্‌ড্রেল' হতে পারে না।

—না হ'তে পারে না, তবে এসব কি! বলে মেয়ের পানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।

চিত্রা বাবার সুমুখ থেকে চলে এসে জামা কাপড় বদলে মনি ব্যাগটা সংগে নিয়ে ছন্দার কাছে গিয়ে বলল—বৌদি আমি এখ্‌খুনি একটু সুব্রতাদের ওখান থেকে আসছি। বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

তখন বেলা সাড়ে আটটা। চিত্রা রাস্তায় এসে একখানা ট্যাক্‌সী করে সোজা দীপায়নের ঠিকানায় এসে শুনতে পেল দীপায়নের বৌদি বলছে—তাই ঠাকুরপো কাল অনেক রাত্রে বাসায় ফিরে বলল—কাল সকালের ট্রেনে আমায় একবার বেনারস যেতে হবে বৌদি, বিশেষ কাজ আছে। ওমা এই বুঝি তার বেনারস যাওয়া, আর এই বুঝি তার কাজ?—আর শুনবার প্রয়োজন হল না; চিত্রা সেখান থেকে রওনা হয়ে সোজা একেবারে হাবড়ায় এসে বেনারসগামী ট্রেনে চেপে বসল। গাড়ীতে বসে বাবাকে একখানা চিঠি লিখে পরের ষ্টেশনে তা পোষ্ট করে দিল। বাবাকে লিখল—বাবা, আমি দীপায়নদা'কে ফিরিয়ে আনতে চললাম। আমার জন্য তোমরা ভেব না।

লীলাময় দে

রাত্রি একটার সময় চিত্রা বেনারসে এসে পৌছল। বাকি রাতটুকু ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে সকাল বেলা একখানা গাড়ী করে সে তার এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠল।

বন্ধু সুচিতা তাকে এমন অবস্থায় আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর বন্ধুর কাছে সব ঘটনা খুলে বলতেই সুচিতা বলল—ও, দীপায়ন বাবু? আরে তিনিই হচ্ছেন আমাদের সমিতির হর্তাকর্তা। হাঁ, কাল তিনি এখানে এসেছেন বটে আর সাথে একটী মেয়েও এসেছে। তবে তাঁর সাথে ত এমনি দেখা হওয়া কঠিন, আচ্ছা আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। এখন তুমি যাও স্নানাদি সেরে মুখে কিছু দিয়ে বিশ্রাম করগে, সারা রাত জেগে এসেছ।

এত সহজেই যে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে তা চিত্রা ভাবতেও পারেনি। আনন্দে তার মুখমণ্ডল উজ্জল হয়ে উঠল। সেইদিনই সন্ধের পর চিত্রাকে সংগে করে সুচিতা দীপায়নের সাথে তার দেখা করিয়ে দেবার জন্য সমিতির গুপ্ত আড্ডায় এসে হাজির হল। দীপায়ন তখন ঘরের এক কোণে বসে দু'জন লোকের সাথে চাপা গলায় আলাপ করছিল। চিত্রা ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেল, দীপায়ন বলছে—আর উপায় নেই সিংজী—মানুষের পদ শব্দ শুনতে পেয়েই দীপায়ন কথা বন্ধ করে সচকিতে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় চিত্রাকে দেখে দীপায়ন অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেল। এগিয়ে এসে বলল—একি, চিত্রা তুমি এখানে?—কি করে এলে, কার সাথে এলে? বলেই দরজার আঁড়ালে সুচিতার ওপর নজর পড়তেই হেসে বলল, ও বুঝলাম। আচ্ছা তোমরা একটু অন্য ঘরে অপেক্ষা কর আমি কাজের কথাটা সেরে নিয়ে এখুনি তোমাদের কাছে আসছি। চিত্রা কোন কথা না বলে সুচিতার সাথে বেরিয়ে গিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে বসল।

মিনিট পাঁচেক পর দীপায়ন সেখানে এসে উপস্থিত হ'তেই সুচিতা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

দীপায়ন জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ তুমি কি মনে করে এখানে চলে এলে চিত্রা?

চিত্রা বলল—তোমাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—আমি যে বেনারসে আছি তা তুমি জানলে কি করে?

চিত্রা বলল—তোমাদের বাসায় আর খবরের কাগজে।

দীপায়ন বলল—কাগজ দেখেছ? কাগজের ঘটনা সে জানত। হেসে বলল—ও, তা'হলে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই দেখছি।

চিত্রা বলল—হ্যাঁ, সেই আশাতেই ত এতদূর একা একবস্ত্রে ছুটে এসেছি।

দীপায়ন বলল—কিন্তু আমায় ত' তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না চিত্রা।

চিত্রা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞেস করল—কেন?

—আমার নামে 'ওয়ারেণ্ট' বেরিয়ে গেছে। কখন তারা আমায় 'অ্যারেষ্ট' করে তার ঠিক নেই। তারা আমায় ও আমার সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের ওপর সন্দেহ করে 'ওয়ারেণ্ট' বের করেছে। তাই আমি সমিতি আপাতত ভেংগে দিয়ে সকলকে আত্মগোপন করতে আদেশ দিয়েছি, দেখা যাক্ কি হয়।—বলতে না বলতে দু'জন সাব্ইন্সপেক্টার সহ পুলিশ ইন্সপেক্টার রিভলভার উঁচু করে তাদের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বলল—হাত তুলুন। তারপর চিত্রাকে বলল—আপনিও।

পুলিশ ইন্সপেক্টার জিজ্ঞেস করল—আপনার নামই ত পার্থপ্রিয় রায়?

দীপায়নের হয়ে চিত্রা উত্তর দিল—না ওঁর নাম পার্থপ্রিয় রায় নয়, দীপায়ন রায়।

পুলিশ ইন্সপেক্টার হেসে বলল—একই কথা। আমরা জানি দীপায়ন আর পার্থপ্রিয় একই লোক।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে চিত্রা অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমি এরই প্রাইভেট সেক্রেটারী। দীপায়ন প্রতিবাদ করতে গেল। ইন্সপেক্টার তাকে থামিয়ে দিয়ে চিত্রাকে জিজ্ঞেস করল—আপনার কাছে কিছু নেই ত?

চিত্রা বলল—না।

ইন্সপেক্টার তখন 'হুইসিল্' দিয়ে রিজার্ভ ফোর্স ডেকে তাদের দু'জনকে কড়া পাহারার মধ্যে রেখে থানায় নিয়ে গেল। তারপর তাদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজসাহী জেলে পাঠানো হল।

রাজসাহী যাবার আগে বেনারস থেকে চিত্রা একখানা চিঠি বাবাকে দিয়েছিল, তাও অতি গোপনে ওয়ার্ডারের হাত দিয়ে। তাতে সে লিখেছিল—বাবা, দীপায়নদা'কে ফেরাতে না পেরে আমিও তার সাথে কারাবরণ করলাম। অবশ্য আমায় এরা বেশী দিন রাখবে না—প্রমাণ পেলেই ছেড়ে দেবে। কিন্তু দীপায়নদাকে কত বছরের জন্য নিল তা এখনও স্থির হয়নি। দীপায়নদা স্কাউন্ড্রেল নয় বাবা, দীপায়নদাই হচ্ছে আমার মনের উপযুক্ত মানুষ।

তৃণখণ্ড

জীবানন্দ ঘোষ

জীবানন্দ ঘোষঃ জন্ম—তেরশ তেইশ বংগাব্দে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত যাদবপুরে। ছাত্র-জীবন কলিকাতায়। এঁর লেখনীর ভিতর একটা নূতনত্ব আছে। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'অসমতল' এবং ছেলেদের জন্য লেখা 'হাসতেই হবে'। বর্তমানে 'লেকভিউর' সম্পাদক এবং ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট।

এ-গাঁয়ে আসিয়া ব্রজ ডাক্তার সম্বন্ধ পাতাইয়াছে বেশ। এখানে সহুরে রোগ নাই বটে, ম্যালেরিয়াই এক-চন্দ্র হইয়া বসিয়াছে। ম্যালেরিয়ার রসিকতায় উত্তর দিতে দিতে ব্রজ নিজেই তাহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছে। আর কোম্পানীর ডাক্তার, ঔষধ খাইতেও পয়সা লাগেনা, নাড়ী টিপিতেও পয়সা লাগে না,—তাই সময় নাই অসময় নাই রাত্রি-দিন যে যখন পারিতেছে ব্রজকে ডাকিয়া নিয়া নাড়ী টিপাইতেছে, জিভ দেখাইতেছে।

ব্রজ এ-গাঁয়ে আসিয়াছে আজ সতেরো দিন। চন্দনা বুড়ির বাড়ীতে একটি ঘরে সে থাকে। চন্দনা অন্ধ, এক অবিবাহিত ছেলে আছে, সে-ই মাকে খাওয়ায়।

আজ সকালে উঠিয়া ব্রজ একটা লিষ্ট করিয়া ফেলিল কাহার কাহার বাড়ীতে যাইবে। প্রথমে রসিক মিস্ত্রির মেয়েটাকে,—মেয়েটার অবস্থা যে-রকম দাঁড়াইয়াছে, অসুখ টাইফয়েডে ঘুরিতে পারে।

মাঠ ভাঙিয়া রসিকের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল ব্রজ। রসিক নিজে আসিয়া ব্রজ'র হাত হইতে ব্যাগ লইয়া অন্তঃপুরে চলিল। মেয়েটা একটা অন্ধকার ঘরে স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর বিছানো

মাদুরে পড়িয়া আছে। মেয়েটার নাম আলো, চোদ্দ বছরের মেয়েটি যেন আলোর মতই, অসুখে গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হইয়া গেছে।

ব্রজ যেই আলোর ঘরে ঢুকিল, দরজার কাছে জন দুই মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। আলোর মাথার কাছে বসিয়া ব্রজ শুধাইল, আজ কেমন বোধ হচ্ছে?

চিঁ-চিঁ করিয়া অনেক কষ্টে আলো বলিল, কাঁশতে গেলে বুকে বড্ড লাগছে।

হুঁ! ব্রজ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, সাঁই-সাঁই করে' শব্দ হয় একটা?

বুঝতে পারিনে।

বুকটা তো তাহ'লে একবার এগ্‌জামিন কর্‌তে হয়! বলিয়া ব্রজ বাক্স হইতে স্‌টেথিস্‌কোপ্‌ বাহির করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দরজার সাম্‌নে থেকে ঘোমটার আড়াল হইতে কে-যেন কাটিয়া পড়িল অকস্মাৎ: চোদ্দ বছরের সোমত্ত মেয়ের বুক দেখতে চায়—এ কেমন ডাক্তার গো?

ব্রজ'র স্‌টেথিস্‌কোপ্‌ পুনরায় লুকাইল বাক্সে। আলো'কে বলিল, একটু কাঁশো তো?

আলো কাঁশিল। সর্দি বসিয়াছে বটে।

নাড়ী দেখিবার জন্য হাত বাড়াইল ব্রজ, কিন্তু পুনরায় সেই কণ্ঠ: বল্‌ না ছুঁড়ি, আমার বাবা হাত দেখতে জানে! তুমি ডাক্তার, খালি ওষুধ দেবে!

ব্রজ কেবল ঔষধই দিল।

অকস্মাৎ আলো কাঁদিয়া উঠিল, আমি হয়তো বাঁচবো না ডাক্তার বাবু!

ছি, ছি! ব্রজ সান্ত্বনা দেবার জন্য আলোর কপালে হাত রাখিল। বলিল, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? এবারকার ওষুধেই সব সেরে যাবে।

দরজার সামনে: ইঃ, ছুঁড়ির ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে গো।

খানিক পরে ব্রজ আবার মাঠে নামিল। এবার দক্ষিণ পাড়ার তিন জন—সুরথ বারুইয়ের ছেলে, নরহরির সম্বন্ধি, আর আন্নাকালী।

সুরথের ছেলেটি বড় ডান্‌পিটে। জ্বর আসিলে কাঁথার তলায় লুকাইবে, আর জ্বর ছাড়িলেই আমড়া গাছে চড়িবে। ব্রজ সকালের দিকে যখনই আসে, দেখে—একটা-না-একটা কুপথ্য করিতেছে ছেলেটা।

ব্রজ'র হাতে এখনো পনেরোটা রোগী—পুরুষ নয় জন, নারী ছয় জন। মেয়েদের মধ্যে, ব্রজ'র বিশ্বাস, অর্জুন মণ্ডলের বিধবা বোনটি, হারাধন ঢালির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি, রসিক মিস্ত্রির মেয়ে আলো, ক্যাবলাচাঁদের বিধবা মা আর আন্নাকালী কী করিয়া বসে! ইহাদের জ্বর ক্রমেই বাঁকিবার উপক্রম করিতেছে। ইহাদের জন্য ব্রজ'র সত্যই কষ্টের সীমা নাই।

অর্জুন মণ্ডলের বিধবা বোনটি কেমন হাসিয়া বলে, আমার জন্য কষ্ট করে' দরকার নেই ডাক্তারবাবু। এ বাজেপোড়া তাল গাছ, এর কি মরণ আছে? কোন রকম করে বেঁচে থাকবোই।

হারাধন ঢালির দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও সুশ্রী। ব্রজ যখন তাহার সামনে বসিয়া ঔষধ তৈয়ারী করে, অপলক নেত্রে তখন সে চাহিয়া থাকে ব্রজ'র মুখের দিকে। ব্রজ'র সঙ্গে কথা কহিতে গেলেই অতি যন্ত্রণায়ও সে হাসিবার চেষ্টা করে।

আলোর কথা ছাড়িয়াই দাও। ও-কে বাঁচিতে দেবে কি ওরা?

ব্রজ কিন্তু মনে-মনে পণ করিয়াছে, যেমন করিয়াই হোক, আলোকে সে বাঁচাইয়া তুলিবে।

ক্যাবলাচাঁদের বিধবা-মা'র মরিয়া যাওয়াই ভালো—যে কষ্ট! কিন্তু ব্রজ চেষ্টা করিতেছে বাঁচাইবার।

আর আন্নাকালী—। একলা গ্রামের শেষ সীমানায় থাকে। ওর পরিচয় ব্রজ জানে না। ওর বয়স গোটা পঁচিশ কিন্তু দেখিতে পঁয়ত্রিশ বছরের মত। শাড়ী পরে অথচ সিঁথিতে সিঁদুর নাই। ব্রজ'র সহিত কেমন বাজে রসিকতা করিবার চেষ্টা করে আন্নাকালী। ব্রজ'র ভালো লাগে না এ-সব। কিন্তু ভালো না লাগিলে তো চলিবে না, ডাক্তার ব্রজমাধবকে প্রত্যহ এখানে আসিতে হয়।

এক মাস কাটিয়া যায়।

ক্যাবলাচাঁদের বিধবা মা না-মরিয়া বাঁচিয়াই উঠিয়াছে। গোবর কুড়াইয়া ভাত খাওয়ার লোভ হয়তো সামলাইতে পারে নাই। আন্নাকালী দু'-এক দিনের মধ্যে পথ্য পাইবে। ব্রজ'র হাতটা একটু টিপিয়া দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া আন্নাকালী বলে, তুমি আমায় বাঁচিয়েছো—আমায় যেন ভুলো না।

ব্রজ'র গা'টা রি-রি করিয়া উঠে।

অর্জুনের বোনটি বাজেপোড়া তাল গাছই বটে। দিব্যি কাজ করিতেছে নিয়মিত আর নিয়মিত জ্বরে ভুগিতেছে। ঔষধ দিলে বড় একটা খায় না।

কিন্তু গোল বাধাইয়াছে রসিকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আর আলো। আলোর তো জ্বর টাইফয়েডেই ঘুরিয়াছে; আর রসিকের স্ত্রী'র জ্বর যে কী বুঝাই যাইতেছে না।

ব্রজ ইহাদের জন্য রাত্রি-দিন মোটা-মোটা বই দেখে আর চিন্তা করে।

চন্দনা বুড়ি এক-এক দিন হাঁতড়াইয়া হাঁতড়াইয়া ব্রজ'র দরজার কাছে আসিয়া বলে, কী কোচ্ছো গো নাতী ?

বুড়ি নিজেই ঠাকু-মা-নাতী সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। ব্রজ বলে, একটু ভাবছি ঠাক্-মা।

বুড়ি চোখ পিট্-পিট্ করিয়া বলে, অন্ধকারে কী ভাব্চো ? আলো জ্বালো।

এখনো তো অন্ধকার হয়নি ঠাক্মা এখন যে বিকেল।

আ-মর। তাই তো। বুড়ি যেন জ্ঞাত ভাবেই ভুলটি করিয়াছে এমন মুখ ভংগী করিল।

অন্ধ তো চায় না যে তাহাকে তুমি অন্ধ বলিয়া ডাকো।

এমনি একদিন বৈকাল বেলায় চন্দনা বুড়ি আসিয়া জানাইল, নাতী, পাশের বাড়ীতে একটু চিকিচ্ছে করবে ? ও বাড়ীর মেজ বউয়ের বেশ ঘুস্-ঘুসে জ্বর হ'চ্ছে।

চন্দনা বুড়িরই হাত ধরিয়া ও-বাড়ীতে যাইল ব্রজ। মেজো বউকে দেখিল। মুখখানা দেখিলে মনে হয়, মেয়েটি আ-জীবন ধরিয়া কী একটা কঠিন রোগে যেন ভুগিতেছে। এক খামচা মানুষ, পাকাইয়া গেছে বড়।

...এ দিকে আলোর সেই কান্না। বাঁচিবার তাহার বড় সাধ। কাঁদিয়া নিজের হাত দুইটি ব্রজ'র জুতার উপর রাখিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠে, আমি বাঁচবো ডাক্তার বাবু, আমাকে বাঁচান। সারা জীবন আপনাকে দেবতার মত পূজো করবো। আমাকে বাঁচান।

মেয়েটির কান্না দেখিয়া ব্রজমাধব ডাক্তারের চোখ দুইটিও ছল-ছল করিয়া উঠে। বলে, তোমাকে বাঁচাবোই আলো। মৃত্যু কি এতই সোজা ?

দরজার সামনে দু'-তিনটি কণ্ঠ আছড়াইয়া মরে। না, মেয়েটিকে বাঁচাইতেই হইবে। কী করুণ ওর মুখখানি! আর বাঁচিবার যে বড় সাধ ওর। পৃথিবীকে ভোগ করিবার সাধ ওর বড় বেশী।

আর রক্ত-মাংসের মানুষ ব্রজ'র দেবতা হইবার সাধ নাই বুঝি?

...হারাধনের স্ত্রীটি হয়তো বাঁচিয়া উঠিবে। মেয়েটি তেমনি তাকাইয়া থাকে ব্রজ'র মুখের দিকে—কী বলিতে চায় ও?

সব শুদ্ধু দুই মাস কাটিয়া যায়।

চন্দনা বুড়ি নিজের চোখ দু'টোকে দেখাইয়া ব্রজকে বলে, নাতী, আমার চোখ দু'টোকে অস্তর করে' দিষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারো? খুব তো ফুড়ছো আজকাল।

ব্রজ হাসিয়া বলে, তোমার চোখ আর ভালো হবে না ঠাকুমা। এক কাজ করো, মনের চোখ দু'টো দিয়ে ভগবানের চরণ দেখো।

চন্দনা হাসে একটু কেমন। বলে, যমের দোরটা কোনদিকে ভাই?

ব্রজ মনে মনে বলে; শিগ্‌গির আপনিই টের পাবে'খন। মুখে বলে, ভালো কথা, পাশের বাড়ীর মেজো বউ কেমন? সেই থেকে কোন খবরই নেই!

বটে! সে আজ সতেরো-আঠারো দিন হইয়া গেল। চন্দনা বল্লে, এসো দি'নি নাতী, একবার মেয়েটাকে দেখে আসি। ছুঁড়ি বাঁচে তো ভাগ্যি!

ব্রজ দেখিতে গেল। সতেরো-আঠারো দিনে মেয়েটি যেন আরো ছোট হইয়া গেছে। চোখের কোণে কালি লাগিয়াছে, গাল তুবড়াইয়া গেছে, আয়তনে আরো ছোট হইয়া গেছে। অসুখ ধরিতে পারেনা ব্রজ, আন্দাজে ঔষধ দেয়।

এদিকে আলোর একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেছে। ব্রজ'র চেষ্টায়

মেয়েটি এ-যাত্রা রক্ষা পাইল বোধ হয়। জ্বর ছাড়িয়াছে। আলো কিন্তু এখনো প্রশ্ন করে, আমি বাঁচবো তো ?

ব্রজ হাসিয়া বলে, খুব বেঁচে গেলে ! এবার তোমায় পায় কে ?

আলো শুক্‌নো মুখে আনন্দের হাসি হাসে। শিশুর মত বলে, ভাত খাবো কবে ?

শিগ্‌গির—খুব শিগ্‌গির !

আলো হয়তো মনে মনে ব্রজকে প্রণাম করে।

ব্রজও হয়তো মনে মনে দেবতা হইবার চেষ্টা করে।

...হারাধনের স্ত্রী সারিয়াই উঠিল শেষ পর্যন্ত। একদিন হাসিয়া বলিল, আমি নিজে লুচি ভেজে তোমাকে খাওয়াবো ডাক্তারবাবু।

ব্রজ খাইতেছিল। খাইতে খাইতে চোখ তুলিতেই দেখিল অদূরে মেয়েটি তাহারই মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছে।

লজ্জায় ব্রজ মাথা নীচু করিল।

...আরো দুই মাস কাটিয়া যায়। আলো এখনো অন্ন-পথ্য পাইলনা। ব্রজকে শুধায়, আমাকে ভাত দিলেন কই ?

ব্রজ বলে, এইতো দিলুম বলে'। মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে কেন আবার ?

মেয়েটি ঝিমাইয়া পড়ে।

...চন্দনা বলে, নাতী, রস্‌কে মিস্তিরির মেয়েকে ক'টা ফুঁড়লে ?

ষোলোটা। ব্রজ বলে, না ফোঁড় দিলে মেয়েটা বাঁচতোনা ঠাকুমা !

তা' বটে ! চন্দনা বুড়ি বলে, কিন্তু মেজো বউয়ের হচ্ছে কী ?

কী জানি ঠাকুমা ! ওষুধ তো দিচ্ছি !

তা' বটে ! চন্দনা বুড়ির চোখ পিটু পিটু করে।

দিন দশেক পরে একদিন রসিকের বাড়ীতে যাইতেই শুনিল, আলো চুরি করিয়া লুকাইয়া হাঁড়ি হইতে ভাত খাইয়াছে।

ব্রজ বকিল। ভীষণ বকিল।

আলো বলিল, না খেয়ে করবো কী? কবে ভাত দেবে তুমি—সেই পিত্যেশে থাক্‌তে গেলেই—মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলে।

সেদিন ঘরে কেহই ছিল না, ব্রজ নিজের হাতে আলোর চোখের জল যেই মুছাইতে গেল অমনি আলো হাতখানিকে নিজের বুকের উপর চাপিয়া আরো কাঁদিয়া উঠিল।

ব্রজ'র সমস্ত বুক মোচড় দিয়া উঠিল।

আলো বলিতে চায় কি, বলিতে পারে না।...

কিন্তু এই বুঝি শেষ দেখা ওদের।

সেদিনই বাড়ী ফিরিয়া ব্রজ দেখিল, ওপরওয়ালার নিকট হইতে চিঠি আসিয়াছে। ব্রজকে কালই যাত্রা করিতে হইবে। অপর কোন্ একটি গ্রামে যাইতে হইবে আবার।

ব্রজকে যাইতেই হইবে।

পরের দিন সকালে উঠিয়া ব্রজ সকলের সহিত দেখা করিতে গেল। কিন্তু সকলের সহিত দেখা করিতেও হইল না। রাস্তাতেই শুনিল, রসিক মিস্ত্রির অবিবাহিতা কন্যা আলোকবালা কাল রাত্রে মারা গিয়াছে। আবার চুরি করিয়া পেট ভরিয়া ভাত খাইয়াছিল। হজম করিতে পারে নাই। ওলাউঠার মত হইয়াছিল।

আলো'কেও বুঝি ওপরওয়ালা ডাকিয়াছে!

ব্রজ'র বুকখানা কেমন করিয়া উঠিল। নিজেরই হাতখানাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। এই হাতখানি না কাল আলোর বুকে ছিল? আলো বলিয়াছিল না, ব্রজকে সে পূজা করিবে?

ব্রজমাধব কাঁদিল না। ডাক্তাররা কাঁদেও না।

বাড়ী ফিরিয়া চন্দনাবুড়িকে খবরটা দিল ব্রজ।

সেদিনই সন্ধ্যায় চলিয়া যাইবার জন্য ঠিক ঠাক করিতে থাকিল।

অকস্মাৎ চন্দনাবুড়ি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ব্রজ'র দরজার কাছে হোঁচট খাইল। ডাকিল, নাতী আছো গো ঘরে?

আছি—কেন?

শিগ্‌গির এসো ও বাড়ীতে। মেঝো বউ কেমন করছে!

ছুটিল। তখন শেষ অবস্থা। চুপচাপ মেয়েটি বিছানায় পড়িয়া আছে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসই বহিতেছে কেবল।

ব্রজ অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। সন্ধ্যার দিকে মেজো বউ চোখের দুই পাতা এক করিয়া চিরনিদ্রামগ্ন হইল।

চন্দনাবুড়িকে ব্রজ বাড়ী আনিয়া বলিল, অসুখটা ঠাহর করতে পারলুম না ঠাক্‌মা। মনে হয় ওর বুকখানা—

চন্দনাবুড়ি অন্ধ চোখই মুছিতে মুছিতে বলিল, হতভাগীর সোয়ামী জেলে আজ আট বছর! আমার বিশ্বেস তার তরেই...

এতদিনে অসুখটা বুঝিল ব্রজ। হায়রে।

...সেদিনই সন্ধ্যায় সুট্‌কেশ হাতে করিয়া ব্রজ এ গ্রাম ত্যাগ করিল।

আবার কোন্ গাঁয়ে ডাক্তার ব্রজমাধবের ডাক পড়িয়াছে, তা' কে জানে! সেখানেও হয়তো এমন কতো আলো, মেজোবউ, কতো দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, কতো বাজে-পোড়া তালগাছ তাহার জন্যই না অপেক্ষা করিয়া মরিতেছে।

বিদ্রূপ

বীরু চট্টোপাধ্যায়

বীরু চট্টোপাধ্যায়: জন্ম—উনিশ শ' সতেরো সালে নোয়াখালীতে। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত গাওদিয়া গ্রামে। ছাত্রজীবন—বর্তমানে ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

স্বভাব বুঝি ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু না, আর ভাবিলে চলিবে না। এখন পিছাইয়া যাওয়া অসম্ভব। যে প্রকারেই হউক তাহাকে এই কার্য করিতেই হইবে।

পকেটের ভিতরে যন্ত্রটিসহ তার হাতের মুঠো শক্ত হইয়া উঠিল—আজ তার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তার বর্তমান অবস্থাকে মানিয়া লইতে কোন মতেই সে প্রস্তুত নয়। পৃথিবীতে সে এরকম কুকুরের মত ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতে আসে নাই—তারও এই সুন্দর ভুবনে বাঁচিবার দাবী পূর্ণমাত্রায় আছে এবং সেই দাবীকে কার্যে পরিণত করিতে রক্তে তার আজ আগুন লাগিয়াছে। এ অনল থামাইবার শক্তি তার কেন, কারুরই নাই।

আজ এ সাতাশ বছর বয়সেই কেন সে এমন নিস্ফল হইয়া গেল? আজো যে স্মৃতিতে অতীতের মধুময় দিনগুলি কাঁটার মত বিঁধিতেছে। কেমন করিয়া পলে পলে তার ফুলের মত দিনগুলি সব ক্রমে শুকাইয়া কালো হইয়া গেল সে কথা আজ শত চেষ্টা করিয়াও সে মনে করিতে পারিতেছে না। কি করিয়া এবং কেমন করিয়া যে আজ এই চরম অবস্থায় আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে, ইহা তার কাছে আজো পরম আশ্চর্য। আজ ভাবিতে গিয়া তার কাঁদিতে ইচ্ছা করে যে, তার পকেটে মোট ছয়টি পয়সা ব্যতীত সমস্ত সংসারে আর একটি আধ্‌লাও নাই।

বিদ্রূপ

আজ মুদীর সময় আসিয়াছে তাহাকে চোখ রাঙাইবার, বাড়ীওলার স্পর্ধা হইয়াছে তাহাকে চার মাসের ভাড়ার জন্য অকথ্য অপমান করিবার। আজ কিনা তাহাকে যে-কোন লোক অনায়াসে শাসাইয়া যাইতে পারে। তার হাসিতে ইচ্ছা করে, প্রাণখোলা হাসি, পাগলের মত মর্মান্তিক হাসি।

এ আবস্থিক অধঃপতনের কোন ন্যায্য কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। কেন? কেন সে আজ পাঁচদিন অর্ধাহারে অনাহারে কাটাইতে বাধ্য হইতেছে? তার জীবন, যৌবন, বিদ্যা, জ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা কোন কিছুর ভেতরেই তো সে অক্ষমতার চিহ্ন মাত্র লাগিতে দেয় নাই। তবে কেন তার ভাগ্যবিধাতা আজ সংসারের হাটে পঙ্গু হইয়া ভিক্ষা মাগিতেছে?

তার ঐকান্তিক বাসনার এতটুকু মুল্যও কেউ আজ দিতে নারাজ কেন? সেওতো মানুষ। চোখের উপরে তার বার্ধক্যের আবছা আলো জমিয়া আসে নাই, সে স্পষ্টই চারিপাশে অগণিত লোককে হাসিয়া খেলিয়া স্ফূর্তি করিয়া দিন কাটাইতে দেখিতেছে। তার সংগে যে তাদের দৈহিক মানসিক এতটুকু তফাৎ নাই, একথাটা কে তাহাদের বুঝাইয়া দিবে।

ভগবান জীবটি তার বিশ্বাস হইতে আজ বিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে। ক্লৈব্য দৈববাদিত্বে আজ তার এতটুকু ঘৃণিত অবস্থাও পরিশিষ্ট নাই। রক্তের প্রতিটি কণা আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

এর চেয়ে বেশী দুঃখও তাহাকে টলাইতে পারিত না—শুধু চন্দনা। সেই যে তার জীবনের বালুতটে ফুল ফুটাইতে আসিয়াছিল একদা, আজ তার হতভাগ্য জীবনের সংগে জড়িত হইয়া এই কচি বয়সেই সমস্ত বাসনাকে দারিদ্র্যের নির্মম বহ্নিতে আহুতি দিতে এক সংগে

জ্বলিতেছে। এ ব্যথা তার মরিলেও যাইবে না যে, সে, কেবলমাত্র সেই এই পুষ্পিত ফুলকে অকালে ঝরাইবার জন্য দায়ী। এ দুঃখ তাহার রাখিবার যায়গা কোথায় যে, চন্দনা আজ ছয়মাস রোগশয্যাশায়িনী; এক অন্ধকূপে আলোবাতাস বর্জিত স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘরে সে দিবারাত্র ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মৃত্যুর পথ বাহিয়া চলিয়াছে।

সাধ আছে সাধ্য নাই—ইচ্ছা আছে সামর্থ্য নাই। ঔষধপত্র দূরের কথা, রীতিমত পথ্য যোগাইবার অর্থও আজ তার হাতে নাই। চন্দনা কি ভাবে সেই জানে—হয়ত তার স্বামীর অযোগ্যতা দেখিয়া সমবেদনায় মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর সে-নিঃশ্বাসের হাওয়ায় সে কালো হইয়া ওঠে।

আহা, অমন লাবণ্যোজ্জ্বল চেহারাখানি আজ কাষ্ঠসার হইয়াছে। মুখ ফুটিয়া কোন দিন কোন নালিশ সে করে নাই। পতিগতপ্রাণা হতভাগিনী নারী! স্বভাবের কাঁদিতে ইচ্ছা করে—পুরুষ না হইলে সে অনায়াসে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিত।

তার পারিপার্শ্বিকতায় আজ আর আলোর ক্ষীণ রেখাটীও নাই।

তাই আজ সে বাহির হইয়াছে। ওইভাবে আর চলে না। পৃথিবীতে সাধুতার সততার আসন আজ আর নাই।

যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়া সে কিনিয়াছে একটি যন্ত্র, যা তার পকেটের ভিতর আত্মগোপন করিয়া আছে।

দুর্জয় সাহসে সে বুক বাধিয়া লইয়াছে। সে আজ নির্ভীক, বেপরোয়া।

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সে ঢুকিয়া দরজায় উপবিষ্টাদের মধ্যে একজনকে ইশারায় ডাকিয়া নিয়া গেল। সামনে আসিতেই চোখ ঝলসিয়া ওঠে, সমস্ত অঙ্গে অলংকারের নানাবিধ বহুল প্রাচুর্য।

বিদ্রূপ

কথাবার্তা কহিবার প্রয়োজন ছিল না। উপরের ঘরে আসিয়া মেয়েটি তাহাকে বসাইল। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিখুঁত অভিনয়ে সে ভালবাসার কথা শুনাইতে চেষ্টা করিল।

সুভাষের পা কাঁপিতেছে—মেয়েটির লক্ষ এড়াইল না, মনে মনে হাসিল। বেচারা নতুন, কহিল—এই বুঝি প্রথম আসা? তা ভয় কি, পুরুষ মানুষ না তুমি?

সত্যই তো, সে না পুরুষ!

—হ্যাঁ ভয়টা কিসের, তবে শোন!

মুহূর্ত মধ্যে পকেট হইতে রিভলভারটা বাহির করিয়া সে চাপা অদ্ভুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—চেঁচিয়েছো কি মরেছ—

মেয়েটি চোখের নিমেষে ফ্যাকাশে হইয়া, চীৎকার করিবার পূর্বেই সুভাষ মুখটা তাহার চাপিয়া ধরিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়ে বাঁধিয়া ফেলিল।

সমস্ত শরীর তাহার ভীষণভাবে কাঁপিতেছে। তবুও খুব তৎপরতার সংগে মেয়েটির সমস্ত কিছু গহনা খুলিয়া একটা রুমালে বাঁধিল, ঘরের সুইচ্‌টা অফ্‌ করিয়া দিল, তারপর অন্ধকারে বাহিরে আসিয়া দরজার শিকল তুলিয়া দিয়া কিভাবে যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল তা ঈশ্বরই জানেন।

তীরের মত সে ডানদিক বাহিয়া হাঁটিয়া চলিল। রাত্রির কলিকাতা রূপসজ্জায় অতুলনীয়। কিন্তু সে-সব তার কাছে গোলাকার অগ্নিকুণ্ড বলিয়া মনে হইল। সে দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে। কোনদিকে চাহিবার আর তার সময় নাই। হঠাৎ কাপুরুষোচিত ভয় আসিয়া চাপিয়া ধরিল দেহমনে।

পুলিশ! রাস্তায় ট্রাফিক্‌ কণ্ট্রোল করিতেছে—সে বাঁ দিকের

একটা গলিপথে ঢুকিয়া পড়িল। মনে হইল সমস্ত পুলিশবাহিনী যেন তার পিছনে ধাওয়া করিয়াছে, রাস্তার প্রত্যেকটি পথচারী যেন তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে। পা আর চলিতে চাহে না।

আজ সে আর ঘৃণিত দরিদ্র নহে। কমসে কম দুই হাজার টাকার গহনা তার হাতের মধ্যে। একটা কি রকম অব্যক্ত আনন্দ ঝিলিক মারিয়া গেল তার মনে।

বিবেক! আবার বিবেক আসিয়া চাপিয়া ধরে। একি ঠিক হইল! একটী নারীর সর্বনাশ সে করিয়া আসিল, ছিঃ ছিঃ!

সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ? ঠিক করিয়াছে। যুক্তিতর্কের অভাব হয় না: পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাইবে, এতো চিরন্তন সত্য।

আর বেশী দূর নাই। ঐ যে দূরে দেখা যাইতেছে তার বাড়ী। অপূর্ব খোলার ঘর। এইবার—এইবার সে তাহার চন্দনাকে বাঁচাইতে পারিবে। তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে সেই পূর্বের নির্মল স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতায়। আবার সে নতুন জীবন নিয়া তার প্রেমের পথে যাত্রা সুরু করিবে। অর্ধাহার, অনাহার—রোগ, শোক, দুঃখের তালিকা হইতে তার নাম কাটা গেল। উঃ, দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা! ভাবিতেও ভয় করে। এত টাকা লইয়া সে কি করিবে!

দৌড়াইয়া সুভাষ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। চন্দনা গোঙাইতেছে—জ্বরে, বোধ হয় অসহনীয় মাথাধরায় কিংবা অনির্বচনীয় দুর্বলতায়। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে চন্দনার মুখ ঠিক মৃতের মত দেখাইতেছে।

সুভাষ প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—চন্দনা! এই ছাখো কি এনেছি। আর তোমায় মরতে দেবো না—তোমাকে বাঁচতে হবেই। আজ আর আমরা হীন দরিদ্র ভিক্ষুক নই—দু'হাজার টাকা, বুঝেছ চন্দনা, দু'হাজার—

সুভাষের শিরা উপশিরাগুলি এক পাশবিক উল্লাসে নাচিতেছে।

চন্দনা চাহিল—নিভিবার পূর্বে দীপের শেষ উজ্জ্বলতায় সে চাহিল। বোধ করি সমস্ত কথাই তার কানে গিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার চমকাইবার, উৎসাহিত হইবার শক্তিটুকুও বুঝি নাই।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাইল।

সুভাষের সময় নাই। চন্দনাকে সে বাঁচাইবেই। তার চন্দনা মরিতে পারিবে না। যত ওষুধ লাগে, যত বড় ডাক্তার লাগে, যে-কোন ফি দিয়া সে আনিবেই।

পকেট হইতে টয়-রিভলভারটা সে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—আমি এক্ষুনি ফিরে আস্‌চি চন্দনা। বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। জামা কাপড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল অতি জীর্ণ—নাঃ, এ জামা কাপড় দেখিলে নিতান্ত নিঃসন্দিগ্ধ লোকেরও সন্দেহ হয়। সুটকেস খুলিয়া শেষ সম্বল একটি জামা আর একটী সেলাই করা ফর্সা কাপড় বাহির করিল। চুলটাকে আঁচড়াইয়া লইল।

চন্দনা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—বড় বড় চোখে তার বিস্ময়ের দৃষ্টি।

সুভাষ সন্তর্পণে রুমালের পুঁটুলিটি লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় চারিদিকে তাকাইল। নাঃ, কেহ তাহা হইলে সন্দেহ করে নাই। উঃ, এত সুষ্ঠুভাবে যে সে কাজ সারিতে পারিবে এ তার ধারণারও অতীত। ভগবানে বিশ্বাস বুঝি আবার ফিরিয়া আসিতে চায়।

সামনে একটা টহলদার পুলিশ। সুভাষের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। পুলিশটা কিন্তু তার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—সোজা পানের দোকানের দিকে খৈনি টিপিতে টিপিতে আগাইয়া গেল। সুভাষ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সোনাগুলি না গালাইয়া বিক্রী করিলে নিশ্চিত ধরা পড়িবে।

অন্ধকার একটা গলি ধরিয়া সে কয়েকটা মোড় ঘুরিতেই সামনে একটা কর্মকারের দোকান; কিন্তু ভিতরে তিন চার জন লোক বসিয়া গল্প করিতেছে। সুভাষের ঢুকিতে ভরসা হইল না।

আরেকটুকু আগাইয়া যাইতেই ডানদিকে আরেকটি দোকান। একটী অল্পবয়স্ক লোক মাথা নীচু করিয়া কাজ করিতেছে। যাক্ এইখানেই ঢোকা যাক্।

সুভাষ অতি সন্তর্পণে ঢুকিল। গলা শুকাইয়া আসিতেছে।

লোকটী পায়ের শব্দে মাথা তুলিয়া চাহিতেই সুভাষ কোন মতে বলিতে পারিল—এ—এই যে, হ্যাঁ, আপনি সোনা গালাতে পারেন?

প্রশ্ন শুনিয়া লোকটী বোধ হয় বিস্মিত হইল, কহিল—কেন পারব না। এই-ই আমাদের কাজ।

-- বেশ, বেশ সুভাষ প্রায় বসিয়া পড়িল, রুমালটি খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিতে করিতে কহিল—এই গুলি সব, সব গালাতে হবে, কোন রকম যেন,—হ্যাঁ, একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মানে—যেন—

লোকটী যেন সুভাষের কথাবার্তা শুনিয়া তার প্রকৃতিস্থতার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

—দেখি?

সুভাষ চারিদিকে চাহিয়া বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। এ কিসের গয়না গালাতে নিয়ে এসেছেন? এগুলোতো সোনা নয়—সব গিল্টি করা।

—গিল্টি করা! সোনা নয়! সুভাষের চোখদুইটা নিমেষে কি রকম ঘোলা হইয়া উঠিল—সমস্ত দেহের শক্তি এক মুহূর্তে উবিয়া গেল। সে অজ্ঞান হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল।

মহুয়া

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

অন্নপূর্ণা গোস্বামীঃ জন্ম—তেরশ' বাইশ সালে কলিকাতায়। এডভোকেট সতীশচন্দ্র লাহিড়ীর প্রথমা কন্যা; রাজসাহী নিবাসী ডাঃ অবনীমোহন গোস্বামীর পত্নী। শৈশবে এক দিদির মুখে গল্প শুনিতে শুনিতে গল্প লেখার প্রেরণা পান। গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা সব রকমের লেখাই ইনি লিখিয়া থাকেন।

নিঃশব্দ নয়নে রঞ্জন অপ্রতিভ স্ত্রীর কুণ্ঠানত মলিন মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। রত্না তবু হাস্‌ছিল, সে হাসি ফিকে; হাসির অন্তরালে যেন এক অশরীরী আত্মা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, ঠোঁটের রেখায় তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রঞ্জনের দৃষ্টিতে একটা তীব্রতম ক্রোধ ঝক্‌মক্ করছে। ও সবেমাত্র কর্মস্থান থেকে ফিরেছে। টিনের কারখানার রঙের মিস্ত্রি, হাতে অস্পষ্ট হয়ে সবুজ রং লেগে রয়েছে তখনও। বাবরী করে ছাঁটা চুল ওর বিরক্ত রুক্ষ ললাটে ছড়িয়ে পড়েছে। আধ ময়লা খাঁকী রঙের সার্টটা তক্তাপোশের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ও বলে উঠলো, "আজও বুঝি সে পালিয়েছে?" ওর শ্রম-শ্রান্ত কণ্ঠস্বরে কথার ঝাঁঝটা কর্কশ হয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ আজও পালিয়েছে, কত মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলুম, তবু—" এবারে রত্নার মুখের হাসিটুকু নিঃশেষে শুখিয়ে গেল, ওর করুণ চেহারার ওই দীনতম মুখের দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের মনটা মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। এবার ও একটু মিষ্ট স্বরেই বল্‌লো, "দে—দুটী কিছু খেতে, যাই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আসি, এত দুর্ভোগ, তবু তুই কেন যে ছাড়তে পরিস্‌নে বুঝিনে—" রঞ্জন ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টায় ওর ধূলিধূসর মুখটা ধুয়ে ফেল্‌লো।

বাস্তবিক তাই—, সোনা নয়, হীরে নয়, মণি-মুক্তোর সামিল এমন কিছুই মহামূল্য পদার্থ নয়, নিতান্তই তুচ্ছ রক্তমাংসে গড়া এক ছাগল। তার ওপর রত্নার মমতা অসীম—সে এক অদ্ভুত প্রেম; নিত্য ওকে নিয়ে তাদের নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে কত না অনর্থের সৃষ্টি হয়, তবু তাকে পরিত্যাগ করতে পারেনা। এর বাগানে সে করেছে কত গাছ নষ্ট, ওর ঘর করেছে অপরিষ্কার, নিত্য এমনি তার কীর্তিতে রত্নার কাণ ভরে ওঠে। তবু সে তাকে নিবিড় স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে। ও তার প্রিয় মহুয়াকে গভীর ভাবে ভালবাসে।

কতদিন রঞ্জন স্ত্রীকে সুমিষ্ট কথায় বলেছে—কতদিন তিরস্কার করেছে প্রহার পর্যন্ত করেছে, মহুয়াকে বিদায় করে দেবার জন্য সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছে, তবু রত্না স্বামীর আদেশ, অনুরোধ কিছুই রক্ষা করতে পারে না, শুধু গিনতিসজল চোখদুটী সে স্বামীর রোষদৃপ্ত মুখের উপর মেলে রেখে অনুনয়-কম্পিত কণ্ঠে বলে, "তোর পায়ে পড়ি, তুই এমন কথা আমায় বলিস্‌নি—, তবে আমি বাঁচবোনা, ওকে আমি বড্ড ভালোবাসি।"

রঞ্জনের কোথায় যেন এ কথাগুলি কাঁটার মত খচ্‌ করে বিদ্ধ হয়, ম্রিয়মান গলায় বলে, "আচ্ছা রত্না, একটা ছেলে কি মেয়ে পেলে তুই ওটাকে বিদায় করতে পারবি বল্‌তো?"

রত্না সন্তান পাবার আনন্দেও মহুয়াকে বিদায় দেবার প্রতিশ্রুতি স্বামীকে দিতে পারেনা, কেননা এ মহুয়া মাত্র একটা ছাগল হলেও, সে যে তার আপন হাতে গড়া, প্রাণের সুক্ষ্মতম ভালোবাসার সব রসটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে ও যে তাকে পরম প্রীতি ও যত্নের সংগে এতদিন পালন করে এসেছে, ওর সব অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে।

ওর বিবাহের বছরখানেক পূর্বে যেদিন এই মহুয়া জন্ম লাভ করলো, সেদিন থেকেই সবাই ওর নধর কচি দেহের প্রতি লোলুপ

হয়ে উঠলো। তখন রত্না প্রগাঢ় মমতায় ছুটে যেয়ে, সেই ছোট নরম-তুল্‌তুলে ছাগশিশুটাকে গভীর স্নেহের সংগে আপন বক্ষনীড়ে তুলে নিয়েছিল।

বাপ বল্‌লে, "বেচ্‌লে মোটা দাম পাওয়া যাবে রে, রত্না"—

মা বল্‌লে, "পচ্‌লে বাসি মাংস, টাট্‌কার চেয়েও সুস্বাদ হবে।"

মেয়ে কিন্তু তাদের কোনও কথাই কাণে তুল্‌লোনা, সেই পৃথিবীর নূতন আলো দেখে নূতন প্রাণীটির ভীরু চোখের দিকে মুগ্ধের মত তাকিয়ে থেকে, তার সাদায়-কালোয় মিশানো তুলোর মত কোমল গাল, নিজের গালে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বল্‌লো, "একে আমি কিছুতেই দেবনা, তোমরা আমায় বেচে টাকা নাও—, রেঁধে খাও—, তবু একে আমি ছাড়বো না।" এর উপর আর কোনও কথাই চলে না—, তবে ওর বিয়ের পর মহুয়ার ভরণ পোষণের কথা ভেবে রঞ্জন ওকে নিতে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রত্নার প্রতি ওর দরদী মনের কাছে ওর সে আপত্তি পরাস্ত হয়েছিল। তখন বেলা পড়ে এসেছিল, মুমূর্ষু বিকেল বেলা ধরণী-প্রাংগণে সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নিবিড় হয়ে উঠেছিল। স্তিমিত নয়নে রত্না সেই দিকে তাকিয়েছিল। রাত্রের শেষ একমুঠো মুড়ি গালে ফেলে রঞ্জন বললো, "আচ্ছা আচ্ছা, তুই মা হলেও তোর মহুয়াকে বিদায় করতে হবে না, তুই মুখ এমন ভার করে থাকিস্‌নে।" এক ঘটি জল সে ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে, শ্রমসিক্ত সেদিনের একটী অর্জিত আধুলি ট্যাঁক থেকে বের করে বলল, "সাঁঝ হয়ে এল, এখনও যখন সে ফিরলনা, নিশ্চয় পুলিশ সাহেবের চাকর তাকে খোঁয়াড়ে দিয়েছে, যাই ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।"

স্মিত মধুর হাসিতে রত্নার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কৃতজ্ঞতা অজস্র

ধারে ওর চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো। ও চঞ্চল পায়ে স্বামীর সান্নিধ্যে এগিয়ে এসে, খুশীতে তার গলা জড়িয়ে বল্‌লো, "সত্যি বল্‌ছি এমনটী আর কখনও হবে না।"

কিন্তু এ ঘটনা ওদের নিত্যনৈমিত্তিকের। প্রায়ই রঞ্জনকে কর্মক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তন করে যেতে হয় খোঁয়াড়ে, না হয় কারও বাগানে। যারা নিতান্ত দরদী তারা রঞ্জনকে পাপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে মহুয়াকে ফিরিয়ে দেয়। নেহাৎ যদি কোনও দিন মহুয়া বাড়ী থাকে, তবে রঞ্জন দেখে, সে তারই যত্নে রোপিত নটেশাকের টুক্‌টুকে লাল ডাঁটাগুলো, না হয় কচি পালংশাক একমনে খেয়ে চলেছে, হয়তো রত্না নিজেই তাকে বাগানের আগল খুলে দিয়েছে। কেননা সে তার পাশে অসীম তৃপ্তি-মাখানো মুখে তার নধর, সুপুষ্ট দেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এ দৃশ্য সহ্যের বাইরে বলেই রঞ্জনের মনে হয়, ওর চোখদুটো জ্বলতে থাকে, মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সে তবু এর প্রতিকার করতে পারে না, একটা অব্যক্ত যাতনা শুধু মর্মের গভীর স্তরে নিবিড়তার সংগে অনুভব করে।

কিন্তু সেদিন যেন এ প্রাত্যহিক নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘট্‌লো, কিছুক্ষণের মধ্যেই রঞ্জন মহুয়ার গলার দড়ি ধরে টান্‌তে টানতে ফিরে এসে বললো, "আজ আর পয়সা খস্‌লোনা, তোর মহুয়ার গুণ অনন্ত"—বলে সে ঘন ঘন হাস্‌তে লাগ্‌লো।

"কেন কী করেছে রে—"? কথা বলার সংগে রত্না চঞ্চল হয়ে উঠলো।

"আজকে গিয়ে দেখি তিনি পুলিশ সাহেবের বাগানে দাঁড়িয়ে, তাঁর এক প্রিয়তমাকে প্রেম নিবেদন করছেন—"

"সত্যি, তাই নাকি" মুহূর্তের জন্য রত্নার গলার স্বর কেঁপে উঠলো, পরক্ষণেই সে খুব জোরে হেসে উঠে বল্‌লো, "ওঃ—এই গুণ, এটা তো ওর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সেও তো একই ঈশ্বরের সৃষ্টি, রক্ত মাংসতেই গড়া—"

এবারে বিরক্তির স্বরে রঞ্জন বল্‌লো, "তবে একটা ছাগ্‌লী পোষ্‌ না, আমিও এ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাই—"

"না বাপু সে আমার ভালো লাগেনা—" রত্না বল্‌লে, "ওর বিয়ে দিলে, ও আমায় ভুলে যাবে, সর্বক্ষণ বউর মন রাখ্‌তেই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, এ আমার সহ্য হয় না—" রত্না গভীর প্রীতির সংগে মহুয়াকে বুকে চেপে ধরলো।

পরদিন খুব সতর্কতার সংগে রত্না নিজের শোবার ঘরে মহুয়াকে বন্ধ করে রাখলো—রঞ্জন আবার ওর বিয়ের প্রস্তাব করবে–, এ তার কাছে ভীষণ অসহ্য, দুপুরবেলা ও ঘরের কবাটটা বেশ ভালো করে বন্ধ করে দিল। কিন্তু দুপুরের কয়েকমুহূর্তের তন্দ্রা ওর ভেংগে গেলে দেখলো, মহুয়া ঘরে নেই, জানালার যে শিকটা ভাঙা ছিল, সেটাও খসে পড়ে গেছে। ও পাগলের মত ছুট্‌তে ছুট্‌তে সদরের বাইরে বেরিয়ে এল। সেদিন ছিল শনিবার, রঞ্জন তখন কাজ থেকে ফিরছিল। স্ত্রীর ওই চঞ্চল মূর্তির দিকে তাকিয়ে সে ব্যাপারটা অনুমান করলো, সস্নেহ কণ্ঠে বললো, "আবার বুঝি পালিয়েছে? ব্যস্ত হস্‌নে, ওই পুলিশ সাহেবের বাগানেই আছে—ধরে আন্‌ছি এখুনি –"

রঞ্জন চলে গেল পুলিশ সাহেবের বাংলো-অভিমুখে, সুন্দর বাগান দিয়ে-ঘেরা মস্ত কোয়ার্টার, রঙ-বেরঙের অপর্যাপ্ত ফুল ফুটে রয়েছে। ফটকের পাশেই দারোয়ানের ঘর, তার সুমুখেই এক পত্র-বহুল আম

গাছ—সেই ছায়াস্নিগ্ধ গাছতলায় দাঁড়িয়ে মহুয়া ওর প্রেমিকার সংগে ঝরে-পড়া আমপাতাগুলো পরম নিশ্চিন্তে চিবুচ্ছে।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে রঞ্জন ওর দেহে নিবিড় ক্লান্তি অনুভব করছিলো, ওর শ্রান্ত অলস পা দুটী যেন চল্‌তে চাইছিল না, শুধু রত্নার ম্রিয়মান মুখের দিকে তাকিয়ে ও মহুয়াকে উদ্ধার করতে এসেছে। এই দৃশ্য দেখে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। পাশেই রেলের লাইন, অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড পড়েছিল, ও একটী তুলে নিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকেই মহুয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু সে পাথরের টুকরো লাগলোনা মহুয়ার গায়ে, সেই নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে তার সংগিণীর একটী পা খোঁড়া হয়ে গেল, সে আর্তনাদ করে চীৎকার করে উঠলো।

পাশের ঘর থেকে দারোয়ান-দম্পতী বেরিয়ে এল, ভূমিতে লুটিয়ে পড়া ছাগলীটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে দারোয়ানের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে মনিব মহলে চলে গেলো, দারোয়ান রঞ্জনের হাতটা চেপে ধরেছিল, কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই মনিবের হুকুমে সে হাতে কড়া পরিয়ে দিলো।

মহুয়া কি বুঝ্‌লো কে জানে—, সে বাড়ী ফিরে গিয়ে সজল চোখ দুটী মেলে রত্নার পানে তাকিয়ে রইলো। স্বামীর না ফেরবার কারণ সংগ্রহ করতে রত্নার মোটেই দেরী হোল না।

রাত্রি তখন বেশী হয়নি, আটটা কি নটা বেজেছে—নেপালী দারোয়ানকে নগদ দুটী টাকা দিয়ে রত্না স্বামীর সংগে দেখা করতে পেয়েছে; রঞ্জন তখন ছিল বন্দী, পুলিশ সাহেবের এক অন্ধকার ঘরের ভেতরে।

মেঝেয় শুয়েছিলো রঞ্জন, ওর বুকে যেন একখানা পাথর চাপানো রয়েছে, দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রত্নার হাতে ছিলো প্রদীপ, সেটা সে মাটীতে রেখে, নিজের আঁচলে স্বামীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ম্লান গলায় বল্‌লো, "জানিস, মহুয়ার তাজা মাংস, টকটকে লাল রক্ত মাখা, সাহেবকে দিলুম ; তবুও সে তোকে ক্ষমা করলো না।" "মহুয়াকে কেটে ফেললি ?" ধড়মড় করে উঠে বসে বিকৃত গলায় রঞ্জন বললে, "কেন এমন করলি রত্না, তুই বাঁচবি কেমন করে ?"

"ও আপদ বিদায় হয়েছে, ভালোই হয়েছে ! আমরা দুজনে এবার খুব সুখে থাক্‌বো, কিন্তু তোকে যে ওরা ছাড়লোনা।"

"তা-না ছাড়ুক, কয়েকদিন হাজতে আট্‌কে রাখ্‌বে বলেছে রাখুক। এই তো কয়েক স্‌টেশন পরেই হাজত—" করুণ কণ্ঠে রঞ্জন বললে, "সাহেবের চাকরাণীর ক্ষতি করেছি কিনা—তা না হলে সাহেব এমন পাঁঠা কত উদরস্থ করছে, একটা পা ভাঙ্গা তার কাছে—"

"আর সময় নেই জানিয়ে"—এইবার দারোয়ান বাইরে থেকে হুম্‌কী দিল, উঠে দাঁড়িয়ে রত্না বললো, "ক'টা দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে, মন খারাপ করিসনে যেন"—ওর সংগে কয়েক পা দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এসে রঞ্জন বল্‌লো, "খুব সাবধানে থাকিস্‌—কারখানা থেকে লোক এলে, সব কথা বলিস—"

রত্নার হাতের প্রদীপের স্তিমিত আলোয় ওদের দুজনের অশ্রুজল ঝক্‌মক্‌ করে উঠলো।

হাজতবাস অতিক্রান্তে আজ সকালবেলা রঞ্জন মুক্তি পেয়েছে, কয়েক স্‌টেশন পার হয়ে এই মাত্র সে গাড়ী থেকে ওদের ছোট স্‌টেশনে নেমে পড়লো। একটা অবিচ্ছিন্ন মুক্তির সুর, ওর সমস্ত পর্দায় পর্দায় ঝংকৃত হয়ে উঠছে। মুক্তি, অনন্ত মুক্তি, অজস্র মুক্তি, অবারিত, অবাধ মুক্তি আজ ওর যাত্রা-পথে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে,

পথের বাধা, সুখের কাঁটা মহুয়া মরেছে, রত্না তাকে আপন হাতে বিনাশ করেছে। অপার শান্তি। রঞ্জন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে রত্নার খোঁজে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু কই, রত্না তো তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে আসেনি, কি হোল তার? অসুখ করেছে? মহুয়ার শোকে তো সে মুষড়ে পড়েনি—না না সে নিশ্চয়ই তারই খাবার আয়োজন করছে—উদ্বিগ্ন মুখে রঞ্জন ওর গৃহপ্রত্যন্তে চল্‌তে লাগ্‌লো! কিন্তু একী, ওর গৃহ যে শূন্য, সব যে নিতান্ত অগোছাল হয়ে পড়ে রয়েছে, রত্না গেল কোথায়! "রত্না, রত্না, তুই কোথায় রে—"? বাড়ীর ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে রঞ্জন চীৎকার করে উঠলো।

ওদের বাড়ীর পিছনেই এক শীর্ণা নদী পশ্চিম দিকে ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলেছে—, তারই তীরে রত্না বসেছিলো, স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে রঞ্জনের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে এক করুণ আর্তনাদ করে বললো, "জানিস্ ওই জল একেবারে শুখিয়ে গেছে, শুধু রক্তের স্রোতে বয়ে যাচ্ছে, মহুয়ার রক্তের ধারা; আমি দুবেলা ওই নদীর ধারে বসে থাকি, চেয়ে দেখি ওই দিকে, কতদিন ওই রক্ত আঁজলা ভরে খাই—" অপ্রকৃতিস্থা রত্না আর বলতে পারলোনা, ও চোখদুটী মুদ্রিত করে লুটিয়ে পড়লো।

রঞ্জন তখন নিশ্চল, স্তব্ধ; পাথরের মতই অনড়, শুধু একদৃষ্টে অসংবৃতা বসনা স্ত্রীর আলু থালু কুন্তলের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তখন দিগন্তের বুকে মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র আরও দৃপ্ত হয়ে উঠেছে।

কথা ও কাহিনী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়: জন্ম—তেরশ' সাত সালে বর্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামে। পৈতৃক বাস বীরভূম জেলার রূপসী গ্রামে। ছাত্রজীবন—বর্ধমান, বীরভূম ও কলিকাতা। কাশী এ্যাংলো বেংগলী স্কুলে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝড়ো-হাওয়া'। বর্তমানে ইনি নিউ থিয়েটার্সের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

তিনকড়ি চক্রবর্তী আদালতে ওকালতি করেন। কিন্তু ওকালতি ভাল চলে না।

বার-লাইব্রেরীতে প্রায়ই দেখা যায়—হয় তিনি বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছেন, আর নয় ত' কাহারও সংগে ঝগড়া করিতেছেন।

ঝগড়া করিবার কারণ অনেক।

প্রথম কারণ—তাঁহার গায়ের রং বার্ণিশ-করা জুতার মত কালো। তাই বন্ধু-বান্ধব তাঁহার নামাকরণ করিয়াছেন—'টিকেবাবু।'

অথচ টিকে বলিলে তাঁহার রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদেরও দোষ দেওয়া চলে না। কারণ তাঁহাদেরই আর একজন উকিল-বন্ধুর নাম দীনেশরঞ্জন; বন্ধুরা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন—ডি-আর্ (D. R.)। ইঁহার নাম তিনকড়ি; কাজেই টি-কে (T. K.) বলিবার অধিকার তাঁহাদের আছে।

এই ত' গেল ঝগড়ার প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণটা একটুখানি খুলিয়া বলিতে হয়।

যে-সব উকিলের কাজকর্ম কিছু থাকে না, বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সময় যেন তাঁহাদের কাটিতেই চায় না! তাই অনেক

সময় দেখা যায়, বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া বসিয়া অনেকে নভেল পড়িতেছেন।

গল্প-উপন্যাস পড়িলে সময়টা কাটে ভাল। অথচ এই গল্প-উপন্যাস জিনিষটা আমাদের তিনকড়িবাবুর ছ'চক্ষের বিষ। চোখের সুমুখে বসিয়া কেহ-যে দিব্যি আরাম করিয়া গল্প-উপন্যাস পড়িবে তাহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। হয় তিনি হাত বাড়াইয়া ফট্ করিয়া বইখানা দেন বন্ধ করিয়া, আর নয় ত' হাতজোড় করিয়া বলেন, 'ও-সব গাঁজাখুরী গল্প-উপন্যাস আর পড়বেন না দাদা।'

কিন্তু কথা তাঁহার কেহই শুনিতে চান না।

হাতের বই বন্ধ করিয়া দিলে কেহ-বা রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া ওঠেন, আবার কেহ-বা বলেন, 'থামো টিকে, তুমি থামো।—কেন তোমার বৌ নভেল পড়ে না? তুমি পড় না?'

তিনকড়ি বাবু বলেন, 'কখ্খনো না। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও নাটক-নভেল পড়েনি। আমার বাড়ীতে ও-সব বই ঢোক্‌বার উপায় নেই।'

গল্প-উপন্যাসের উপর তাঁহার এত রাগ!

এবং এই রাগের ছুতা পাইয়া বন্ধুরা তাঁহাকে আরও ভাল করিয়াই রাগাইয়া তোলে।

সেদিন এমনি তিনকড়িবাবুকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন মনোনিবেশসহকারে উপন্যাস পড়িতে সুরু করিলেন, আর কয়েকজন সুরু করিলেন গল্প-উপন্যাসের দারুণ আলোচনা।

সশব্দে টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ড্যাম্ ইয়োর্ টিকেবাবু! ওর ভাল লাগে না বলেই দুনিয়ার লোক বুঝি গল্প-উপন্যাস পড়া বন্ধ করে' দেবে! গল্প-উপন্যাস ভাল লাগে না এমন লোক ত' বাবা কখনও দেখিনি।'

আর-একজন বলিলেন, 'দীনেন রায়ের একখানা বই পেলে আমিত' ভাই আহার নিদ্রা ভুলে যাই।'

তিনকড়িবাবু তাঁহার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়া বসিলেন। মুখের চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন এইমাত্র তিনি কুইনিন্ খাইয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন হয়ত' চুপ করিয়াই থাকিবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিলেন না। বলিলেন, 'যত সব মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে—রাবিশ্ রাবিশ্! I hate those liars and hate you as well.'

একজন লাফাইয়া উঠিল, 'কি বললে?'

'I hate you.'

'We hate y—o—u!'

আর যায় কোথা!

ইহারই সূত্র ধরিয়া চলিতে লাগিল ঝগড়া।

তিনকড়িবাবু প্রতিপন্ন করিতে চান—গল্প-উপন্যাসগুলা কিছুই নয়, শুধু মিথ্যাকথার স্তূপ, উহাতে মানুষের কোনও উপকারই হয় না।

অপরপক্ষ প্রতিপন্ন করিতে চান—গল্প-উপন্যাসের মত ভাল জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।

তিনকড়িবাবু একা। বকিতে বকিতে হয়রাণ হইয়া গেলেন। শেষে তিনি হাতজোড় করিয়া বলিলেন, 'বেশ ভাই বেশ, আমিই হার মানছি।'

অপরপক্ষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'নাকে খৎ দাও।'

রাগ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'যাও কোথা?'

'আসছি।' বলিয়া সেই যে তিনকড়িবাবু বাহির হইয়া গেলেন, সেদিন আর তাঁহার দেখা মিলিল না।

একে একপয়সা রোজগার নাই, তাহার উপর মন খারাপ। বাড়ী ফিরিয়াই বলিলেন, 'চা দাও।'

স্ত্রী তাহার দুইটি ছেলেকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, 'এই নাও এদের শাসন কর।'

'কেন, কি হয়েছে? কি করেছে ওরা?'

'কি করেছে দেখতে পাচ্ছো না?'

এই বলিয়া স্ত্রী তাঁহার ছোট ছেলেটির কপালটা দেখাইয়া বলিলেন, 'এই ত্যাখো।'

ছোট ছেলেটির কপালটা উঁচু হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাবু মেরেছে বুঝি?'

বড় ছেলের নাম সাবু।

সাবু মারিয়াছে গাবুকে।

সাবুর বয়স পাঁচ ছ' বছরের বেশী নয়। আর গাবু বছর-তিনেকের।

তিনকড়ি ভাবিলেন; ছেলেটাকে চড়াইয়া চাপড়াইয়া আচ্ছা করিয়া শাসন করেন। কিন্তু না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল, ছোট ছোট ছেলেদের শাসন করার চেয়ে মিষ্টি কথায় অপরাধটা বুঝাইয়া দেওয়া ভাল।

স্ত্রী বলিলেন, 'গাবুকে ও' দেখতে পারে না। ছোট ভাইটিকে ভালবাসবে কোথায়, চব্বিশ ঘণ্টা ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে।'

তিনকড়ি সাবুর হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'গাবুকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আমি দেখছি।'

স্ত্রী তাঁহার গাবুকে কোলে লইয়া চলিয়া গেলেন।

সাবুর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া তিনকড়িবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গাবুকে মেরেছিস?'

সাবু মাথা হেঁট করিয়া বলিল, 'হুঁ।'

তিনকড়ি বলিলেন, 'That's good. সত্যি কথা বলা ভাল।'

কিন্তু বড়ভাই ছোটভাইকে দেখিতে পারে না। ইহা ভাল নয়। বড় হইয়া চিরকাল হয়ত মারামারি লাঠালাঠি করিয়া মরিবে। এই সময় ইহার প্রতিকারের প্রয়োজন।

সাবুকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন। নিজে বসিয়াছিলেন চেয়ারে। ছেলেটা তাঁহার পায়ের উপর বসিয়া টেবিলের ওপর এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল।

উপদেশটা কেমন করিয়া আরম্ভ করিবেন তিনকড়িবাবু তাহাই ভাবিতেছিলেন। কলমটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'কলম নিয়ে খেলা করে না, নিবটা নষ্ট হয়ে যাবে।—হ্যাঁ, কেন তুমি গাবুকে মেরেছ বল।'

সাবু বলিল, 'গাবুও আমাকে মেরেছিল।'

'গাবু তোমার চেয়ে অনেক ছোট। সে তোমাকে মারতে পারে?'

সাবু তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'না পারে না! কামড়ে দেয়।'

'কিন্তু গাবু তোমার ছোট ভাই। ছোট ভাইকে আদর করতে হয়, ভালবাসতে হয়।' এই বলিয়া তিনি তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সাবু বলিল, 'হ্যাঁ, ভালবাসতে হয়! ও ওইটুকু ছেলে, কিন্তু ভারি বজ্জাত, তুমি জানো না বাবা!—আচ্ছা বাবা সেইদিন বললে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে, কই গেলে না ত?'

'যাব। কিন্তু ছাখো, শুধু শুধু কারও গায়ে হাত তুলতে নেই। কেউ যদি কাউকে মারে ত' বৃটিশ-আইন অপরাধীকে ছেড়ে দেয় না। অপরাধীর বিচার হয়। তারপর যে মারে সে শাস্তিভোগ করে।'

সাবু তাহার বাবার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। কথা-গুলা সে মন দিয়া শুনিতেছে ভাবিয়া তিনকড়িবাবু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাই তিনি না থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'মানুষ কত পরকে ভালবাসে! আর ভাই তার সহোদর ভাইকে—'

সাবু ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'হাসছো যে?'

সাবু বলিল, 'তুমি যখন কথা বল বাবা তখন তোমার এইখানটা কেমন নড়ে!'

দূর ছাই!

'আমার কথা তুমি শুন্ছো না কিছু!'—তিনকড়িবাবু বলিলেন, 'তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছো।'

সাবু বলিল, 'একটা গল্প বল না বাবা!'

'না গল্প শোনে না। গল্প আমি জানি না।'

'না, জানো না! সেই যে সেদিন সে-ই—'

'আচ্ছা বল তুমি গাবুকে আর মারবে না!'

সাবু বলিল, 'না মারবে না! আমাকে কিস্ কিস্ করে কামড়ে দেবে আর আমি বুঝি চুপ করে' থাকবো! বল না বাবা একটা গল্প!'

'না গল্প শুনতে নেই।'

'না, তুমি বল।'

'বলছি গল্প শুনতে নেই, তবু বলে—'

'বল না বাপু কি বলেছে তাই। তোমারও যেমন!'—তিনকড়িবাবু সুমুখে তাকাইয়া দেখিলেন, স্ত্রী তাঁহার চায়ের বাটি হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন।

বাটিটা টেবিলের উপর নামাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

চা দেখিয়াই হোক্ কি অন্য কোনও কারণেই হোক্ চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া তিনকড়িবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা শোনো তবে বলছি।'

বলিয়া গল্প বলিবার সেই চিরপুরাতন ভঙ্গীতেই তিনি আরম্ভ করিলেন :

'এক যে ছিল রাজা।'

সাবু নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিল। বলিল, 'তারপর ?'

'তারপর ? হ্যাঁ, তারপর—'

কি যে বলিবেন কিছুই তিনি জানেন না। তবু মনে মনে তৈরি করিয়াই বলিতে লাগিলেন, 'সে রাজার ছিল প্রকাণ্ড বাড়ী, হীরে জহরৎ লোক লস্কর, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ির আর অন্ত নেই। রাজরাণীর খুব সুখ, খুব শান্তি, শুধু একটি দুঃখু—'

'কি দুঃখু বাবা ?'

'বলি।' বলিয়া চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া দিয়া তিনকড়িবাবু বলিতে লাগিলেন, 'দুঃখু এই যে তাঁদের ছেলেদুটি মানুষ হ'লো না। রাজার দুটি ছেলে। ঠিক এই তোমরা যেমন, সাবু আর গাবু—তেমনি। ছেলেদুটি ছোটবেলা থেকে মারামারি করে, খাওয়া-খাওয়ি করে, কেউ কাউকে দেখতে পারে না। ছেলেরা বড় হ'লো। রাজা ভাবলে, আর আমার ভাবনা নেই, বুড়ো হয়েছি, এইবার ছেলেরাই সব দেখেশুনে নিতে পারবে। কিন্তু ছেলেদুটি বড় হ'লে কি হবে, ছেলেবেলার অভ্যেস্ তারা তখনও ছাড়তে পারেনি। মারামারি খাওয়া-খাওয়ি তারা কখনও করতে ছাড়ে না। একদিন কথায় কথায় দু' ভাইএর খুব ঝগড়া হ'লো। প্রথমে মুখে মুখে ঝগড়া, তারপর হাতাহাতি,

তারপর লাঠালাঠি। বড়ভাই একটা লাঠি নিয়ে এসে ছোটভাইকে এমন মার মারলে যে, ছোটভাইএর মাথাটা গেল ফেটে, রক্তারক্তি খুনোখুনি ব্যাপার। হৈ হৈ ক'রে চারিদিক থেকে লোক জড়ো হ'লো, পুলিশ এলো, কনেষ্টবল এলো, ছোটভাই দিলে আদালতে নালিশ করে'। আদালতের বিচারে বড়ভাই দোষী সাব্যস্ত হ'লো। বাস্, বড়ভাইএর হয়ে গেল চার বচ্ছর জেল। রাজবাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। রাজা কাঁদলে, রাণী কাঁদলে কিন্তু তখন আর কাঁদলে কি হবে?'

'তারপর?'

'তারপর এই সুযোগ বুঝে আর একজন রাজা তখন মেলা লোকজন সৈন্যসামন্ত নিয়ে বুড়ো রাজার রাজধানী আক্রমণ করলে।'

'কেন বাবা?'

'লড়াই করে' সব কেড়ে নেবে বলে। বাস্ খুব যুদ্ধ চলতে লাগলো। কিন্তু রাজা তখন বুড়ো হয়েছে। বড় ছেলে নেই যে সে যুদ্ধ করবে। সে তখন জেল খাটছে। বাড়ীতে শুধু সেই ছোট ছেলেটি। একা সে কিছুতেই পেরে উঠলো না। শত্রুরা বুড়ো রাজাকে মেরে ফেললে। রাজাকে মারলে, রাণীকে মারলে, ছোট ছেলেটার একটা পা দিলে খোঁড়া করে। তারপর রাজার যা কিছু ছিল,—ধন দৌলত হীরে জহরৎ টাকা-কড়ি হাতী-ঘোড়া সব-কিছু লুটে পুটে নিয়ে তারা পালিয়ে গেল। একা সেই খোঁড়া ছেলেটি বসে বসে কাঁদতে লাগলো।'

'তারপর কি হ'লো বাবা?'

'তারপর, চার বছর পরে বড় ছেলে জেল থেকে খালাস পেয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখে—তাদের আর কিছুই নেই। ছিল এত বড় রাজার ছেলে, হয়ে গেল একেবারে পথের কাঙাল, গরীবের একশেষ। ছোট ভাইটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দাদার কাছে এগিয়ে এলো। এসে কাঁদতে

কাঁদতে বলতে লাগলো, 'আমরা যদি ছেলেবেলা থেকে মারামারি না করতাম দাদা, তাহলে আজ আর আমাদের এত কষ্ট হতো না।'

গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যা। মিথ্যা কথা বানাইয়া বানাইয়া ছোট ছেলের কাছে এমন করিয়া বলা বোধকরি তাঁহার উচিত হইল না। গল্পটা শেষ করিবার পর একটা অস্বস্তিকর গ্লানি তিনকড়িবাবুকে বড় বেশী পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় ছেলেটার মনে কি যে হইল কে জানে, অপরাধীর মত শুষ্ক বিবর্ণ মুখে সাবু তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল:

'আমি আর গাবুকে কখ্খনো মারবো না বাবা।'

নির্মলচন্দ্র বর্ধন: জন্ম—তেরশ' পনের সালে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিটঘর গ্রামে। ছাত্রজীবন—কুমিল্লা ও কলিকাতা। শৈশব থেকেই ইনি সাহিত্যানুরাগী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে পাবনা জেলার পাকশী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত আছেন।

অমুর সমস্যা

নির্মলচন্দ্র বর্ধন

সাত বছরের অমু সম্প্রতি মস্ত একটা সমস্যায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। মনস্তত্ত্বমূলক গভীর সমস্যা! কিছুদিন হইতে একটি নূতন ভদ্রলোক ওদের বাড়ীতে সকাল বেলায় নিয়মিত হাজিরা দিতেছেন। বর্তমান সমস্যাটা তাঁহাকে লইয়াই।

তা সরোজবাবু অবশ্য লোক মন্দ নন। বড়দার সংগে ওঁর খুব ভাব; বড়দার সংগেই তো প্রথম এ বাড়ীতে আসেন। অমুকেও খুব আদর করেন। চকোলেট, লজেন্‌জুস খাওয়ান, ভালো ভালো ছবি উপহার দেন। আর—আর, আদর করিয়া মাঝে মাঝে ওর গাল দুটি টিপিয়া দেন। এই শেষেরটা অবশ্য অমুর খুব ভালো লাগে না। অথচ মা, সেজদি—সবাই ওকে খালি খালি এমনি করিয়াই আদর করে। এমন কি, ছোড়দিটা পর্যন্ত। কেন, সে কি এখনো ছোটটি আছে নাকি? ওর লজ্জা করে না?

সরোজবাবুকে অমুর এমনি বেশ ভালো লাগে। কেমন সুন্দর, ফর্সা মানুষটি! সব সময় হাসি হাসি মুখ; ওঁকে সবাই ভালোবাসে। মা, বাবা, বড়দা, এমন কি সেজদি পর্যন্ত। সেজদি অবশ্য বাড়ীর সকলকেই ভালো-বাসে। তবে হ্যাঁ, অন্য বাড়ীর কাউকে অবশ্য তেমন একটা ভালোবাসে না,—এক ওবাড়ীর মণ্টুকে ছাড়া। তাও মণ্টু অমুর বন্ধু বলিয়া। সরোজবাবুও বোধহয় বড়দার বন্ধু বলিয়াই সেজদি তাঁকে ভালোবাসে।

অমুর সমস্যা

এই পর্যন্ত অমু বেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু, তারপরই সব কিছু ওর কাছে কেমন রহস্যময় ঠেকে। সেজদি মণ্টুর কথা সব সময় অমুকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলে, 'মণ্টুকে আমি অমুর চেয়ে ঢের ঢের ভালোবাসি।' (অবশ্য, সত্যিই আর তা নয়, অমুকে রাগাইবার জন্যই একথা বলে, অমু তা বেশ বুঝিতে পারে)। কিন্তু, সরোজবাবুকে ভালোবাসার কথা কখনো কাহারো সামনে বলে না। একদিন অমু কৌতূহলী হইয়া সেজদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে বড়দাকে বেশী ভালোবাসে, না সরোজবাবুকে? কিন্তু, প্রশ্নের জবাব দিবে দূরে থাকুক, সেজদি এমনি ব্যস্ত, বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে অমু একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ভাঁড়ার ঘর হইতে ছোড়দির পরামর্শে আচার চুরি করিবার সময় যেমন অমুর বুকের ভিতর কি রকম ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে, কাণ গরম হইয়া ওঠে, সেজদিরও সেদিন ঠিক তেমনি অবস্থা হইয়াছিল। ঘরের দরজার দিকে ত্রস্তে একবার চোরের মত চাহিয়া অমুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিয়াছিল, 'ছি ছি, অমু, দুষ্টু ছেলে; ওসব কথা বলতে নেই।'

সরোজবাবুকেও বুঝা দায়! অমু শুনিয়াছে, তিনি কোন একটা কলেজের মাস্টার। কিন্তু, মাস্টারের মত কোন লক্ষণই তো ওঁর নাই। এই তো অক্ষয় পণ্ডিত মশায় অমুকে রোজ দুই-বেলা পড়াইয়া যান। তাঁহাকে দেখিলেই অমুর কেমন ভয়ে গা শির শির করিতে থাকে। কিন্তু, সরোজ বাবুকে দেখিলে একটুও ভয় করে না। তা ছাড়া, তিনি নাকি আবার ডাক্তার। কিন্তু. কই, কাহারো অসুখ হইলে তো তিনি ডাক্তারী করেন না। ছোড়দি বলে, সরোজবাবু নাকি লেখাপড়ার ডাক্তার, অসুখের নন, যাঁরা মস্ত বিদ্বান্ তাদের নাকি ডাক্তার বলে। ছোড়দি অবশ্য নিজেও ভালো জানে না। পড়ে তো মোটে ক্লাস 'এইটে'। তবুও, ভাবখানা এমনি যেন ও অমুর চেয়ে কত বেশী জানে!

তবে হ্যাঁ, সরোজবাবু যে মস্ত পণ্ডিত তাতে ভুল নাই। এই তো, সেজদি যে কলেজে এত এত বই পড়ে, তা সেজদিকেও তো আজকাল উনি পড়া বুঝাইয়া দেন। বেশী বিদ্বান্ না হইলে কি আর সেজদিকে পড়াইতে পারিতেন! সেজদি যে অনেক লেখাপড়া জানে, এবার পাশ দিলেই ছোড়দির মাষ্টার অমলবাবুর মত বি, এ পাশ হইবে।

সরোজবাবু বড়দার বন্ধু। বড়দা তো কবে বৌদিকে নিয়া বগুড়া চলিয়া গিয়াছে; তবু উনি রোজ আসেন। কই, অমু বাড়ী না থাকিলে অমুর বন্ধুরা তো কেউ এ-বাড়ীর ছায়াও মাড়ায় না। অবশ্য মণ্টুটা মাঝে দাঝে সেজদির কাছে যায় লজেন্‌জুসের লোভে। কিন্তু, সরোজবাবু তো নিজেই কত লজেন্‌জুস বিলাইয়া দেন, তিনি লজেন্‌জুসের লোভে সেজদির কাছে যাইবেন কেন? ঠিক ওঁকে বোধ হয় সেজদির মাস্টার রাখা হইয়াছে। তাই প্রতিদিন আসেন, বৃষ্টি বাদলেও বাধা করেন না। ঠিক অক্ষয় পণ্ডিত মশায়ের মত। বৃষ্টির সময় কতদিন অমু খুসী হইয়া ভাবিয়াছে এবেলা বোধহয় পণ্ডিত মশায় আর আসিলেন না। কিন্তু, তিনি ঠিক আসিয়া হাজির হইয়াছেন, এবং অমুকে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। একদিনও তিনি বাধা করেন না। এ বিষয়ে তিনি আর সরোজবাবু ঠিক একই রকম।

কিন্তু, একটা বিষয়ে ওদের দুইজনের মধ্যে মিল নাই। বাবা যেদিন বাড়ী থাকেন, সেদিন পণ্ডিত মশাই অমুকে অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখেন। আর বাবা যেদিন বাড়ী না থাকেন সেদিন বেশ তাড়াতাড়ি চলিয়া যান। সরোজবাবু কিন্তু তার ঠিক উল্টা। বাবা বাড়ী না থাকিলে সেজদিকে খুব বেশী করিয়া পড়ান। আর বাবা যেদিন বাড়ী থাকেন সেদিন সেজদিকে আগেই ছাড়িয়া দেন, এবং বাইরে আসিয়া বাবার ঘরে বসিয়া গল্প করেন।

সেদিন রাত্রে মা বাবাকে বলিতেছিলেন, 'সত্যি, দুটিতে বেশ মানাবে

কিন্তু। তাছাড়া, অনু সরোজকে বোধ হয় মনে মনে অপছন্দ করে না। ছেলেটীকে দেখলেই আপনার করে নিতে সাধ যায়। দেখো না চেষ্টা করে।' বাবা মৃদু হাসিয়া জবাব দিলেন, 'তা দেখলাম যেন। কিন্তু, কেবল মেয়ের আর মেয়ের মায়ের পছন্দ হলেই তো হবেনা, সরোজেরও তো পছন্দ হওয়া চাই।' 'তার জন্যে তোমাকে অত মাথা না ঘামালেও চলবে! আমি যা বলি তাই কর। ওর অভিভাবকের মধ্যে তো আছেন ওর দাদা—খুলনার ডাক্তার। তাঁকে লিখে দেখ।'

সেজদি-সরোজবাবু-প্রসংগে অমুর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'সত্যি মা, বেশ মানাবে। সেজদি সরোজবাবুকে খুব ভালোবাসে।' মা ও বাবা হাসিয়া ফেলিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন। মা তর্জনী তুলিয়া হাসিয়া শাসনের ভংগীতে কহিলেন, 'যাঃ, বোকা ছেলে কোথাকার! সব কথাতেই কথা বলা চাই।' অমু ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

হুঁ, মা যে কি মনে করেন অমুকে। যেন সে কিছুই জানে না। কেন সেজদির সংগে যে সরোজবাবুকে মানায়. এ কি আর অমু বোঝে না? সরোজবাবুও সুন্দর, সেজদিও সুন্দর—খুব সুন্দর! আর, দুজনে যখন মুখোমুখী হইয়া বসে তখন দুজনকেই আরো কেমন সুন্দর দেখায়। সমস্ত মুখ, চোখ যেন মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। কার সংগে যে কাকে মানায় সে জ্ঞান অমুর খুব আছে। এইতো, ওর নিজের সংগে অক্ষয় পণ্ডিত মশাইকে মোটেই মানায় না। দুজনে সাক্ষাৎ হইলে অমুর তো সারাক্ষণ কেবল বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে। আর পণ্ডিত মশাই প্রায় সব সময় কেমন কট্‌মট্ করিয়া তাকান অমুর দিকে। হুঁ, সরোজবাবুর সংগে সেজদিকে ঠিক মানায়।

মস্ত একটা সমস্যার সমাধান করিয়া অমু সন্তুষ্টভাবে মাথা নাড়িল।···

কিন্তু,—কিন্তু, মার শেষের কথাগুলোর মানে ঠিক বুঝা গেল না তো? কিসের চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সে চেষ্টার সংগে সরোজবাবুর দাদারই-বা কি সম্পর্ক? তিনি তো ডাক্তার,—মা বলিলেন। তা, সরোজবাবু নিজেওতো ডাক্তার, পড়াশুনার ডাক্তার। ওঁর দাদা বোধ হয় অসুখের ডাক্তার। বাড়ীতে কাহারো অসুখ করিলে তো পাড়ার অমূল্য ডাক্তারকেই ডাকা হয়। তা ছাড়া কলকাতায় আরো কত সব বড়ো বড়ো ডাক্তার আছেন। সেবার যখন ছোড়দির নিওমোনিয়া হয়, কত ডাক্তার ওকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু, কই, সরোজবাবুর দাদাতো আসেন নাই। বোধহয়, সরোজবাবুর নিজের অসুখ, তাই ওঁর দাদার কথামতো ওষুধ দিতে হইবে।

অমু ছোড়দির সন্ধানে ছুটিল। ছোড়দি লীলা খুব মন দিয়া কি একটা লিখিতেছিল, অমু সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'ছোড়দি ভাই!' ছোড়দি খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, 'এই যে এসেছে জ্বালাতে! কি চাই, শীগ্‌গির বল্‌। ইস্‌, অ্যালজেব্রার সব কটা আঁক শেষ করতে না পারলে সান্ত্বনাদি' ক্লাশে আজ খেয়ে ফেলবে!' বলিয়া আবার খাতার ওপরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

ছোড়দির ওপর অমুর বিষম অভিমান হইল। ইস্‌, মেয়ের রকম দেখ! যেন ভূভারতে আর কেউ পড়াশুনা করেনা। এইতো, সেজদিকে একগাদা মোটা মোটা বই পড়িতে হয়। কিন্তু, যখনই অমু ওর ঘরে যায়, সেজদি ওকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কত গল্প করে, ছবি দেখায়! না! ছোড়দিটা একটুও ভাল নয়। সেজদি খুব—খুব ভালো। অমু চলিয়া যাইবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

ছোড়দির অ্যালজেব্রা বোধ হয় ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছিল। সে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিমুখে কহিল, 'কিরে অমু, কি চাই?' গরজ বড় বালাই!

অভিমানটা আপাতত মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অমু কহিল, 'আচ্ছা ছোড়দি, বাবা সরোজবাবুর দাদাকে চিঠি লিখবেন কেন?' ছোড়দির কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল: 'সে কিরে, বাবা আবার তাঁকে চিঠি লিখতে যাবেন কেন?' অমু বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, লিখবে। মা বলল, সেজদির সঙ্গে সরোজবাবুকে বেশ মানাবে; তবে খুলনায় ওঁর ডাক্তারদাকে চিঠি লিখতে হবে, এই সব। আচ্ছা, ছোড়দি ভাই, সরোজবাবুর অসুখ করেছে নাকি?'

ছোড়দি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'ওঃ, তাই নাকি? সত্যি অমু, সরোজবাবুর অসুখ, ভীষণ অসুখ। কলকাতার বিধান রায়, নীলরতন সরকার, এঁরা কেউ সারাতে পারবেন না। তাইতে, সরোজবাবুর দাদা চিকিচ্ছে করবেন।' বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

অমু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। সরোজবাবুর যদি ভীষণ অসুখই করিয়া থাকে, তবে ছোড়দির ইহাতে হাসিবার অত কি থাকিতে পারে? ছোড়দিটা কি হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল নাকি? সে বিস্মিতভাবে চলিয়া আসিতেছিল, পিছন হইতে ছোড়দি আবার ডাকিয়া বলিল, 'শোন্ অমু, সরোজবাবুর অসুখ, ভীষণ অসুখ। একেবারে হার্টের অসুখ।'

অমু কিছু বুঝিতে পারিল না। সবটা ব্যাপার ওর কাছে প্রহেলিকার মত মনে হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, পরদিন সকালে সরোজ বাবু না আসা পর্যন্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হইবে না। সারাটা দিন অমু চিন্তার মধ্যে কাটাইল। পরদিন সকালে অক্ষয় পণ্ডিত মশাইএর কাছে ছাড়া পাওয়া মাত্র সে উঠিয়া সেজদির ঘরের দিকে দৌড়িল।

ঐতো, সরোজবাবু আজো ঠিক সেজদিকে পড়াইতে আসিয়াছেন। কই, ওঁরতো কোন অসুখ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না! ডাক্তারের মতো তীক্ষ্ণ, গম্ভীর দৃষ্টিতে অমু একবার সেজদি ও একবার সরোজবাবুর

দিকে চাহিল। সেজদি কি একটা বই পড়িতেছে, সরোজবাবু মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলিয়া দিতেছেন। ওঁর চোখ কিন্তু সব সময় সেজদির মুখের উপর। বোধহয়, সেজদি যাহাতে পড়া ফাঁকি না দেয় সেজন্য কড়া নজর রাখিয়াছেন। ঠিক অক্ষয় পণ্ডিত মশাই-এর মত। তাই বলিয়া অমন কট্‌মটে দৃষ্টি নয়!

দু'পা একপা করিয়া আগাইয়া অমু একেবারে সরোজবাবুর কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সরোজবাবু আদর করিয়া ওর হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'এই যে অমুবাবু, এসো এসো।' আলিংগনবদ্ধ হইয়া অমু শিষ্টভাবে খানিকক্ষণ সেজদির পড়াশুনা পর্যবেক্ষণ করিল। 'ইস্, অত মোটা মোটা সব বই মানুষে পড়ে কি করে?' অমু মনে মনে ভাবিল। তারপর আসল বক্তব্য বিষয় মনে পড়িতেই উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। তারপর একসময় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সরোজবাবুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, 'জানেন, বাবা আপনার দাদাকে চিঠি লিখবেন?'

সরোজবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'আমার দাদাকে? কেন?' 'ছোড়দি বলেছে, আপনার নাকি ভীষণ হার্টের অসুখ, তার ব্যবস্থা করতে আপনার দাদা আস্‌বেন।' 'কে বলেছে, লীলা? হা হা হা।' হাসিতে হাসিতে সরোজবাবু চেয়ার হইতে প্রায় গড়াইয়া পড়িলেন। 'হা হা, বেশ বলেছে লীলা। সত্যি আমার হার্টের অসুখ, ভয়ানক অসুখ। অনু, আমার এ রোগের কথা জানাতে গেলেই তুমি তেড়ে উঠতে এদ্দিন। এইবার বাড়ীশুদ্ধ জানাজানি হয়ে গেল যে! তোমার বাবা তবু তোমার মত নিষ্ঠুর নন তাই রক্ষা। তাই দাদাকে লিখছেন, শীগ্‌গির এর ব্যবস্থা করতে। শুনছ অনু? ওকি, আবার রাগ হলো নাকি?'

অমু অবাক! অসুখের নামে কে কবে এত সুখী হয়? অমুর নিজের তো ওটা খুব বিশ্রী জিনিষ বলিয়াই বোধ হয়। সারাদিন বিছানায়

পড়িয়া থাকিতে হয়, ভালো খাবার পাওয়া যায় না, বন্ধুদের সহিত কলরব ও দৌড়াদৌড়ি করা যায় না, অসহ্য! আর সেই অসুখের নামে সরোজ-বাবুর এত ফূর্তি! সেজদি'র রকম্ সকম দেখিয়াও অমু অবাক হইল। বই বন্ধ করিয়া সে পিছন ফিরিয়া জানলার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রাগ করিয়াছে বলিয়াও তো বোধ হয় না। হয়তো সরোজবাবুর অসুখের ভাবনাই ভাবিতেছে।

ওদিকে সরোজবাবু বকিয়া চলিয়াছেন, 'অনু! অনি! অনীতাদেবী! পেত্নী!' এতক্ষণে সেজদির মৌনতা ভাঙিল। ঘাড় ফিরাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'আচ্ছা বেশ, একফোঁটা ছেলের সামনে যতো বাজে ইয়ার্কি—হুঁ।' 'ঘাট হয়েছে, আর একফোঁটা ছেলের সামনে বলব না। এবার তোমার বাবার সামনে গিয়ে সবিনয়ে বলব : আমার সত্যি ভীষণ হার্টের রোগ, এবং এ রোগের ছোঁয়াচ শ্রীমতী অনীতাদেবীকেও লেগেছে। কেমন, হল তো?' সেজদি হতাশ কণ্ঠে কহিল, 'বাবাঃ কি বেহায়া আর কি অসভ্য আপনি! আচ্ছা, আমি যদি আর কথা বলেছি—' 'আচ্ছা, বলো না। জানো অমুবাবু, সেজদিরও ভয়ানক হার্টের অসুখ!'

সেজদি রাগিয়া কহিল, 'আবার! আবার ছোট ছেলের সাম্‌নে ঐ সব বাজে কথা?' সরোজবাবু হাসিয়া কহিলেন, 'এই তো কথা বললে। কথা বলবে না আবার!' সেজদি আবার পিছন ফিরিয়া বলিল, 'কক্ষনো বলব না।' 'বলবে না?' 'না।' 'বেশ। পড়াশুনা আজ আর হবে না?' 'জানি না।' 'পরীক্ষা সামনে, এটুকুন জানো?' 'জানি না।' 'পরীক্ষা দেবার মতলব নেই বোধহয়?' 'জানি না!' সরোজবাবু মিহিসুরে সেজদি'র গলার অনুকরণ করিয়া ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, 'জানি না! দেখলে অমু, সেজদির খুব অসুখ। এমন কি, ঠিক ঠিক কথার জবাব পর্যন্ত দিতে পারছে না।'

নির্মলচন্দ্র বর্ধন

…উঁহু, লক্ষণ কোন পক্ষেরই ভালো মনে হইতেছে না। অমুর মনে হইল, সরোজবাবু ও সেজদি উভয়েরই অসুখ খুব বেশী। অবিলম্বে চিকিৎসার দরকার। অমু ছোড়দির সন্ধানে বাহির হইল।

ছোড়দিকে ঘরে পাওয়া গেল না। সে হয় তো ছাতে দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীর রেবাদির সংগে এতক্ষণে আলাপে মত্ত, এই ভাবিয়া অমু একবার সারাটা ছাত ঘুরিয়া আসিল। একবার পেয়ারাতলাটায় উঁকি মারিল। খানিকটা বৃথা খুঁজিবার পর কি একটা কথা মনে হইতেই অমু সেজদির ঘরের দিকে চলিল। ঘরের সাম্‌নে আসিয়া দরজার পর্দা একটু ফাঁক করিতেই হঠাৎ অমুর গতিরুদ্ধ হইল, চক্ষুর পরিধি বিস্তৃত হইল। একি! সরোজবাবু সেজদিকে একেবারে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া ওর মুখে চোখে অনবরত চুমো খাইতেছেন। আর সেজদিও, সেজদিও—। অকৃত্রিম বিস্ময়ে অমু খানিকক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে চাহিয়া রহিল। তারপর চমক ভাঙিতেই সে সন্তর্পণে ফিরিয়া চলিল।

অমু শুনিয়াছে, কুকুর ক্ষেপিয়া গেলে কেবলি কামড়াইতে আসে। হার্টের অসুখ হইলেও বোধহয় মানুষ তেমনি কেবলি চুমো খায়। নাঃ, সরোজবাবুর দাদাকে শিগ্‌গির খবর দেওয়া দরকার। অসুখ খুব বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইয়াছে। অমু এবার উদ্বিগ্নচিত্তে মার সন্ধানে চলিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ জন্ম—উনিশ শ' সতেরো খৃষ্টাব্দে, দিনাজপুর জেলায় বালিয়াডাংগিতে। পৈতৃক নিবাস—বরিশাল জেলায় বাসুদেবপাড়া গ্রাম। ছাত্র-জীবন—বরিশাল ও কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। 'বিভীষিকার মুখে' ও 'মরণের মুখোমুখি' পুস্তকের যুগ্মলেখক।

জল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন বাড়ীটা দেখে খুশী হলেন সকলেই।

অবশ্য সকলেই বল্‌তে তো মাত্র তিনটি লোক,—তিনটিই বা কেন, আড়াইটি; তিন বছরের মেয়ে চাঁপাকে পুরোপুরি একটি মানুষ বলে না ধর্‌লেও চলে।

সত্যি, চমৎকার বাড়িখানা। সহরের এত কাছে থেকেও তার বিষাক্ত প্রভাব থেকে নিজেকে চমৎকার মুক্ত করে রেখেছে। লেবুর চিরশ্যামল কুঞ্জ আর ঘননিবিষ্ট সুপারীবনের ভেতর দিয়ে লাল কাঁকর মেলানো ছোট্ট পথটি একেবারে দালানের সিঁড়িতে এসে ঠেকেছে। দরজার দু'দিক দিয়ে ফুলন্ত আইভি-লতা বেড়ে উঠেছে অপর্যাপ্ত অজস্রতায়, আকাশে বাতাসে এমন বসন্তের রঙ—মৃদু মদির একটি কষায় গন্ধ চারদিকের স্বপ্নাতুর পরিমণ্ডলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

অরুণা বল্‌লেন, "ছ'খানা ঘর? বাবাঃ, এত দিয়ে কী হবে! একটা তোমার বসবার, একটা পড়বার, দু'টো শোবার, একটা ভাঁড়ার—"

শেখর হেসে বল্‌লেন, "সে হিসেব পরে হবে, কিন্তু চল, বাড়িটার চারদিক একবার ঘুরে দেখি। আর সব চাইতে সুবিধে কি জানো? এই বাড়ির সীমানার মধ্যেই বেশ বড় পুকুর রয়েছে, পরিষ্কার নীল জল—"

—"বড় একটা পুকুর! বল কি!" আনন্দে অরুণার প্রায় কণ্ঠরোধ হয়ে এলো: "বাড়ির সীমানার মধ্যেই? একেবারে আমাদের নিজেদেরই তো? বাঁধানো ঘাট আছে? ইচ্ছে মতো চান—"

শেখর সকৌতুকে বল্লেন, "হাঁ, সব। কিন্তু ভয়ংকর গভীর, একবার পা ফস্কে জলে পড়ে গেলেই—ব্যাস্!"

—"চল না, দেখে আসি। ইঃ, গভীরের ভয় দেখাচ্ছ তুমি! ছেলেবেলায় যখন মামাবাড়ী থাকতুম, তখন দস্তুরমতো সাঁতার শিখে নিয়েছিলুম, মশাই। প্রথম প্রথম নারকেল, শেষে কলসী নিয়ে এপার ওপার করতুম্। একবার সে যা কাণ্ড! তখনো ভালো করে ভাস্তে শিখিনি,—মাঝ পুকুরে গিয়ে পেটের নীচ থেকে কলসী গেল সরে। কাছেই ছিল সোনাদি, তাকেই জাপ্টে ধর্লুম। তারপর দু'জন মিলেই যাই আর কি! ভাগ্যিস্, মেজ মামা সে সময় ঘাটে এসে পড়েছিলেন, নইলে দু'জনেরই সেদিন হয়ে যেত নিশ্চয়—" অরুণা খিল্খিল্ করে হেসে উঠ্লেন।

ফল-ফুলের এলোমেলো বাগানটা ডিঙিয়ে দু'জনে যখন ঘাটে এসে পৌঁছলেন, তখন সামনে দীঘির কাকচক্ষু জলের দিকে চোখ বুলিয়ে শিশুর মতো উৎফুল্ল আর উচ্ছল হয়ে উঠ্লেন অরুণা। শরতের শান্ত সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে তখন ঘুমের মতো প্রশান্তি নেমে আসছে; পুকুরের নীল জলে ধূসর ছায়া বিকীর্ণ হয়ে গিয়েছে,—জলের ওপর অযত্নে ছড়িয়ে দেওয়া ছোট ছোট একরাশ পদ্মপাতায় শেষ সূর্যের রক্ত-রশ্মি। পুকুরের চারিদিক ঘিরে স্থল-পদ্মের নিবিড় কুঞ্জ, নীচের শীতল-স্নিগ্ধতার প্রসারিত বুকে তাদের প্রতিবিম্ব ঝিল্মিল্ কর্ছিল। মার্বেল-বাঁধানো ঘাট্লার একেবারে নীচের স্তরটিতে যেখানে জল টলমল কর্ছে, সেখানে পাথরের গায়ে গায়ে জমে উঠেছে সবুজ শৈবাল,—ছোট ছোট মাছ তারই ভেতর কী যেন ঠুকরে বেড়াচ্ছিল।

জলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দিয়ে অরুণা বল্‌লেন, "বাঃ!"

শেখর বল্‌লেন, "ভোর বেলা উঠে দেখো, পুকুরের চারপাশ হাজার হাজার স্থলপদ্মে কী রকম আলো হয়ে থাকে! আর জলের ভিতর যখন তাদের ছায়া পড়ে—"

—"কী সুন্দর! আচ্ছা জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘাট্‌লার ধারে এসে বস্‌তে কেমন চমৎকার লাগ্‌বে বল তো! ঝুর-ঝুর করে বাতাস আস্‌বে, জলের ভেতর পড়বে জ্যোৎস্নার রঙ্‌—"

কিন্তু শেখর তাঁকে কথা শেষ কর্‌তে দিলেন না।

—"দেখেছ, দেখেছ, কত বড় ঘাই দিয়েছে একটা? প্রকাণ্ড রুই, পুরো পাঁচসেরের কম নয় নিশ্চয়ই। জ্যোৎস্না-ফোস্না পরে যা হয় হবে, কিন্তু কালকেই বড়দেখে একটা মাছ ধরাতে হচ্ছে। আঃ, এতদিন চালানী মাছ খেয়ে মুখের যা অবস্থা হয়ে আছে,—পাকা একটা রুই তুল্‌তে পার্‌লে খাসা হবে।"

সস্নেহ তিরস্কারে অরুণা বল্‌লেন, "কী অসম্ভব পেটুক বাপু তুমি! খাবার কথা ছাড়া আর কোনো কথাই যেন নাই দুনিয়াতে। এত যে দিন রাত্তির খাচ্ছ, হয় না বুঝি তা'তে?"

শান্তি-পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন সংসার।

শেখর মোটা মাইনেয় কী একটা সরকারী চাকরী করেন,—চাকরী হওয়ার পরে কলকাতার বাইরে এই প্রথম বদলি; কিন্তু কৃষ্ণনগর জায়গাটা একেবারে খারাপ নয়। কলকাতার এত কাছে থেকেও কলকাতা থেকে এত অদ্ভুত রকমে স্বতন্ত্র! ভিড় নেই, আতিশয্য নেই, ধোঁয়া, ধুলো আর কলরব এখানে প্রত্যেকটি মুহূর্তকে আবিল করে তোলে না। অবশ্য, অফিসের অজস্র কাজকর্মের ঘূর্ণাবর্তে সে কথা শেখরের মনেও থাকে না,—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সাইকেল

ছুটিয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরে আসেন, তখন চারিদিকের এই নিরুত্তাপ স্নিগ্ধ প্রশান্তি কিংবা এই কাব্যময় পরিমণ্ডল নিয়ে ফেনায়িত হয়ে ওঠবার মতো শরীর বা মন কোনোটাই তখন তাঁর খুব বেশী অনুকূল থাকবার কথা নয়। সন্ধ্যার পরেও তাঁর বিশ্রাম নেই, চা খাওয়া শেষ করে রাশীকৃত কাগজপত্র সাম্‌নের টেবিলে মেলে দিয়ে এবং মুখে গড়গড়ার নলটি নিয়ে তিনি রায় লিখ্‌তে বসেন—রাত সাড়ে দশটার সময় খাওয়ার ডাক না পড়া পর্যন্ত সে কাজ শেষ হয় না।

কিন্তু অরুণার তা নয়। ক্লান্ত অলস দুপুরে সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর চোখে মায়াময় হয়ে ওঠে। চাঁপাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তিনি যখন জানালায় এসে বসেন, তখন দেখা যায়, স্থল-পদ্মের ছায়া-পল্লবের আড়ালে আড়ালে দীঘির জল অজস্র রৌদ্রে ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে; সে দীপ্তি দৃষ্টিকে আহত করে না; উজ্জ্বল খানিকটা রূপার ফেনার মতো ঢেউয়ের দোলায় দুল্‌তে থাকে,—যেন হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে। কার্পেটের কাজটা নামিয়ে রেখে চোরের মত পা' টিপে টিপে তিনি দীঘির দিকে এগিয়ে যান।

নীলাভ জলের রঙ্‌ গিয়েছে বদলে,—শাদা, অভ্রের মতো শাদা।

নীচের দিকে তাকালে বুঝি দশহাত গভীর জলের তলায় ছড়ানো নুড়ি-পাথরগুলোকে অবধি সুস্পষ্ট দেখা যায়। প্রসারিত পাখনা আর রূপালি দেহের আভাস জলের নীচে ঝলকে ওঠে—আধো প্রকাশিত রহস্যের মতো কৌতূহলকে তীক্ষ্ণ করে তোলে।

আর কী শীতল,—কী সযত্ন এই জলের পেলব স্পর্শ। অরুণা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দেন—স্নিগ্ধ একটা শিহরণ সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে শিরুশিরে আনন্দে বয়ে যায়।

স্নানের সময় অনেকক্ষণ জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে থাক্‌তে ভালোবাসেন

অরুণা। এমন পরিপূর্ণ আরাম, এমন নিঃশংক আনন্দ—পরিতৃপ্তিতে তাঁর দুটি চোখ যেন বন্ধ হয়ে আসে। কতদিন, কতকাল, এমন করে জলের নিবিড় স্নেহের মধ্যে মেলে দেবার অবকাশ পাননি তিনি। ছেলেবেলায় মামাবাড়ীর সে ইতিহাস স্মৃতির পাতায় ফিকে হয়ে এসেছে,—রেখাটাই মনে পড়ে, সম্পূর্ণ রূপটা নয়। আর কলকাতায় কলের অতি কৃপণ বর্ষণ, চৌবাচ্চার নিতান্ত সংকীর্ণ পরিসর প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু বাহুল্য নেই সেখানে।

কিন্তু যা একটুকু ভয়—তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে।

জল দেখলে তার নির্বোধ আনন্দ। মায়ের সংগে সে স্নান করতে আসে, দু'হাতে জল নিয়ে উচ্ছৃংখল উল্লাসে খেলা করে, সিঁড়ি ধরে পানকৌড়ির মতো ডুব দেয় ঝুপ ঝুপ করে। মাঝে মাঝে ভয় হয়: কোন সময়ে টপ করে বুঝিবা গভীর জলে পড়ে যাবে।

অরুণা বলেন, "লক্ষ্মীটি, আর ডুবিয়ো না, জ্বর হবে যে।" মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে চাঁপা। বড় বড় চুলগুলো জলে ভিজে কপালের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ সেই চুলের আড়াল থেকে তার দুষ্টু চোখ চক্‌চক্ করে। টুক্‌টুকে মুখের ভিতর ইঁদুরের দাঁতের মতো ক্ষুদে দাঁতগুলি ঝিলিক দেয়,—আবার সে ঝুপ্ ঝুপ্ করে জলের মধ্যে ডুব দিতে সুরু করে।

বাধ্য হয়ে অরুণা হাত ধরে ওপরে তুলে আনেন। চাঁপা আপত্তি করে, প্রতিবাদ করে, হাত পা ছুঁড়ে অসন্তোষ জানায়। শুক্‌নো তোয়ালে দিয়ে ভালো করে গা মুছিয়ে দিতে দিতে অরুণার মনে পড়ে: কাল শেষ রাত্রের দিকে বেশ একটু গা গরম হয়ে উঠেছিল মেয়েটার। তার ওপর এম্‌নি করে ঠাণ্ডা জলে স্নান,—অসুখ বিসুখ কোনো একটাতে না পড়ে যায় আবার।

সন্ধ্যায় নতুন করে রূপ বদলে যায় পুকুরটার।

আকাশের রঙ্ বিবর্ণ হতে থাকে, তারপর তার ক্রম-পাণ্ডুর বিস্তৃতি কালো অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়ে। শ্লেটের মতো দীঘির জল কালো হয়ে ওঠে—নক্ষত্রখচিত আকাশের প্রতিবিম্ব জলের ওপর থর্ থর্ করে: স্থল-পদ্মের ছায়াগুলির নীচে অন্ধকার আরো বেশী ঘন হয়,—বাতাসের শিথিল স্পর্শে পদ্মপাতাগুলি খস্ খস্ করতে থাকে।

অথচ শেখরকে এ রূপ যে দেখানো যাবে তার জো কি!

সকালে তো ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই অফিসের তাড়া,—সন্ধ্যায় যখন কাজ থেকে ফিরবেন, তখনো ওই নিজের পড়ার ঘরটি ছাড়া আর কোনো কিছুর সংগে সংশ্রব নেই। আর শুধু কী তাই! ডাক দিয়ে বলবেন, "ঘাটে বসে এখন কী করছ অরুণা! কার্তিক মাসে বেশ হিম পড়ছে আজকাল, ঠাণ্ডা লাগিয়ে শেষে একটা অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বস্‌বে নাকি! ঘরে এসো।"

উত্তর অবশ্য অরুণারও তৈরীই রয়েছে: "দিব্যি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, ঠাণ্ডা কোথায় গো! কি ঘরকুণোই যে হয়েছ তুমি, বেরিয়ে একবার এসেই দেখ না।"

কিন্তু শেখর আর কোনো কথাই বলবেন না, বেরিয়ে আসা তো দূরের কথা; ইচ্ছা করে যে, তা নয়। আইনের ঘূর্ণিপাকে আর কাজের অতলতায় তাঁর মন তখন এমন ভাবেই হারিয়ে গেছে যে বিষয়ান্তরে এর বেশি মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাইরে তখন ঘননীলিম অন্ধকারে স্থল-পদ্মের বীথি বাতাসে উঠছে মর্মরিত হয়ে, দীঘির জলে কল্লোলিত বিচিত্র প্রলাপ—আর স্বপ্ন-বিধুর সেই পরিমণ্ডলটার মধ্যে আকাশের স্বচ্ছন্দ বিস্তৃতির নীচে মুগ্ধ হয়ে বসে আছেন অরুণা, তখন শেখর খস খস্ করে কাগজের শুক্‌নো পাতাগুলো উল্‌টে চলেছেন;

কীটের মতো কালো কালো আঁকাবাঁকা অক্ষর—কঠিন বৈষয়িকতার ছন্দে ছত্রে ছত্রে বাঁধা—পুরু পরকলার চশমার মধ্য দিয়ে শেখর একাগ্র চোখে তাদের বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছেন। বাতাসে তাঁর কপালের ওপর চুল উড়ছে—ঘরময় পোড়া-তামাকের গন্ধ! অরুণার মাঝে মাঝে মনে হয়, শেখর বড় তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলেন, বড় শিগ্‌গির শিগ্‌গির হারিয়ে গেলেন তিনি; এখনো আকাশ ছিল উজ্জ্বল, এখনো সম্মুখে ছিল বসন্ত, এখনো অপচয়ের অবকাশগুলো একান্তভাবেই যায়নি নিঃশেষিত হয়ে! কিন্তু শেখর দূরে সরে গেলেন,—অত্যন্ত দূরে। হাত বাড়িয়েও তাঁকে আর কাছে টেনে আনা যায় না।

পুকুরটার সংগে তাঁর যেটুকু সম্পর্ক—সেটুকু নিতান্তই দৈহিক, একান্তই স্থূল। স্নান করেন তিনি তোলা জলে, সে জলও ভালো করে গরম করে দেওয়া চাই। একেইত ম্যালেরিয়ার একটা অস্বাভাবিক বিভীষিকা আছে তাঁর মনে, কৃষ্ণনগরে এসে সে বিভীষিকাটা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। পুকুরে স্নান করবার কথাতেও তিনি আতংকে লাফিয়ে উঠবার উপক্রম করেন।

মাঝে মাঝে বলেন, "এবার কতগুলো পোনা ছাড়বো পুকুরে। আরো তিনচার বছর যদি থাকতেই হয় এখানে, তা হলে তার জন্যে আগে থেকেই খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা উচিত, কী বলো?"

উত্তর দেন না অরুণা। পুকুরটাকে ভালো লাগবার সংগে সংগেই মাছগুলোর সম্বন্ধেও তাঁর মনে কেমন একটা দুর্বলতার সঞ্চার হতে সুরু হয়েছে। জালের মুখে বড় বড় রুই-কাত্‌লা যখন ডাঙার উপর উঠে অন্তিম শক্তিতে দাপাদাপি করতে থাকে, আর তাদের কান্‌কো বেয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে বেরিয়ে আসে টক্‌টকে লাল রক্ত, তখন অদ্ভুত একটা করুণায় সমস্ত মন ভরে যায় অরুণার।

—"আহা, পোষা জীব! ওগুলোকে ধরিয়ো না অমন করে।"

—"পোষা জীব!" শেখর হো হো করে হেসে ওঠেন, "ওদের পোষা হয়েছে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে? মানুষের রসনা-তৃপ্তিতেই যে ওদের জন্মের চরম আর পরম সার্থকতা, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

এমন যে শেখর, তাঁরও মাঝে মাঝে চিত্ত-বৈকল্য যে না ঘটে, তা নয়।

সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল: শরতের প্রসন্ন উজ্জ্বল চাঁদ। প্রতি শুক্লা-চতুর্দশীর রাত্রেই আকাশে এমন করে চাঁদ ওঠে;—কিন্তু অরুণার মনে কতদিন পড়েনি তার ছায়া! বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া পূর্ণিমা আবার ফিরে এল—ফিরে এল বহুদিনের স্বপ্ন-সুরভির আব্ছায়া সংকেত।

শেখর পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "সত্যি অরুণা, কী চমৎকার দেখাচ্ছে পুকুরটাকে! বাড়ীটা কিন্তু বেশ ভালোই হয়েছে আমাদের, না?"

বিহ্বল ভাবে অরুণা বল্লেন, "ভালো বই-কি। আচ্ছা, আমাদের এই পুকুরটার চারদিকে যদি কতগুলো নারকেল গাছ থাকত, তা হলে কেমন দেখাত বল তো? জ্যোৎস্নায় জলের মধ্যে তাদের ঝিল্মিলে সুন্দর ছায়া পড়ত, বাতাসে শুক্নো পাতাগুলো খর্ খর্ করত—"

শেখর বল্লেন, "তা ছাড়া দু'চারটে ডাবও পাওয়া যেত সময় অসময়ে। যা গরম এখানে। দুপুরে এক গ্লাস্ ডাবের সরবৎ পেলে—"

অরুণা ভ্রূভংগী করলেন—"দুনিয়ায় সব শুদ্ধু খালি খেতেই শিখেছ, তাই না?"

—"তা না তো কী? তুমি অন্নপূর্ণা আছ যখন, তখন আমার ভাবনা কি বল তো?"

শির্শিরে হাওয়া—আরামে শরীর শিথিল হয়ে আসে। শেখর অরুণার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়্লেন। কতদিন পরে তিনি

আজ এমন করে আত্ম-সমর্পণ করে দিয়েছেন স্ত্রীর কাছে। অরুণা ধীরে ধীরে তাঁর চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগ্‌লেন। নীচের পুকুরের জলে জ্যোৎস্নার উৎসব—মার্বেল পাথরের বাঁধানো ঘাট্‌লায় মৃদু তরংগের আঘাত! অরুণা কথা কইছে। স্বপ্ন-গুঞ্জনের মতো—পৃথিবীর চেতনা অসংবৃত।

কিন্তু বেশীক্ষণ থাক্‌বার জো কি! চাঁপা জেগে উঠেছে, ঘুম থেকে। তার কান্নার স্বর ভেসে এল। অরুণা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে দুপুর—বাইরে শান্ত স্তব্ধতা। কখন যে অরুণা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন. তা তিনি নিজেই টের পাননি। ঘুম যখন ভাঙ্‌ল, তখন বিকালের রোদ ম্লান হয়ে জানলা বেয়ে তাঁর বিছানায় এসে পড়েছে। ঘুম-ভাঙা চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, চাঁপা বিছানায় নেই।

চীৎকার করে অরুণা ডাক্‌লেন, "চাঁপা!" উত্তর এল না।

ধড়মড় করে অরুণা বিছানা থেকে নেমে এলেন। চাঁপা কোথাও নেই। এঘরে নয়, ওঘরে নয়, কোনোখানেই নয়। তবে কি?—

ভয়ে অরুণার বুকের সমস্ত স্পন্দন যেন থেমে গেল।

ডাক-চীৎকারে চাকর-বাকর, প্রতিবেশী যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটল। অফিসে খবর গেল—শেখর সাইকেল নিয়ে ছুটে এলেন।

চাঁপার সন্ধান মিল্‌ল শেষ পর্যন্ত—কিন্তু অনেক দেরীতে। এতক্ষণ জলে থেকে তার টুক্‌টুকে ফর্সা রঙ্ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভিজে চুলগুলোতে সমস্ত কপাল মুখ ঢাকা। ঘুমের মতো প্রশান্ত শান্তিতে তার চোখদুটি বোঁজা—টকটকে লাল ফ্রকটা সমস্ত গায়ে আঠার মতো লেপ্‌টে রয়েছে।......

অরুণার যখন মূর্ছা ভাঙ্‌ল, তখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। বিহ্বল

অর্থহীন চোখে তিনি দীঘির দিকে তাকিয়ে রইলেন ; পূর্ণিমার রাত্রি,—সমস্ত জলটাই তরল রূপার মতো জ্বলছে ; অদ্ভুত সুন্দর, অদ্ভুত ছলনাময় ! আজ অরুণার মনে হল, ওই রূপের মধ্যে শুধু সৌন্দর্যই নেই,—আছে হিংসা, নিষ্ঠুর রাক্ষস-হিংসা ! ওই হাসির অন্ধকার অতল থেকে মৃত্যুর কালো একখানা হাত মুষ্টি প্রসারিত করে আছে,—হত্যা করতে চায়, গ্রাস করতে চায় !···যে রূপকে তিনি মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন, সে রূপ তার ভালোবাসা চায়নি— চেয়েছে জীবন,—চেয়েছে বলিদান। তার সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত প্রবঞ্চনা, সে রাক্ষস!

অরুণা অস্ফুট আর্ত চীৎকার করে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লেন।

মধ্যরাত্রে অরুণার ঘুম ভেঙে গেল।

পাশেই শেখর অঘোরে ঘুমুচ্ছেন,—সমস্ত দিনের ক্লান্ত উদ্বেগ আর তীব্র বেদনার করুণ পাণ্ডুর ছাপ তাঁর মুখে। অরুণার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। ঘরের দেওয়ালে নীল শেড্ দেওয়া আলোটা মিট্‌মিট্ করছে, চারপাশে অস্পষ্ট কতকগুলো ছায়া—সমস্ত ঘরটাকে এই মুহূর্তে ভালো করে চিনে নেওয়া যায় না। বাইরে হাস্‌নুহানা ফুটেছে : সুপারী বন বাতাসে দুল্‌ছে শোঁ শোঁ করে।

বিছানার এদিকটা খালি—এখানে চাঁপা থাক্‌ত। তার ছোট ঝালর দেওয়া নীল বালিশটা পায়ের দিকে পড়ে আছে, অয়েলক্লথটা জড়ানো। সেই বালিশ আর অয়েলক্লথটাকে বুকের নীচে চেপে ধরে অরুণা উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে লাগ্‌লেন। নাঃ, কালই এ বাড়ী ছাড়্‌তে হবে—এখানে আর থাকা চলে না, এক মুহূর্ত নয়।

নিঃশব্দ ঘরের মধ্যে টিক্ টিক্ করতে লাগ্‌ল ঘড়িটা, মন্থর ক্লান্ত গতিতে কাঁটাগুলো ঘুরে চলেছে : বেড়ে চলেছে বাইরে শব্দহীন রাত্রি। অরুণার কান্না আর শেষ হতে চায় না।

হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন, একটা প্রচণ্ড, অতি প্রচণ্ড তৃষ্ণায় তাঁর বুক জ্বলে যাচ্ছে। রাত্রে কিছুই খাওয়া হয়নি,—সবটাই যেন একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন। আর সারাদিনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষুধাই যেন তৃষ্ণার রূপ নিয়ে তাঁর কণ্ঠে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

অরুণা খাট থেকে নেমে এলেন। ঘুমের মধ্যেই শেখর পাশ ফিরলেন—শোনা গেল তাঁর ভারী একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। স্খলিত পদে কুঁজোটার দিকে এগিয়ে গেলেন অরুণা।

জল নেই, এক বিন্দু জল নেই। আজ সারাদিনের মধ্যে জল তুলবার কথা কারো মনেই ছিল না। রাত দুটোর সময় কলে যে জল পাওয়া যাবে, সে আশাও বিড়ম্বনা।

জল—সামনেই জল। পূর্ণিমার আলোয় গলানো রূপার মতো জ্বলছে—অপূর্ব, অপরূপ! তৃষ্ণাতুর অরুণাকে সে জল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। পদ্মপাতায় জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে, স্থল-পদ্মের কুঞ্জে কুঞ্জে বিচিত্র আলো-আঁধারি। রজনী-গন্ধা আর অপরা-জিতার লতা-বিতানের মধ্য দিয়ে পথটি সোজা মার্বেল বাঁধানো ঘাটলাটির দিকে নেমে গেছে।

অসহ্য, অসহ্য তৃষ্ণা। অরুণা এগিয়ে চললেন! লতা-বিতান পার হয়ে তিনি ঘাটলায় এসে পড়লেন, দ্রুত পা ফেলে একেবারে জলের কোলে নেমে গেলেন।

কী শীতল, কী আশ্চর্য স্নিগ্ধ!

দু' হাতে অঞ্জলি পূর্ণ করে তৃষ্ণার্ত অরুণা আকণ্ঠ জলপান করতে লাগলেন।

মা

প্রীতিবিকাশ রায়চৌধুরী

প্রীতিবিকাশ রায়চৌধুরী ঃ জন্ম—উনিশ শ' সতেরো সালে, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত দাসেরজংগল নামক গ্রামে। পৈতৃক বাসভূমি ফরিদপুর জেলায়। ইনি ছাত্র-জীবন অতিবাহিত করেছেন ফরিদপুর, ঢাকা ও বরিশালে।

চারদিকের দেওয়ালের তিনটি জানালা খুলে দিলে ঘরটি রোদে ভরে যায়। পরন্তু শীতের ভালোলাগা উষ্ণ আলো—লালচে নরম আলোয় শুভ্র দেওয়ালগুলি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে। মাঝখানে সারি সারি রেখাটানা যে থ্যাব্‌ড়ানো রোদ্দুরটুকু জানালা দিয়ে গড়িয়ে এসে পশ্চিমের দেয়ালে পড়ে—সেই আলোর স্রোতে ছোট ছোট অসংখ্য ধুলার কণা স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে থাকে।

সাদা নেটের মশারীর উপর সূঁই-এর মতো সূক্ষ্ম আলোর শিখাটা জ্বলতে থাকে—কেবল একটা ফ্যাকাশে আলো চোখের বন্ধ পাতার ওপর কাঁপতে থাকে—প্রশান্ত প্রতিদিন এই আলোর হাত-ছানিতে চোখ মেলে তাকায়। দু'হাতে চোখটা একটু রগড়ায় প্রশান্ত—তারপর হাতদুটি টান করে দু'হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়িয়ে শরীরটা এলিয়ে দেয়। তারপর কয়েকবার মিটিমিটি করে তাকিয়ে দরজার দিকে মুখ রেখে পাশ ফিরে শোয়। গভীর আলস্যে সমস্ত শরীরের উপর কেমন যেন একটা ভাল লাগা সূক্ষ্ম অনুভূতি পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়া আলোর শিখার মতো কাঁপতে থাকে। ক্ষুদ্র, নরম, শিয়রের বালিশটাকে জোরে আকড়ে ধরে মৃদুচাপে বালিশের ওপর মুখটা ঘষতে থাকে প্রশান্ত।

সকাল বেলাকার এই আলসেমী ভাল লাগে প্রশান্তর। ঘুমে-

ডুবো সারা রাতের পর শরীরের প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগগুলি যেন শিথিল হয়ে যায়—একটা করুণ অলসতা, একটু সৌখীন অভিব্যক্তি যেন সারা দেহমনে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে শুয়ে শুয়ে লেপের উষ্ণ পরিবেষ্টনীর ভিতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগের ইচ্ছা জাগে। হাত পা' যে-দিকে ইচ্ছা ছড়িয়ে দিতে পারো,—লেপটা তুমি গায়ের উপর থেকে সরিয়ে ফেলতে পারো—মাথার বালিশটা পাশে সরিয়ে বসে শুধু তোষকে মাথা রেখে ইচ্ছা হলে তুমি শুয়ে থাকতে পারো। কেউ মানা করবে না—অসুবিধা হয় বলে বাধা দিবে না কেউ। সত্যি কথা বলতে কি, এর জন্যই লেপের ভিতরের গরম আবেষ্টনীতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগের ইচ্ছা জাগে প্রশান্তর।

মৃদু টিক্ টিক্ শব্দে যে টাইমপিস্‌টা দেয়ালের ব্র্যাকেটের উপর চলতে থাকে—প্রশান্ত মশারীর ভিতর থেকে চোখের কোণে চেয়ে দেখল সাতটা বেজে পাচ মিনিট। রাগে প্রশান্ত চোখ বুঁজে ফেলল।

দেয়ালের উপর থেকে ঘড়িটা না সরালেই নয়, অসভ্যভাবে ঘড়িটা সারা সময় চলতে থাকে। কেন, এখন সাতটা না বাজলেই নয় নাকি—আর একটু পরে বাজলেও তো চলত ?

রেণুর ঘরে ঘড়ি দরকার, রেণুকেই ঘড়িটি দিয়ে দেবে প্রশান্ত। সারা সময় চোখের ওপর থেকে ঘড়িটা দৃষ্টিদাহ ঘটাচ্ছে প্রশান্তর। ঘড়ির টাইম মতো প্রত্যেকদিনই উঠতে হবে নাকি তার? মানুষতো আর মেশিন নয়?—সাতটার সময় ওঠে পড়তে বস্—নয়টার সময় স্নান করে সাড়ে দশটায় কলেজে 'এটেণ্ড' কর! আজ নয়টায় উঠবে সে, প্রতিজ্ঞা করে বসল প্রশান্ত।

নাঃ, আর পারা গেল না। দেখ, ঘড়ির কাঁটাটা কি বিশ্রীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে সুরু করেছে। প্রশান্ত পাশ ফিরে শুল।

প্রীতিবিকাশ রায়চৌধুরী

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়—মা আসছেন নিশ্চয়ই। প্রত্যেক-দিনই সকাল বেলা মা আসেন : পড়তে বসিস্ নি প্রশান্ত?

বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রগতিতে বইটি টেনে নিয়ে মেলতে মেলতে উত্তর দেয় প্রশান্ত : পড়ছিই তো আমি।

: ভালো করে পড় বাবা, এগ্‌জামিন তো এসে পড়লো,—কোণের জানালাটা খুলতে খুলতে মা বলেন।

একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে প্রশান্ত : পড়ছিই তো। তুমি কেবল সারা সময়ই বল : পড়তে বস্ ভালো করে—পড়—শুধু শুধু—। বাইশ বছরের প্রশান্ত মার কাছে ছেলে-মানুষ হয়ে ওঠে—পাঁচ বছরের ছেলের মতো অনুযোগ আব্দার করতে থাকে।

মার মুখ থেকে মুক্তো ঝরে পড়ে—মা হেসে ওঠেন। চাপা হাসিতে সমস্ত মুখখানি ফোটা শেফালীর মতো বিকশিত হয়ে ওঠে!

: তোদের ভালোর জন্যই তো বলি রে প্রশান্ত—পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রশান্তের দিকে তাকান মা—মায়ের চোখের মাঝে ছোট্ট প্রশান্ত বই পড়তে থাকে।

মা সুন্দর, নিখুঁত সুন্দর—ঈষৎ দীর্ঘ দেহরেখা জড়ানো যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা, সাবলীল গতিভংগীতে হাঁটেন মা। প্রশান্ত মাকে ভালোবাসে, ভয়ানকভাবে ভালোবাসে মাকে। প্রশান্তর বিশ্ব ভুবন মায়ের গানে মুখরিত।

প্রশান্তর কোঁক্‌ড়ানো চুলে মায়ের চাঁপার কলির মতো আঙুল গুলি খেলা করতে থাকে—মায়ের বুকে মুখ লুকায় সে। ছোট ছেলের মতো দু'হাতে আক্‌ড়ে ধরে মাকে—অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে, "মা, মা, মা।" মায়ের বুকের উষ্ণস্পর্শ আশীর্বাণীর মতো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

মা

কবে কোন কালে জানে না প্রশান্ত তা,—একদিন মায়ের মনের মাঝে নীড় বেঁধেছিল সে—তারপর মায়ের রক্তের রুনুঝুনুতে প্রকাশ পেল তার হৃদস্পন্দন। মায়ের স্নেহ ও পীযূষে মন্থর গতিতে বেড়ে উঠেছে প্রশান্ত। মায়ের শাড়ীর ভাঁজের মাঝে মুখ রেখে স্রষ্টাকে মনে মনে প্রণতি জানালো সে।

: কি পাগ্‌লামো করছিস প্রশান্ত—পড়্ এখন,—মায়ের স্বর-ঝংকারে ভর্ৎসনা। প্রশান্তের কপালের উপর চুমু খেয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। প্রশান্ত একমনে পড়তে থাকে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ স্ফুট হইতে স্ফুটতর হ'য়ে উঠল—চঞ্চল চরণে ঘরে ঢুকল রেণু। : ও মা, এখনো ওঠোনি নাকি তুমি সেজ্‌দা ?—রেণু ঝংকার দিয়ে ওঠে।

রেণু মায়ের সজীব ইমিটেসন্—সেইরূপ স্মিত চোখে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। হাঁটা চলা কথাবার্তাতে মনে হয় যেন মা ছোট্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সারা দেহে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের প্রাচুর্য।

: চশমা নেওয়াটা তোমাদের একটা বিরাট ঔদ্ধত্য, আর—প্রশান্ত হঠাৎ কথা কেড়ে নিয়ে বলে,—আর বর্বর বিলাসিতা।

হাসির ছটায় রেণুর সমস্ত মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—চশমার ঈয়ারহুটো কানের ত্'পাশে বসে যায় ঈষৎ: সকাল বেলাটায়ই ঝগড়া সুরু করলে নাকি তুমি ? ওঠোনা,—আর কতো ঘুমুবে।

তারপর কেমন একটু মিনতিপূর্ণ আদুরে কণ্ঠে বলে: আমার কাল্‌কে থেকে এক্‌জামিন সুরু—তোমার ঘড়িটা একটু দাওনা সেজদা—? ঘড়িটা হলে একটু সুবিধে হয় পড়ার।

: নাও, কৃপামিশ্রিত স্বরে বলে প্রশান্ত: নাও—আবার পরীক্ষা

শেষ হ'লেই দিয়ে যেও কিন্তু—জানোতো ঘড়ি না হলে আমার এক মিনিটও চলে না?

: আচ্ছা, দেবো—বলে তাকের উপর থেকে ঘড়িটা পেড়ে নিয়ে চলতে থাকে রেণু—নীচের সিঁড়িতে কলকণ্ঠ শোনা যায়: সেজদা' এখনো ঘুমুচ্ছে মা!

দেয়ালের ওপরের জানালা গলানো রোদ্দুর মেঝের ওপর নামতে থাকে—আকারও ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর হয়ে যায়। ঘরের দেওয়ালে বদ্ধ আকাশটি এবার পরিপূর্ণভাবে দেখতে পায় প্রশান্ত।

সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল—প্রশান্ত উঠে বসতে না বসতেই মা এসে পড়লেন: এখনো উঠিসনি প্রশান্ত?

: এই তো উঠ্‌ছি মা।

: এই তো উঠছি—তোদের যেন আর খেয়াল থাকে না বাপু! বেলা কি কম হ'লো? তারপর পড়্‌বি শুন্‌বি কখন? আজ বাদে কাল তো এক্‌জামিন—মায়ের স্বরে লঘু অনুযোগ ছড়িয়ে পড়ে।

বিছানার ওপর একটা হাঁটু রেখে দুই হাতে মা মশারীটা তোলেন, হাতের দোলানিতে শাঁখা ও চুড়ির সূক্ষ্ম সুরের জলতরংগ বাজতে থাকে।

: ওকি, তোর চোখটা ছলছল করছে কেনরে শান্ত, দেখি জ্বর-টর এলো নাকি আবার—মায়ের চোখে তীব্র উদ্বেগ উঁকি মারতে থাকে। প্রশান্তের নাতিশীতোষ্ণ কপালের উপর হাত রাখেন মা।

কেমন একটু স্নেহলোভাতুর অন্তরে পাঁচ বছরের ছোট্ট খোকার মতো দুই-হাতে আকড়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ রেখে মৃদু কণ্ঠে ডাকে প্রশান্ত—মা, আমার মা!

পথের প্রশ্ন

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

কালিদাস মুখোপাধ্যায়: জন্ম—তেরশো বাইশ সালে, নারায়ণগঞ্জে। পৈতৃক বাসভূমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাঁসারা গ্রামে। ছাত্রজীবন কলিকাতায়।

জীবনটা কাব্য নয়, কিন্তু মহাকাব্য।

তা' না হলে যা হবার নয় তা' হয় কেমন করে!

আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না; ফিলোজফি ক্লাসে একটী তরুণী প্রফেসরের সঙ্গে এসে আস্তে আস্তে ঠিক আমার সামনের বেঞ্চে বসলো। ক্লাসের সব কোলাহল থেমে গেল, শুধু দিকে দিকে চলতে লাগলো পরস্পর চোখের দৃষ্টি বিনিময়।

মেয়েটিকে সুন্দরী কিছুতেই বলা যেতে পারে না; দেখতে কালো, ঠোঁট ওলটানো, চোখে মুখে সচঞ্চল হাসি ছড়ানো—অবয়বে বসন্তের দখিন বাতাস, নানাবর্ণ ও গন্ধের ফুলে যেন ভর্তি। রোদলাগা পাতার মতো তার চলার ছন্দ, নিঃশব্দতায় সে আপনি মুখর। আজ এই অত্যন্ত সাধারণ, অনেকের কাছে যে কুরূপা, তাকে দেখে বুকের মধ্যে দোলা লাগলো—সাগরের উত্তাল ঊর্মিমালার যেন প্রচণ্ড দোলা, কিন্তু চাঞ্চল্য জাগলো না এতটুকু, স্তব্ধতায় যেন একান্ত পূর্ণ।

লীলা। চমৎকার নাম—তার হাসি, তার চাউনি সবই লীলায়িত। লীলার সংগে পরিচয় হয়েছে, মৌন পরিচয়, আলাপ এখনো হয়নি। তবে লীলার সংগে আমার যে পরিচয় হয়েছে সেটা নিতান্ত একতরফা নয়, মানে আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে পরিচিত হয়েছি, যদিচ তা নিঃশব্দতার মধ্যে।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে দেখা গেল একটা অঘটন ঘটেছে; আমরা

দুজনে দু'জনকে ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু বাইরে তার এতটুকু প্রকাশ নেই, শব্দ নেই। মৌন বলেই তা গভীর, স্তব্ধ বলেই তা' ব্যাপক, চাঞ্চল্যহীন বলেই তা অন্তবিহীন।

লীলা সুন্দরী নয়। তবু তাকে ভালবাসি; কেন ভালবাসি তার কারণ জানিনে, হয়ত একটু কারণ আছে, হয়ত বা নেই।

জীবনের পথে চলতে চলতে লীলাকে পেয়ে আমি নিজেই গর্ব-বোধ করি। গর্ববোধ করবার সত্যই কি কোন কারণ আছে? কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি লীলার কথা ভেবে গর্ববোধ করি, খুসীতে আমার মন ভরে ওঠে। লীলার জন্য আমার সবিশেষ গর্ববোধ আছে, এ'জন্যেই বারবার অকারণে সকাল সন্ধ্যায় তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করি, লীলার দেখা পাব এই আশায় নয়, তাকে দেখতে পাবো না এই আশংকায়।

জীবনের পথে এগিয়েই চলেছি; লীলার সহিত সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠেছে। একটু একটু বৃষ্টি পড়চে, লীলা এসে পড়বার ঘরে ঢুকলো, বললে,—কি পড়ছেন অশেষবাবু?

চমকে উঠে চেয়ে দেখি লীলা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লাম, আবার 'আপনি' কেন লীলা! যাকে জীবনে বন্ধু বলে স্বীকার করতে হয় তার সংগে অমন আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাব থাকলে চলে না: আমরা এখন বন্ধু, 'আপনি' শব্দটার সমাধি হোক্ এবার।

—তাই হোক, লীলা হেসে জবাব দিলে: ওটা কি পড়ছো?

—একটা কবিতা, এইমাত্র লিখেছি। শুনবে?

—পড়ো।

কবিতা পড়া শেষ হ'লে লীলা বললে, কবিতাটা লিখেছ 'প্রেম ও

প্রয়োজন' নিয়ে ; তোমার অতলস্পর্শী প্রেম তোমার মানসীর জন্য আসন পেতে রেখেছে, প্রয়োজন তাতে বাধা জন্মাচ্ছে। এইতো বলতে চেয়েছ?

—হুঁ।

—আচ্ছা, একি শুধু একটা কবিতা, না, এ তোমার ব্যক্তিগত কথা?

—ব্যক্তিগত কথা কিনা জানি নে, তবে এ' আমার প্রাণের কথা, অভিজ্ঞতার কথা!

—প্রয়োজন যদি তোমার মানসীকে তোমার সংগে মিলতে না দেয় তা'হলে তার জন্য তুমি অমন ব্যাকুল কেন? তাকে সখীরূপে সহচরী-রূপেই বা চাও কেন? পৃথিবীতে তো এমন মেয়ের অভাব নেই যে তোমাকে বিয়ে করতে পারে!

—মেয়ের অভাব নেই জানি, কিন্তু যাকে ভালবাসতে পারি এমন মেয়ের সন্ধান তো আজও একটি ছাড়া অন্য কারও পাইনি। বিয়ে অবিশ্যি যাকে হয় করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করলেই তো তাকে ভালবাসা যায় না, তার প্রতি অবিশ্যি স্বামীর সব কর্ত্তব্যই করা যেতে পারে। এ'জন্যেই বিশেষ একজনের প্রতি আমার এত মমতা।

লীলা বল্‌লে, যাকে পাবে না তার প্রতি মমত্ব থেকে তো লাভ নেই, বরং যন্ত্রণাই পেতে হয়!

—তাকে কোনদিন পাবো না, এ যে কত বড় পাওয়া, তা' তো তুমি জানো না লীলা। পাওয়াটা ক্ষণিকের আর না-পাওয়াটাই যে চিরন্তন! তাকে পাবো না বলেই তো তাকে জীবনের প্রতিমুহূর্তে পাবো!

লীলা নীরব।

দুঃখের ক্লান্ত মুহূর্তগুলি কিছুতেই এগোতে চায় না, যেন অশীতি-বর্ষ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ; আর আনন্দের দিনগুলো কেমন করে যে চলে যায় তা' আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে। লীলার সাহচর্যে

দিনগুলি ঝর্ণার জলের মতো ভেসে চলেছে। বছরের অনেকগুলো দিনই গত হয়েছে অতীতের গর্ভে, ঝরাফুলের মত ভেসে গেছে কে জানে কোন সন্ধ্যাসাগরকূলে। কালথেকে কলেজের ছুটি আরম্ভ।

লীলা বল্‌লে, চলো অশেষ, এ্যাস্‌প্লানেডের দিক থেকে আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—চলো।

পার্কের কর্ণারে দু'জন বসে আছি। ঘনায়মান সন্ধ্যা নেমে এলো, আলো জ্বলে উঠলো, সশব্দ গাড়ীর চাকার শব্দে দিগন্ত উৎকীর্ণ; ওদিক হ'তে ভেসে আসছে রেস্তোরাঁর চা আর লালজলের বোতলের টুং-টাং টুং শব্দ। এমনি সন্ধ্যা। মনে হ'ল সৃষ্টি বুঝি বিধাতার অমুর্বর! লীলা ভুলিয়ে দিলো সে-কথা তার লীলায়িত উছল চাউনিতে।

দেহের চারদিকে চঞ্চলতা ছড়িয়ে দিয়ে, কানের দুলজোড়া একবার দুলিয়ে বল্‌লে, অশেষ, তুমি অনেকবার বলেছ সৃষ্টির কাজ হয় আনন্দের মধ্যে, রস-প্রবাহের ভিতর। কিন্তু আমি বলছি, না, তা' নয়। সৃষ্টি হয় বেদনার মধ্যে, দুঃখের মন্ত্রজপের ভিতর দিয়ে।

—কি করে জানলে?

—এই দেখ না, মা যে ছেলের জন্ম দেন তার জন্য তাকে কত দুঃখ ভোগই করতে হয়।

—ভুল করেছ লীলা, তুমি উপায়টাকেই পরিণতি মনে করেছ। মা যে সন্তানের জন্মদানের জন্য কষ্ট সহ্য করেন সেটা শুধু উপায়, পরিণতি তার আনন্দ। সাধারণ মানুষ এখানেই করে ভুল। কবি কাব্য সাধনায়, কাব্যসৃজনে কত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে দেন, যদি বেদনাই সৃষ্টির মূল হ'ত তবে মানুষ কোনদিনই স্বেচ্ছায় দুঃখ স্বীকার করতো না। মানুষ জীবনে দুঃখ পেতে চায় না এতটুকু, মানুষ সুখেরই

কাঙাল। সৃষ্টির কাজে আনন্দ আছে, বাইরে সেটা সাধারণের কাছে বেদনা বলে মনে হয়, কিন্তু সত্যিই তা বেদনা নয়, আনন্দেরই রূপান্তর।

লীলা উদাসদৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ভাবছে। উচ্ছ্বাসে সে ভরপুর, পরাজয়ে গর্বিত, তার চঞ্চল চোখে ঘনিয়ে এলো দীর্ঘদিনের শ্রান্তি, রাত্রির ম্লানিমা। লীলা চুপ করে আছে। আমি বলে চল্‌লাম :

মানুষ মানুষকে ভালবাসে, ভালবাসতে গিয়ে হয়ত তারা দুঃখ পায়, বিচ্ছেদের বেদনা জীবনের পেয়ালাখানি দেয় ভরিয়ে। তবু মানুষ ভালবাসে মানুষকে, বিচ্ছেদ করে কামনা। কেন করে? কারণ তার মধ্যে আছে আনন্দ, আনন্দই রূঢ়তার ঘায়ে বাহ্যিক বেদনার রূপে প্রকাশ পায়।

ভালবাসায় আনন্দ আছে দিগন্তব্যাপী—গিরিনির্ঝরের মতো তা চিরপ্রবহমান। বিচ্ছেদের মধ্যেও আছে তার তরংগায়িত আনন্দরূপ। সে যেন বর্ষার পদ্মার মত সীমাহীন। মানুষ তাই বিরহকে করে ভয়, তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু বিচ্ছেদ আছে বলেই না মিলন সার্থক!

লীলা এবার নীরবতা ভেঙে বললে, আচ্ছা অশেষ, জীবনে ভালবাসা না হ'লে কি চলে না?

—চল্‌বে না কেন লীলা, তবে কিনা জানো—

কথাটা শেষ না হতেই লীলা বললে, যদি চলেই যায় তো তার জন্য মানুষ অমন আকুলি বিকুলি করে কেন?

হেসে বল্‌লাম, কারণ আছে বৈকি! মিলনটা ভালবাসার বড় কথা নয়—সব চেয়ে বড় কথা হ'ল ভালবাসাটাই। মানুষ যদি কাউকে ভালবাসতে না পারে তা'হলে তার জীবনটা নিতান্তই রুক্ষ বলতে হবে, কাউকে ভালবাসতে না পারলে এ পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলোক,

চন্দ্র-সূর্য, বসন্ত আর নদীর কলধ্বনি কোনটাই উপলব্ধি করা যায় না—এদের তত্ত্ব বুঝতে হ'লে ভালবাসা দরকার একজনকে। তার ভালবাসার মধ্য দিয়েই সব কিছু বুঝতে পারা যায়, নিজকে চেনা যায়। তাই প্রেমের প্রয়োজন। আমার কবিও এ' কথাই বলেন।

লীলা বল্‌লে, তোমার কবি তো মস্ত বড় প্রেমিক।

—হবেই বা না কেন?

—না, তা' বল্‌ছিনে। আচ্ছা তোমার কবিটি কে?

—জানো না?

—না! ওঃ! কবিতো তুমিই, না?

—কবি আমি নিজে নই। আমার মধ্যে দু'জন আছে, একজন আমি, আর একজন আমার কবি। এই কবি আমার মানুষটি থেকে একেবারে আলাদা!

—বেশ, তা-ই না হয় হ'ল, কিন্তু তোমার কবি প্রেমের কবিতা অত লেখেন কেন?

—কারণ প্রেম জিনিষটা তিনি অনুভব করেছেন অন্তরের মধ্যে।

—প্রেম জিনিষটা তো পুরুষের একচেটিয়া নয়, প্রেম করতে মেয়েরাও পারে, আর করেও। কিন্তু কৈ তারা তো প্রেমের কবিতা লেখে না।

—তুমি বল্‌লে, 'প্রেম করতে মেয়েরাও পারে, আর করেও,' কিন্তু তা একেবারেই সত্য নয়। প্রেম করে পুরুষ আর মেয়েরা পুরুষের কাছ থেকে তা' করে গ্রহণ। মেয়েরা পুরুষের প্রেমের আশ্রয়। কিন্তু মেয়েদের প্রেমের উপলব্ধি নেই—প্রেমের কবিতা তাই তারা লিখতে পারে না।

—অশেষ, এ তোমার যুক্তি নয়, অলংকার। মেয়েদের ভালবাসা অত্যন্ত গভীর, তাই তা স্তব্ধ। শব্দের ঝাঁজে মেয়েরা তাদের ভালবাসাকে ম্লান করে তুলতে চায় না—অন্তরের গভীরে তারা তাদের মৌন প্রেমের

নীড় রচনা করে রাখে প্রিয়তমের জন্য। আর ছেলেরা যে বসে বসে অসংখ্য প্রেমের কবিতা লেখে তা'তে করে এই প্রমাণিত হয়, তারা বাগাড়ম্বর বিস্তারে নিপুণ—ভণ্ডামির আর্ট তারা আয়ত্ত করেছে।

লীলার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা খোঁচা ছিল ; সে খোঁচাটা আমার বুকে তীব্র হয়েই বাজলো। রাত্রি বেড়ে চলেছে, বললাম, এবার উঠা যাক।

আমি সাহিত্য চর্চা করি। কারণ লেখার মধ্যে নিজকে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে পাই ; লীলা যদি লিখতো তবে সে জানতে পারতো সে যে কী এবং কী রহস্যে এ পৃথিবী ভরা। কিন্তু লীলা লেখে না—কতবার যে তাকে লিখতে বলেছি। শেষ পর্যন্ত যখন সে লিখবে বললো তখন আর তার লেখা হ'ল না, তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। পুরুষের সাহিত্য চর্চা আর মেয়েদের বিয়ে একই কথা!

অনেক দিন পর লীলাদের বাড়ী গেলাম। একেবারে সোজা উপরে গিয়ে উঠলাম। লীলা টয়লেট টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে—আকাশে ভেসে যাওয়া কালো মেঘের মত তার সুদীর্ঘ চুলগুলো বিলম্বিত। জানালা দিয়ে একটু একটু বাতাস এসে চুলে দোল দিচ্ছে ; সে যেন ললিত ছন্দের দোল, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন খুঁজে পাওয়ার মতো তার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে সুনিবিড় তৃপ্তি। মেয়েদের চুল, এমন লোভনীয়তা যার মধ্যে, এমন রূপতরংগ যেখানে হিল্লোলিত, তাকে ভাল লাগে না কার?

বাতাসে ছড়ানো চুলগুলি দেখে মনে হ'ল সেগুলো যেন আমায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে—যেন বল্ছে, 'এসো বন্ধু, এসো।'

পিছনফিরে লীলা অকস্মাৎ চম্‌কে উঠলো, সহসা কিছু বলতে পারলো না। তার ঠোঁটদুটোতে স্তব্ধ ব্যাকুলতা, চোখে বেদনার ঔজ্জ্বল্য। মৃত্যুর মতো পাণ্ডুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে বল্‌লে, ছিঃ ছিঃ! অশেষ—

অবাক হয়ে লীলার মুখের পানে তাকালাম, লীলা একপাশ থেকে গোটাকয়েক সাপ্তাহিক, মাসিক বের করে বললে, আমায় নামে এ সব কী বিশ্রী কবিতা লিখেছ !

—বিশ্রী কবিতা তো আমি লিখি না।

ঝাঁজের সহিত লীলা বল্‌লে, কবিতা যাই হোক, আমার নামে তুমি কবিতা লিখবে কেন ?

একটু থেমে বললাম, লীলা, অত গর্ব ভাল নয় ! তুমি এমন কিছু সুন্দরী বা বিদুষী নও যার জন্য পাতার পর পাতা কবিতা তোমায় নিয়ে লিখবো ! তোমায় নিয়ে কোন কবিতাই আমি লিখিনি। হাঁ, তোমার নাম হয়ত কবিতায় আছে, কিন্তু তোমার নয়। বাঙ্‌লা দেশে তোমার নামই শুধু লীলা নয়, অমন অনেক লীলাই হয়ত আছে, তা' ছাড়া লীলার একটা আভিধানিক অর্থও আছে।

বাড়ী ফিরে মনে হ'ল লীলাকে আঘাত করা ঠিক হয়নি ; কিন্তু তাকে তো ব্যথা দিয়েছি, নিজের ব্যথাটাকেই জাগিয়ে রাখবার জন্য। তবু তাকে একটা চিরকুট লিখে পাঠালুম, লীলা ভুল করেছ, তুমি যদি একান্তে সোজা করে জিগ্যেস করতে, হয়ত বলতাম কবিতাগুলো তোমায় নিয়েই লিখেছি, কিন্তু তোমার অহংকারই জাগিয়ে দিলো আমার ঔদ্ধত্য। তোমায় হয়ত ভালবাসি ; কিন্তু তা বলা চলে না, বুঝে নিতে হয়। গায়ত্রীমন্ত্র আমরা কারও কাছে বলি না, ভালবাসাটা তা-ই—প্রকাশ করলে মাহাত্ম্য যায় কমে। অনুচ্চারিত প্রেমই সত্যিকারের প্রেম।

লীলা লিখলে, কালই যাচ্ছি একেবারে বিন্ধ্যাচলে, কবে ফিরবো জানিনে। তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারছি নে, সময়ও হাতে নেই। শুধু একটা কথা ; যে কথা মনের মধ্যে জানি তাকে মুখের ভাষায় বাইরে থেকে শুনতে দোষ কি ?

পুত্রচরিত

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ জন্ম—উনিশ শ' চার সালে ঢেন্‌কানাল রাজ্যে। পৈতৃক বাসভূমি বালেশ্বর। ছাত্রজীবন—ঢেন্‌কানাল, পুরী, কটক, পাটনা ও কলিকাতায়। আই, সি, এস, পরীক্ষায় তিনি ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রথম প্রকাশিত বই "তারুণ্য"। উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা পুস্তক "পথে প্রবাসে", "প্রকৃতির পরিহাস", "আমরা" ইত্যাদি। বর্তমানে শাসন বিভাগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আছেন।

"আপনার সংগে," ভদ্রলোক ইংরাজীতে স্থরু করলেন, "দেখা করবার জন্যে আপনার বাংলোয় যেতে পারিনি, বুড়ো মানুষ। শুনলুম আপনি খাস-কামরায় আছেন, তাই—"

ভদ্রলোকের কার্ডখানা আরেকবার পড়ে দেখলুম। হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য। মিউনিসিপাল কমিশনার। কার্ডের সংগে ভদ্রলোককে মিলিয়ে দেখতে লাগলুম। বয়স সত্তর হতে পারে। বেশ শক্ত আছেন, তবে চোখে একপ্রকার সজলভাব।

"বিশেষ প্রীত হলুম," তেমনি ইংরাজীতে, "আপনার সংগে দেখা করে। শুধু আপনার নয়, আমার সম্রাটের সকল প্রতিনিধির, সংগে দেখা করে আনন্দ পাই।"

ভদ্রলোক পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পড়লেন, আবার পকেট হাতড়ালেন।

"পড়ুন কী লিখেছে!" ভদ্রলোক আমার হাতে যা দিলেন তা একখানা খাম। এই রকম আরো কয়েকখানা খাম তাঁর হাতে রইল। আমার নামের খাম দেখে আমি খুলে পড়লুম।

একখানি মূল্যবান কাগজে দুটি ভাষায় ছাপা সংবাদপত্রের রচনা। তার মর্ম হরিশ্চন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ নন্দন হর্ষবর্ধন ভট্টাচার্য সাত বৎসর কাল ইউরোপে বাস করে লণ্ডনের বার-য়্যাট্-ল এবং প্যারিসের ডি-লিট্ হয়েছেন। "বাংলা সাহিত্যের উপর ল্যাটিন প্রভাব।", এই তাঁর থীসিস্।

আমার তাক লেগে গেল। আমি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম সংবাদপত্রের অভিনন্দন।

"পড়লেন তো?" ভদ্রলোক সগর্বে বল্লেন, "প্রথমে ইচ্ছা ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু আমার পেট্রন সার ল্যান্সলট লয়েড সাহেব তাকে প্যারিস থেকে লণ্ডনে ডাক দিয়ে বল্লেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে করতে চাও কী? চাকরি? ব্যারিষ্টার হয়েও কি চাকরি করা যায় না? সরাসরি ডিষ্ট্রীক্ট জজ করে দেব। হায়রে দুঃখ! এরই মধ্যে নিয়ম বদ্‌লে গেছে।"

ভদ্রলোক চশমা খুলে নামিয়ে রাখলেন। "তিন বছরেই ছেলে আমার বার-য়্যাট-ল। সার ল্যান্সলট্ নিজে তাকে সার অতুলের কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, এ আমার ফ্রেণ্ডের ছেলে। একে জায়গা জোগাড় করে দিন। তিন বছরে যে পাশ করে ফেলবে আশ্চর্য নয় কি?"

আমার এতক্ষণ পরে মুখ ফুটল। "তা তো বটেই!"

"তার পরেও এক বছর আর্টিকেল হয়ে ছিল বিলেতের এক বড় কৌঁসুলীর কাছে। স্পেশাল ফেভার। সার ল্যান্সলটের দয়া। তারপর দেশে ফিরে আসতে লিখলুম। টাকার শ্রাদ্ধ। কিন্তু ছেলে লিখল, চারশো ব্যারিষ্টার এক কলকাতায়। তাদের উপর টেক্কা দিতে হলে আরো কিছু শিখে যেতে হয়। তিন বছরেই ডি-লিট্!"

আমার মনে পড়েছিল প্যারিসের সেই দিনগুলি যখন ল্যানটি কোয়ার্টারে আড্ডা গেড়েছিলুম। হর্ষবর্ধনের সংগে আলাপ হয়ে গেল এক রাশিয়ান রেস্তোরাঁতে লম্বা, ষণ্ডা, চোখে প্যাঁস্‌নে চশমা, মুখে সিগরেট। যাকে বলে ম্যান য়্যাবাউট টাউন, সেই রকম হাবভাব। ফরাসীটা তখনো আয়ত্ত করেনি। গোটা গোটা করে বলে।

"আপনি বুঝি এই প্রথম প্যারিসে এসেছেন?" হর্ষবর্ধন আমাকে জিজ্ঞাসা করল। উত্তর শুনে বল্ল, "বেশ, বেশ, পার্লে ভু ফ্রাঁসে?" আমাকে লজ্জিত দেখে বল্ল, "আচ্ছা কোনো ভয় নেই। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।"

প্যারিসে এই দেখানো জিনিষটি নিছক স্বার্থত্যাগ নয়। পরে আমাকে স্ব অর্থ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

"এসো হে", মঁসিয়ে বাতাশারিয়া বল্লে, "আমরা অন্য রেস্তোরাঁয় যাই। এ শা—রা আমাদের কদর বোঝে না। এদেরকে শা—মজুমদারের দল হাত করেছে। খবরদার তুমি মজুমদারের দলে মিশো না। ও শা—একটা স্পাই।" *

কে যে স্পাই কে যে নয়, তা আমি কোনোদিন টের পেলুম না। তবু লণ্ডনে প্যারিসে বার্লিনে যেখানে গেছি সেখানকার ভারতীয়দের মুখে অন্য কথা নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেককে স্পাই বলে।

আমি ঘাবড়ে গেলুম। বাতাশারিয়ার সংগে চল্লুম দোস্‌রা রেস্তোরাঁয়। বাতাশারিয়ারও একটি দল ছিল। আমি হলুম ঐ দলের সামিল।

"দিদিমণি," বাতাশারিয়া মাদামোয়াসেলকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় সংবোধন করল। "দিদিমণি, সিলভুপ্লে।" পরিবেশিকা এসে দাঁড়াল।

* ভট্টাচার্য: ফরাসী উচ্চারণ বাতাশারিয়া

সরলদর্শনা তরুণী। গ্রাহককে খুসী করা তার কর্তব্য। নইলে চাকরি যায়। তাই তাকে হাসতেই হবে। উপায় নেই।

বাতাশারিয়া চায় তার সংগে একটু বাতচিৎ করতে। তা সে রাজি হবে কেন? দুএকটা এক তরফা রসিকতার পর বাতাশারিয়া অর্ডার দিল, বফ্ রোতি অর্থাৎ রোষ্ট বীফ।

"দিদিমণি," বাতাশারিয়া আমার পানে চেয়ে বল্ল, "একেবারে আমাদের দেশের মেয়ের মত। ওর সংগে কথা কয়ে সুখ আছে। ঐ রাশিয়ান ছি—গুলোর মত নয়।—লীরা মজুমদারকেই চেনে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। বফ রোতি আনতে বল্লে রাগু দ্য মুতোঁ (ভেড়ার মাংস) নিয়ে আসে। আর ওদের ওখানে ভালো ভ্যাঁ পাবার জো নেই। তবে চা'টা ওদের খাঁটি রাশিয়ান চা!"

আমি গেছলুম লণ্ডন থেকে। প্যারিসের চাল চলনের অশ্লীলতা লণ্ডনে আমাদের অভাব্য। লণ্ডনে কোনো ওয়েট্রেসকে অমন করে ডাকো দেখি। সে একটা সীন বাধাবে। বলবার কিছু থাকে তো তার স্থান কাল কৌশল আছে। আর কী রুচি! ওয়েট্রেসের সংগে প্রেম!

আমি দিব্যি শক্‌ড হলুম। বাতাশারিয়া দত্তকে সংবোধন করে বল্ল, "কি রে দাতা! তুই কি বলিস? আমাদের নতুন মক্ষিরাণী পছন্দ হলো?"

বাতাশারিয়া লণ্ডনে কখনো এমন চীৎকার করে কথা বল্‌তে সাহস করত না। আর এই সব কথা! দত্ত ছেলেটি ভিজেবেড়াল। চোখ টিপে তাকে হুঁশিয়ার করে দিল আমার সংবন্ধে। যেন আমি তাদের বাড়ীতে চিঠি লিখে জানাতে যাচ্ছি।

"আরে যাঃ। সব শা—কে চিনি।" বাতাশারিয়া বেপরোয়া-

ভাবে বল্ল। "তোমরা লণ্ডনওয়ালারা কম শয়তান নও। আমিও যাচ্ছি লণ্ডনে। আগে প্যারিসের পথ ঘাট চিনি।"

তারপর সেই মেয়েটিকে বাংলায় বল্লে, "দিদিমণি আমার কোলে শোবে? কেন, লজ্জা কিসের?"

মেয়েটি একবিন্দুও বুঝতে পারল না। ভাবল কিছু একটা হাসির কথা হবে। গ্রাহককে সন্তুষ্ট করবার কড়া হুকুম আছে। কোনো গ্রাহক যদি মিথ্যা করেও তার নামে অভিযোগ করে তবু পাত্রঁ অর্থাৎ মালিক তাকে ছাড়িয়ে দেবে, যদি না সে মালিকের প্যারী হয়ে থাকে।

মেয়েটি মুচকি হাসল। তা দেখে বাতাশারিয়া হো হো করে হেসে উঠল। যেন কত বড় তামাসা করেছে। দত্ত আমার দিকে চুরি করে চেয়ে রেগে উঠল। আমি ঘেমে উঠলুম। এ অত্যাচারের শাসন নেই। ফরাসী রেস্তোরাঁ। হৈ হৈ ব্যাপার। কতগুলো ভিখারী এক কোণায় দাঁড়িয়ে ব্যাঞ্জো বাজাতে স্বরু করে দিয়েছে। অন্যান্য টেবলেও হট্টগোল। সবাই সমান বাচাল।

তুটি একটি করে বাতাশারিয়ার দলের যুবকরা এসে জুটতে লাগল। তাদের কেউ বাঙালী, কেউ গুজরাটী, কেউ পাঞ্জাবী। তাদের কারুর কারুর সংগে নায়িকা ছিল। বাতাশারিয়া উঠে গিয়ে তাদের টেবলে খানিক বসে নায়িকাদের সংগে তুটো ফরাসী কথা কয়ে আসে। বেশ, বেশ, তোমরা আমাদের দলে। বড় স্থখের বিষয়। এই তার প্রধান বক্তব্য। তা বলে সে তামাসাও কম করে না। যাদের নায়িকা তারা কী মনে করল বাতাশারিয়া তা গ্রাহ্য করে না। গায়ে তার গুণ্ডার জোর। কে তার সাথে লড়তে যাবে? তার চেহারা থেকে অনুমান হয় সে একটা হনুমান।

"বাহবা ক্লোদিন," সে বলে একটি মেয়েকে, "তুমি নাকি বিয়ে

করছ অঁরিকে।" তার ভাবী স্বামীর দিকে চেয়ে বলে, "অঁরি, তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমাকে আর পয়সা খরচ করতে হবে না।"

ওরা দুজনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ছেলেটি বোধ হয় আর্টিস্ট। অন্য কিছু হলে রেগে লাল হত। আর মেয়েটি বড় ভালো জাতের। আমি ওদের সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে চমৎকৃত হলুম। হাজার হোক ওরা ফরাসী। দেশ ওদের। ইচ্ছা করলে কি ওরা শিক্ষার বন্দোবস্ত করত না আমাদের ইঞ্জিনিয়ার দাদার?

পরদিন আমি ওর সংশ্রব এড়াবার জন্যে অন্যত্র খেলুম। বিশেষ কোনখানে না, যেখানে খুসী। তবে আমার প্রিয় ছিল একটা পাতিসেরি। সেখানে পেট ভরে পিঠে খেতুম। আর কন্টিনেণ্টাল ডেলী মেল কিনে পড়তুম। আমি আগে জানতুম না যে মজুমদার তাঁর দলের হাত থেকে পালিয়ে এসে নিরিবিলিতে সেইখানে ক্লাসের পড়া তৈরি করতেন। এক আশ্চর্য মানুষ এই মজুমদার। সন্ধ্যাবেলায় যে তাঁকে দেখে সে ঠাওরায় লোকটা আমোদপ্রমোদ নিয়েই আছে। অসাধারণ আড্ডাবাজ। কিন্তু নিজের কাজটি বেশ গুছিয়ে নিতে জানেন। ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করে ডাক্তারী পড়ছেন মন দিয়ে। সুপুরুষ। নাচতেও পারেন ভালো। মেয়েরা যদি তাঁকে ঘেরাও করে তবে সেটা কি তাঁর অপরাধ? প্যারিসের ভারতীয় ছাত্ররা মিলে একটা সমিতি করেছিল, তার উদ্যোক্তা ছিলেন মজুমদার। বাড়ীওয়ালা তাঁকে বিশ্বাস করে ভাড়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না, দোকানদারেরা তাঁর খাতিরে বাকী ফেলে রাখত। বণিক শ্রেণীর ভারতীয়দের কাছ থেকে চাঁদাও তুলেছিলেন তিনি ঢের। তবু তাঁর প্রতিপক্ষরা বল্ল, সমিতিতে তিনি মেয়েদের আসতে দেন, এ এক গুরুতর অপরাধ।

বাতাশারিয়া দল পাকিয়ে সমিতি ক্যাপচার করল। তারপর মজুমদারের নামে রটাল তিনি অনেক টাকা খেয়েছেন, হিসাব দেননি। মজুমদারের বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে সমিতি থেকে বেরিয়ে গেল। তার ফলে পাওনাদারেরা সমিতিতে ছেঁকে ধরল। বাতাশারিয়ার দল রাতারাতি সমিতির নাম বদলে বাড়ী বদলে মজুমদারের কীর্তি লোপ করল।

লক্ষ করলুম মজুমদারকে খুঁজতে সেখানেও মেয়েরা আনাগোনা করে। ভাগ্যবান পুরুষ! বাতাশারিয়া যে হিংসা করবে তার আশ্চর্য কি! তবে এদের এই নিয়ে দলাদলি আমার বিশ্রী লাগে। লণ্ডনে আমাদের দলাদলি পলিটিকল। আমরা কেউ কমিউনিস্ট্ কেউ সোশ্যালিস্ট্, কেউ ন্যাশনালিস্ট্। কিন্তু প্যারিসের ভারতীয়দের দলাদলি নারীঘটিত। কার ক'টি নায়িকা আছে এই তাদের গণনা।

আমি বোধ হয় কতকটা হতাশ হয়ে প্যারিস ছাড়লুম। আমার একটিও বন্ধুনী মিলল না। সকলে আমাকে একটু অনুকম্পার চোখে দেখল।

মাস ছয়েক পরে আবার প্যারিসে গেলুম। এবার থাকার জন্যে নয়। প্যারিস আমার পথে পড়ে। তাই নামলুম। ল্যাটিন কোয়ার্টারের উপর অশ্রদ্ধা ধরে গেছল। উঠলুম লিঁয় স্টেশনের অনতিদূরে। আমার সংগে দেখা করতে লিখেছিলুম গুহ বলে একটি ছেলেকে। সে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেল।

প্যারিসের কে কেমন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। সেই সূত্রে উঠল বাতাশারিয়ার কথা

"তার কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে ব্যথা দিলে রায়।" গুহ লোকটি পড়াশুনা নিয়ে থাকে। স্ত্রীজাতির ছায়া মাড়ায় না। প্যারিসে এমন ছাত্রও যে মেলে, অন্তত আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে গুহ না চিনলে

আমি বিশ্বাস করতুম না। সেই গুহ করুণ কণ্ঠে বল্ল, "সে আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে।"

"আমার পক্ষপাত মজুমদারের প্রতি। তা বলে আমি যে মজুমদারের দলে তা নয়। আমি কোনো দলের নই।" গুহ ধীরে ধীরে অবতারণা করল।

"যার বন্ধুনী নেই তার দল থাকবে কি করে?" আমি হেসে মন্তব্য করলুম।

"যাও," গুহ হাসল। "একদিন মজুমদার এসেছেন আমার হোটেলে, আমার ঘরে। আমি তাঁকে এক পেয়ালা কফি করে খাওয়াতে যাচ্ছি। এমন সময় বাতাশারিয়া, দত্ত, জামিয়াৎ সিং, দিনশাজি ইত্যাদি এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুল্ল। কি হয়েছে? আমরা মজুমদারকে চাই, ছেড়ে দাও। আমি বল্লুম, আমার ঘরে আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা ঢুকলে কেন? ওরা আমাকে পা দিয়ে হটিয়ে দিয়ে অশ্লীল ভাষায় জবাব দিলে। মজুমদারের গায়ে হাত দিতেই বলে উঠলুম, উনি আমার অতিথি। ওরা আরেকটা অশ্লীলবাক্য বলে আমাকে রাগিয়ে তুল্ল। তখন আমি বেল টিপলুম। ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাতে মোচড় দিল। মজুমদার ইতিমধ্যে কুস্তি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সংগে কুস্তিতে না পেরে ওরা আমার ঘরের আসবাবপত্র একে একে ছুঁড়ে মারতে থাকল। ঘা লেগে জানালার কাঁচ গেল ভেঙে। আরো লোকসান হত। কিন্তু লোকজন এসে পড়ল। তখন তারা শাসাতে শাসাতে বেরিয়ে গেল।"

"কিন্তু কেন হঠাৎ এ অভিযান?" আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম প্যারিসের ছাত্রদের নীচতার বিবৃতি শুনে। লণ্ডনের slum-এ

ছোটলোকেরা এমন হাঙামা বাধায় না, ভারতীয় ছাত্ররা তো ভদ্র পাড়ায় ভদ্রলোকের মত বাস করে।

"সেই যে পাতিসেরীতে তুমি খেতে মনে পড়ে?"

"খুব মনে পড়ে।"

"সেখানে একটি মার্কিন মেয়ে খেত মনে পড়ে?"

"মনে পড়ে বৈকি।"

"মিস হিলটন মজুমদারকে বিশ্বাস করে একশো ফ্রাঁ রাখতে দিয়েছিল। সামান্য একশো ফ্রাঁ। বাতাশারিয়ারা গন্ধ পেয়ে তাকে বলেছে, মজুমদার তহবিল তশরুপ করেছে। তারপর তার পক্ষ থেকে টাকা আদায় করতে দলবল গিয়ে অভিযান করেছে।"

গুহ এর পরে যা বল্ল তা আরো রোমহর্ষক। তা নিয়ে আরেকখানা হর্ষচরিত গ্রথন করা যায়।

সেই যে দিদিমণি তাকে শেষ পর্যন্ত বাতাশারিয়া ফাঁদে ফেলল। মেয়েটি খাস প্যারিসের নয়, মফঃস্বলের। আত্মরক্ষার পদ্ধতি তেমন রপ্ত করেনি বলেই মনে হয়। নন্দনের আগমন সূচনা পেয়ে হর্ষবর্ধনের ক্রন্দন।

কোন এক হাতুড়ের কাছ থেকে দাওয়াই এনে খাওয়াল। ফলে ওর মরণাপন্ন অবস্থা। তখন খেয়াল হলো যে মজুমদার ডাক্তারী পড়ে। সে যদি দয়া না করে তবে অন্য ডাক্তার এসে বাতাশারিয়াকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। মজুমদারের কাছে সোজা না গিয়ে গুহকে সাধল মজুমদারের কাছে নিয়ে যেতে। হাজার হোক দেশের লোক। বিদেশে বিপাকে পড়েছে। গুহ মজুমদারকে অনেক বোঝাল। মজুমদার বল্লেন, কাজটা বে-আইনী। জেলে যেতে চাইনে। তখন গুহ বেচারা চোরের মত কত ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে অবশেষে

একজনকে জোটাল। হলো অপারেশন। গুহর সেবায় মেয়েটা প্রাণে বাঁচল।

কিন্তু ডাক্তারের বিল মেটাবার সময় বাতাশারিয়া বল্ল, "আমার কাছে টাকা কোথায়, গুহা? আর বিল কি সোজা বিল? না ডাক্তার ভেবেছে আমি লক্ষপতি? না বাবা, এখনো লক্ষ নারীর পতি কিংবা উপপতি হইনি।"

বিপ্লব

সমীর ঘোষ

সমীর ঘোষ : জন্ম—উনিশ শ' বিশ সাল; ভবানীপুর, কলিকাতায়। ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় কলিকাতাতেই। পৈতৃক বাসভূমি কলিকাতা।

কারুর চোখে জল দেখিলেই ডাক্তার ভদ্র চটিয়া যাইতেন। বলিতেন, সেন্‌টিমেন্‌টালিটি! যতোসব ভাবপ্রবণতা! ট্রাস্!

বন্ধুরা এই লইয়া তাঁহার সহিত অনেক তর্ক করিয়াছেন, তাঁহাকে বোঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—মানুষের একটা স্বভাবজাত সহানুভূতি আছে মানুষের উপর। সেই সহানুভূতিই আমাদের চোখে জল আনে যখন আমরা অপরের কষ্ট দেখি।

কথা শেষ হইবার আগেই ডাক্তার ভদ্রের নাক যাইত বাঁকিয়া, চোখ হইত ছোট। তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্যে তিনি বন্ধুদের বিদ্রূপ করিয়া উঠিতেন, ওহে, আমি কবিও নই, দার্শনিকও নই। সংসার আমাকে ভাবুক করেনি যতোসব ছেঁদো কথার জাল বুনতে। আমার ব্যবসা ডাক্তারী আর তাতে আমি করি আমার রুটির যোগাড়—ইংরাজিতে যাকে বলবো—টু আরন্ ব্রেড্।

বন্ধুরা চুপ করিয়া যাইতেন। বেশীর ভাগ স্থলে অনেকে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িতেন, না হয় ডাক্তারকে এড়াইয়া চলিতেন।

তাঁহার ব্যবসা যে ডাক্তারী এবং তাহাতে যে তিনি তাঁহার রুটীর যোগাড় করেন, এই কথা ডাক্তারের সংগে যাহারা পরিচিত তাহারা জানে। যাহারা অপরিচিত অথচ ডাক্তারের নামের সংগে তাহাদের পরিচয় আছে তাহারাও জানে। সব চাইতে কিন্তু বেশী করিয়া জানেন অমিয়া। ছেলেবেলায় পাঁচটা ভাইবোনের মাঝখানে মানুষ হইয়া এবং অধ্যাপক

পিতার কাছে শিক্ষালাভ করিয়া অমিয়া যে স্বভাব পাইয়াছিলেন, সেটা হইতেছে ডাক্তার ভদ্রের নীতির বিরোধী। তবু মজা হইতেছে এই যে অভূতপূর্ব ভাগ্যলিপি এই বিপরীতধর্মী মানুষ দুইটিকে বিবাহের বন্ধনে এক করিয়া গেছে। আগে অমিয়ার চোখে জল দেখিলে ডাক্তার ভদ্র ইস্পাতের মতন তীক্ষ্ণগলায় বলিতেন, যাও, আগে চোখেমুখে জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করবে, তবে আমার সামনে আসবে, তা না হোলে……

এইখানে ডাক্তার ভদ্র প্রথম প্রথম কি মীমাংসা করিলেন তাহা স্বগত রাখিতেন কিন্তু নিজের পড়িবার ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারী করিতে করিতে সময় সময় তিনি ঝোঁকের মাথায় বলিয়াও ফেলিতেন, কি করবো—হিন্দু আইনে ডিভোর্স নেই, থাকলে আজই দরখাস্ত করতাম।

প্রথম প্রথম ভয়ে শক্তিহীনা হইয়া অমিয়া ডাক্তার ভদ্রের মুখের দিকে চাহিতেন। ইদানীং বেশী রাগিয়া গেলে ডাক্তার ভদ্রর মুখের উপরেই তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, আমি তো তোমার মতন পাষাণ নই……

ডাক্তার ভদ্র 'পাষাণ', এইকথা অমিয়া মনে মনে অনেকবার বলিয়াছেন। না বলিবার কিছু নাই। এইতো সেবারে পাখী শিকারে গিয়া ডাক্তার ভদ্র যাহা করিলেন, তাহা পাষাণ ছাড়া কি কেউ করিতে পারে, না পারিত? অব্যর্থ গুলিতে দুটো পাখীর একটা চরের বুক লাল করিয়া পড়িয়া আছে আর তাহার উপরে অন্য পাখীটা সকরুণ সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া ঘুরিতেছে। অস্তমিত সূর্যের ম্লান আভায় সমস্ত পশ্চিমাকাশ যেন এক মূর্তিমান বৈরাগ্য। মানুষের সমস্ত মনপ্রাণ সেই বৈরাগীর সংগে একটা বাষ্পের সিক্ততায় আর্দ্র হইয়া দুলিতেছে। সেই দোলনকে জোড়ভাঙা পাখীটা সকরুণ ডাকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিল।

ডাক্তার ভদ্রের নিশানা দুইবার ব্যর্থ হইয়া গেল। বিপদের আভাস

পাইয়াও কিন্তু পাখীটা যেখানে তাহার সংগী মরিয়াছে সেই স্থানটার উপরে মর্মভেদী তীক্ষ্নস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া ঘুরিতে লাগিল। তৃতীয়বারে ডাক্তার ভদ্রের গুলী লক্ষ্য বিঁধিল। বন্দুক নামাইয়া তিনি কপালের ঘাম মুছিবার জন্য রুমাল তুলিতেছেন এমন সময় 'আহা' শব্দটা কানে পৌঁছাইতেই তিনি বিদ্যুৎবেগে চারিপাশে চাহিলেন। তারপর কোথা হইতে কি হইল, তাহা বোঝা সকলের পক্ষে মুস্কিল।

হঠাৎ সেই গুলীভরা বন্দুক তুলিয়া তিনি জলে টলটলায়মান অমিয়ার দুই চোখের মাঝখানে ধরিয়া উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, শিগ্গির চোখের জল মোছো—তা না হোলে কুকুরের মতো গুলী করে মারবো!

চারিপাশের সকলে ডাক্তার ভদ্রকে তৎক্ষণাৎ টানিয়া অন্য পাশে লইয়া গেল। অমিয়া কেবিনের আশ্রয় লইলেন।

তারপর অনেকদিন কোনো নিমন্ত্রণ রাখিতে অমিয়া কোথাও যান নাই। কোনো বন্ধু দেখা করিতে আসিলে, তিনি মুখ উঁচু করিয়া কথা কহিতে পারেন নাই। অবশ্য পরে মানে সেইদিন রাত্রেই ডাক্তার ভদ্র অমিয়ার হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন। অস্থিরভাবে পায়চারী করিয়া সমস্ত কেবিন তোলপাড় করিয়া বার বার বলিয়াছেন, কাজটা নাকি বর্বরতার সূচনা করিয়াছে। অমিয়া যদি তাঁহাকে বর্বর বলেন, তবে তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। অমিয়া যেন তাঁহাকে এই-বারের মতো ক্ষমা করেন।

অমিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, বাথরুমে গিয়া কাঁদিয়াছেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ম্লানভাবে হাসিয়াই তিনি আবার ডাক্তার ভদ্রের সহিত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই ঘটনার পর অমিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, ডাক্তার ভদ্র আর পূর্বের মতো আঘাত দিতে সুযোগ অনুসন্ধিৎসু নন। তাঁহার সেই

ব্যবহারটা বাহিরের লোকের উপরে—বিশেষ করিয়া রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের উপর গিয়া পড়িয়াছে।

গতবারের গিরিডি ভ্রমণের কথা অমিয়ার মনে পড়ে। ডাক্তার ভদ্র যে মানুষ, তাঁহার শরীরে যে রক্তমাংস আছে, সেকথা আর যেই স্বীকার করুক না কেন, অমিয়া আর করেন না। তবে এটা ঠিক, অমিয়া আর পাঁচজনের মতো বেশ ভালোভাবে জানেন, ভদ্র যে ভাবেই যাহার সংগে ব্যবহার করিতে থাকুক না কেন, রোগ ধরিবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ। অন্যান্য ডাক্তারেরা যেখানে আশা ছাড়িয়া দেয়, ভদ্র সেই রণক্ষেত্রে উড্ডীন করেন তাঁহার জয়ের নিশান।

তাই বোধ হয় ডাক্তার ভদ্র যেদিন গিরিডিতে উঠিলেন, সেই দিন রাত্রেই ডাক আসিল।

ট্রাস্! ডাক্তার ভদ্র যেন ক্ষেপিয়া গেলেন, আমার বত্রিশ টাকা ভিজিট চাই। সাধারণত তিনি আট টাকা ভিজিট লইয়া থাকেন।

—তাই দেব স্যার! আপনি তাড়াতাড়ি চলুন।

—গাড়ী? গাড়ী আনা হোয়েছে?

—আজ্ঞে না, যদি আনতে বলেন......

—বলেন, বলেন মানে? গাড়ী এলে তবে যাবো।

—দেরী হয়ে যাবে না স্যার? আবেদনকারীর কণ্ঠস্বর হতাশায় ভাঙিয়া পড়িল।

—দেরী হোলে আমি কি করবো? ঘর থেকে তো আর ভাড়া দিতে পারি না যে, আপনি বলবেন আর আমি গাড়ী ডেকে চেপে বসবো?

ডাক্তার ভদ্র পিছন ফিরিলেন। ভদ্রলোক ছুটিয়া উন্মত্তের ন্যায় বাহির হইয়া গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে গাড়ী আনিয়া সেই খবর ভদ্রকে দিতে তিনি ত একেবারে আগুন।

—দশটা বেজে গেছে। বত্রিশ টাকায় হবে না। ডাক্তার ভদ্র তাঁহার ইস্পাতের মতো শাণিত গলায় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

—যা চান তাই দেবো স্যার। আপনি শুধু যাবেন কি না বলুন?

—একশো টাকা পেলেই আমি যাবো—হ্যাঁ আমার একশো চাই।

সেই রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার ভদ্র স্ত্রীর হাতে দশখানা নোট দিলেন। অমিয়া সেই নোটগুলি ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া অশ্রু-নিষিক্ত মুখে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কসাই, তুমি কসাই—পাষাণের চাইতেও তোমার বুক কঠিন, নীরস!

অমিয়ার চোখে জল দেখিয়া ভদ্র তাণ্ডবনাচ নাচিয়া উঠিলেন, আমি কসাই! আমি পাষাণ! আনতে হোত টাকা রোজগার করে, বুঝতে তবে। কবিত্ব এ সংসারে চলে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটি আনতে হয়, বুঝেছো? যতো সব সেন্‌টিমেন্‌ট্যাল ট্রাসের দল!

সেদিন কিন্তু ওই পর্যন্ত। এর বেশি বাড়াবাড়ি ডাক্তার ভদ্র আর আজকাল করেন না।

মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে—ডাক্তার ভদ্রের জীবনেও আসিল।

পাঁচ বছর পরের কথা বলিতেছি।

ডাক্তার ভদ্রের বার বার আহ্বান সত্ত্বেও, অমিয়া ঝি চাকরদের বারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিল না। ভদ্র রীতিমত চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। অমিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

– কে, কে আমার সোনালি রংয়ের এ্যাস্‌ট্রেটা ভেঙেছে? আমি তাকে হাণ্টার পেটা করবো।

—এ ভেঙেছে। একে যদি হাণ্টার পেটা করতে পারো তো করো—কেউ কিছু বলবে না।

অমিয়া তাঁহার কোলের ছোট ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন।

—ও! ও-কে? কোথা থেকে এলো?

—এরা আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে।

—কই কোনোদিন তো দেখিনি—তোমার নাম কি—ও খুকি?

ডাক্তার ভদ্র আগাইয়া আসিয়া মেয়েটির সুন্দর নরম হাত ধরিয়া নাড়াইয়া দিলেন।

খুকী অমিয়াকে ভালো করিয়া জড়াইয়া ধরিল, তারপরে নাম বলিল, নীলিমা ত্যান্যাল। সংগে সংগে মন্তব্যও করিল—তুমি দুঃতু!

—আমি দুষ্টু? ভালো-ভালো! হো হো করিয়া এবং সকলের বিস্ময় আনিয়া ডাক্তার ভদ্র হাসিয়া উঠিলেন প্রাণখোলা হাসি। অমিয়াকে বলিলেন, বেশ মেয়ে!

সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে ডাক্তার ভদ্র বার দুয়েক পিছন ফিরিয়া চাহিলেন। মনে মনে কহিলেন, মেয়েটি কোলে অমিয়াকে বেশ দেখাইতেছে—বেশ দেখাইতেছে।

দুই তিন দিন পরে দুপুরবেলা খাইবার সময়ে অমিয়াকে দেখিতে না পাইয়া ভদ্র বামুন-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কোথায় ঠাকুর?

একটু ইতস্তত করিয়া ঠাকুর বলিল, আজ্ঞে পাশের বাড়ীর মেয়েটির বড় অসুখ কি না—মা সেইখানে আছেন সেই সকাল থেকে।

অমিয়ার প্রিয় ঝি কুমুদা খাবার ঘরের দরজার অপর পার হইতে সংকুচিত গলায় প্রায় বামুন-ঠাকুরের সংগে সংগে বলিল, সায়েবকে হোথায় পাঠিয়ে দিতে মা বলতেছিলেন।

—সেই ফুটফুটে মেয়েটির অসুখ? সেই নীলিমা ত্যান্যাল বলে যে, আর সংগে সংগে মন্তব্য করে, তুমি দুঃতু?

অন্যান্য দিনের মতো তৃপ্তির সহিত ভদ্রের দুপুরের ভোজ সমাপ্ত হইল না। পায়জামা ছাড়িয়া পান্তালুন গলাইয়া ঝি-চাকরদের বিস্ময়

উৎপাদন করিয়া কুমুদাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ব্যাগটা নিয়ে চলতো সেই মেয়েটার বাড়ীতে।

অন্যক্ষেত্রে এমন সময়ে দর্শনীর চারগুণ পাইলেও ডাক্তার ভদ্র সেখানে যাইতেন কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার ভদ্র আসিয়া উঠিলেন সেই ঘরে যেখানে নীলিমাকে কোলে করিয়া অমিয়া বসিয়া আছেন।

চারিপাশের অপরিচ্ছন্নতা, অগোছালভাব আজ আর ডাক্তার ভদ্র সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিলেন না। যন্ত্রণায় প্রায় নীল হইয়া যাওয়া নীলিমার কাছে আগাইয়া আসিয়া বিনা আড়ম্বরে মেয়েটিকে তিনি তিন চারিবার পরীক্ষা করিলেন। অমিয়াকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, এর মা কোথায়?

—মা নেই, অমিয়ার উত্তরে ডাক্তার ভদ্র যেন শিহরিয়া উঠিলেন, দিন দশ-বারো আগে হাসপাতালে মারা গেছেন।

যে লোকটি ঘরের কোণেতে হাঁটুর উপর হাতের পরিবেষ্টনীতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন, ডাক্তার ভদ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বোধ হয় মিঃ স্যানিয়াল?

লোকটি ক্লান্ত মুখ তুলিলেন।

—নীলিমাকে আমার ক্লিনিকে নিয়ে যেতে চাই, রোগটা শক্ত।

সান্ন্যাল ঘাড় নাড়িলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন, আপনার দয়া—

ডাক্তার ভদ্রের ক্লিনিকের চারিপাশে মোটরের ভিড় জমিয়া গেল। এমন কি ভদ্র নিজে গিয়া শিশুরোগবিশেষজ্ঞ তালুকদারকে ধরিয়া আনিলেন। পারদর্শিনী নার্স আসিল—বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মৃত্যুকে জয়ী না হইতে দিবার জন্য প্রাণপণে করিল যুদ্ধ।

ভোরের দিকে যুদ্ধশেষে মৃত্যু হইল জয়ী। সারারাত্রি নীলিমাকে

কোলে করিয়া কাটাইয়া ভোর বেলা শূন্যকোলে অমিয়া অবুঝ ছোট মেয়ের মতো কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার ভদ্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন অমিয়ার কান্না! তিনি আরো দেখিলেন, মরণের পরও নীলিমার ঠোঁট আর চোখের পাতা নীল হইয়া রহিয়াছে—যেন নিদারুণ যন্ত্রণা এখনও তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইতেছে।

সাত আট দিন ডাক্তার ভদ্র কোনো নূতন কল লইলেন না। যে-সব রোগী হাতে ছিল, তাহাদের সকালে একবার করিয়া দেখিয়া আসিলেন। তারপর সেদিন রাত্রে অমিয়ার ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টানিয়া অমিয়ার পাশে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, বিলেত যাবে অমু?

বিস্মিত অমিয়া মুখ তুলিলেন, কোনোদিন এমন নরমভাবে ডাক্তার ভদ্রকে কথা কহিতে তিনি শোনেন নাই।

—আমি বিলেত যাচ্ছি, আমার সংগে তোমাকেও যেতে হবে অমু! ছোট শিশুর মতো কোমল গলায় কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার ভদ্র অমিয়ার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন, ছোট ছেলেমেয়ের রোগ সংবন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না অমু—এখানে কেউ জানে বলেও আমার মনে হয় না। জানো অমু, নীলিমার কি অসুখ হোয়েছিল, কেউ তা ধরতে পারেনি, তালুকদারও না।

ডাক্তার ভদ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার আস্তে আস্তে তিনি বলিলেন, ঠিক করেছি আগামী মেলে লণ্ডন যাবো ছেলে-মেয়েদের রোগ সংবন্ধে পড়াশুনা করতে। তোমাকেও আমার সংগে যেতে হবে—তা না হোলে আমি উৎসাহ পাবো না। যাবে তো অমু?

ডাক্তার ভদ্রের হাতের উপর অমিয়ার চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল। মুখ তুলিলে অমিয়া আজ আশ্চর্য হইয়া দেখিতেন ডাক্তার ভদ্রের চোখের কোণ বিদ্যুতের ম্লাননীল আলোকে চিক্ চিক্ করিতেছে।

কাস্তে

জগত দাশ

জগত দাশ: জন্ম—উনিশ শ' ষোল সালে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত যাদবপুর গ্রামে। পৈতৃক বাস—ফরিদপুর। ছাত্রজীবন—ফরিদপুর, রাজবাড়ী। সন্তোষকুমার ঘোষের সহযোগিতায় ইনি 'ভগ্নাংশ' নামক গল্পগ্রন্থ লিখেছেন।

হাটের উপর সভা বসেছে। পঁচা আলু, পেঁয়াজের খোসা প্রভৃতি হাটবারের আবর্জনা সরিয়ে অনেকগুলি কৃষক বক্তৃতা শুনবার জন্য ধূলোর উপর বসে গেছে। জমিদার, ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন এবং সবার উপরে যে সরকার বাহাদুর তাদের কাছে নাকি অনেক দাবী দাওয়া আছে এদের। এরা সে কথা জানতো না। ভগবান দিলে খাবে, না দিলে উপোস, পাপ করলে শাস্তি। তাঁর বিচারের উপর মানুষের হাত আছে কিছু?

কিন্তু হাত নাকি আছে, জমিদার সতীকান্ত বাবুর ছোট ছেলে প্রণবের কাছে একথা তারা প্রথম শুনেছে। প্রণব কোলকাতায় পড়ে, এর আগে ছুটীতে অনেকবার সে বাড়ীতে এসেছে, পাখী মেরে চড়িভাতি খেয়েছে, পুকুরে পড়ে দৈনিক তিন ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে, মাসান্তে পাড়া কাঁপিয়ে কোলকাতার ট্রেণ ধরেছে সে, নিরীহ গ্রাম্য কৃষকদের হাড় জুড়িয়েছে। এবার প্রথম হতেই এক নূতন মতলব ছিল তার মাথায়, এক সর্বনাশা মতবাদ।

একমাস সে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছে, কি সব বুঝিয়েছে, সব কথা বুঝতে পারেনি তারা, তবু এক নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে, ছেঁড়া কাপড়ের পরিবর্তে আস্ত কাপড় তারা পরতে পারে, ভাত খাবে পেট পুরে, হাড়ে তাদের মাংস লাগবে এ আশা অন্তর দিয়ে পোষণ

করেছে অনেকেই। যারা বিশ্বাস করেছে, তারা এসেছে, ধূলোর উপর বসেই সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়বার স্বপ্ন দেখ্ছে।

টিনের চেয়ারে সভাপতি দীনু মণ্ডল কংকালসার দেহটাকে সোজা রাখ্তে পারেনি, কুঁজো হয়ে বসেছে। টেবিল চাপড়িয়ে লাল ঝাণ্ডার নীচে প্রণব বক্তৃতা করছে—

"বন্ধুগণ এই হাতুড়ী আর কাস্তে চিহ্নিত লাল ঝাণ্ডা এই আমাদের প্রতীক, ধনিক এবং বণিকদের সর্বপ্রকার অনাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সবল হাতে একে খাড়া রাখতে হবে।"

জনগণ একবার নিজেদের হাত আর একবার কাস্তে চিহ্নিত পতাকার দিকে চাইল। না, হাড় তাদের সবল নয়, কিন্তু কাস্তে ধরবার অভ্যাস তাদের আছে।

"বন্ধুগণ, আপনারা জানেন না, আপনাদের কাস্তের কি অপরিসীম শক্তি। সমস্ত জগৎ এর উপর নির্ভরশীল, পৃথিবীর সভ্যতা,—" জমিদার সন্তানের কম্পিত দেহ এবং রক্তবর্ণ মুখ দেখে এরা বুঝলো কথাগুলি সত্যি, জনতা উষ্ণ হয়ে উঠ্লো। কে একজন বল্লো, "জমিদার প্রথা", সমাগত অর্ধশত লোক চীৎকার করে উঠ্লো, "ধ্বংস হোক"। জমিদার ভ্রাতা রতিকান্ত বাবু সান্ধ্যভ্রমণের শেষ পাক দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন, তিনি মুচকি হাসলেন মাত্র।

কুখ্যাত রতিকান্তকে দেখে লোকগুলি প্রথমে ভয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কিন্তু পর মুহূর্তে প্রণবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করে উঠলো, "অত্যাচারী ধ্বংস হোক"। কেউ কেউ হাতে ধূলো নিয়ে উড়াতে লাগলো অকারণে।

রাইচরণের তরুণী বৌ-এর সংগে নাকি রতিবাবুর মেলামেশা

বাড়াবাড়িতে উঠেছে সংপ্রতি। গ্রামের বিধবারা এ ধরণের মাখামাখি মনের সংগে মানিয়ে নিতে পারছে না, তাই এদের বেমানানো মন্তব্যে সমস্ত গ্রামটা মুখর হয়ে উঠেছে।

—পানটা সুপারিটা খুব খাচ্ছিস বিন্দি। ছাই দিয়ে বাসন মাজ্‌তে মাজ্‌তে সীতা পিসী বলে,—দেখিস ভাই সামলে, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, বুঝলি?

রাইচরণের বৌ বিন্দির গায়ের রং ফর্সা, গাল দুটো তার খানিকটা রাঙা হয়ে উঠ্‌লো হয়তো বা দুঃখে হয়তো বা লজ্জায়। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ ঘসে লাল করতে করতে সে বল্ল,—আমি তোমাদের কি করেছি পিসী? কেন তোমরা সব সময় আমার নামে একগ্রাস ভাত বেশী খাও শুনি? ঘাটে অনেকে এসেছিলো, সবাই চাপা হাসলো। আর কোন কথা না পেয়ে বিন্দি চুপ করে রইলো, অথচ মন তার খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগলো, ঠিকমত প্রতিবাদ করা হলনা বুঝি, এই সময় চোখে কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়লে আর কথা বলার দরকার হতনা, কিন্তু তার পোড়া চোখে ঠিক সময়ে জল আস্‌তে জানেনা, এই ভেবে তার কান্না পাচ্ছিল।

শীতকাল। গা', হাতপা ফেটে চৌচির হয়ে আছে, ঝামা দিয়ে পা ঘসতে ঘসতে রাধির মা বল্ল,—রামকেও চিনি, রহিমকেও জানি। বয়েসের সময় ওরকম একটু আধটু দোষ সবারই থাকে। ওর ভাগ্যের জোরে বড়নোক জুটেছে, তাই তোদের সইছেনা। 'সবাই' কথাটা সীতাপিসীর ভাল লাগলো না। তারই বয়সের সময়টা ইঙ্গিত করা হল বুঝি। চঞ্চল প্রতিবাদ জানালো সে—অমন জলজ্যান্ত ভাতারব্যাটা বেঁচে থাকতে কেউ তাই বলে ঢঙ্‌ করে বেড়ায় না।

বিন্দি চলে গেছে কোন ফাঁকে!

—অমন ভাতারের মুখে ছাই। গৌরী বৌ ঘোমটার ফাঁকে কথা

বল্লে,—তিন বেলা কত্তা কত্তা করে পা চাট্‌ছে, মারো মুখে ঝাঁটা—ইস্ত্রীর পিরীতের নোক! তার এত খাতির, আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনা। গৌরী বৌ-এর রাগটা বিন্দির চেয়ে বিন্দির স্বামীর প্রতিই বেশী। প্রণব বাবুর দলের বড় পাণ্ডা তার স্বামী মাখন। রাইচরণ মাখনের নামে সত্য মিথ্যে কি সব জমিদারের কাছে বলায়, সতীকান্ত বাবু মাখনকে সাতবার নিজের হাতে কানমলা খাইয়েছেন। স্বামীর এহেন অপমানে কার না রাগ হয়?

—যাই বল, জমিদারের ছোট ছেলেটাও নোক ভাল নয়, গেরস্তের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অত কি তোমার ফুস ফাসরে বাপু! গরীব বলে কি আর আমাদের মান ইজ্জৎ থাকৃতে নেই? বড়নোক ওরা, ওদের চরিত্তির খারাপ না হয়েই যায় না, এই আমি বলে রাখলাম। স্নান ততক্ষণে শেষ হয়েছে সীতাপিসীর। হাটের সভার মত ঘাটের সভাও ভাঙ্‌লো। নূতন ভাবের বন্যায় এই ছোট গ্রামটিও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জল কল্লোল যেন। শুষ্ক হাড়ে দীপ্তি এসেছে এদের। কিছু একটা করা চাই। আশে পাশের সবগুলি গ্রামের গাছে গাছে, বাড়ীর দেয়ালে লাল কাগজ টাঙানো হয়েছে। দেশের একজন বড় নেতা আসবেন, সভা হবে। রুক্ষ চুল, পায়ের চটী অগ্রাহ্য করে হাঁটুর উপর ধুলো উঠেছে। ঠিক সময় স্নানাহার নেই প্রণব গ্রামে গ্রামে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরছে।

—মাখন বাড়ী আছ, মাখন? কোন সাড়া নেই। বাড়ী নেই মাখন। প্রণব ফিরলো। দরজা কাঁপলো কয়েক মুহূর্তের জন্য, খুলে গেল তারপর।

—উনি বাড়ী নেই গো ছোট বাবু। সরু গলায় গৌরী উত্তর দিল। মুখ ফিরিয়ে প্রণব বল্লে,—আচ্ছা, অন্য সময় আসবো। গৌরী বৌ দরজা বন্ধ করবার আগে একবার মুচকি হাসলো। চারদিকে চেয়ে দেখলো আছে নাকি কেউ। নেই কেউ। যাক, বাঁচা গেল, গ্রামের যা সব লোক এ অবস্থায় দেখলে কুৎসা রটিয়ে কিছু আর বাকী রাখতো না। কিন্তু

কেন যেন ভাল করে খুসী হতে পারলো না গৌরী। কেউ দেখলে হতো, ভাগ্যবতী বিন্দি একাই নয়, একথা কেউ না জানায়, গৌরীর মন খচ্ খচ্ করতে লাগলো।

বিকেলের দিকে হল্লা করে সব সভা করতে গেলো। শীতকাল, বাড়ী ফিরতে দেরী হবে, কেউ জরাজীর্ণ কোটের উপর পাতলা চাদর জড়ালো। আবার কেউ বা গায়ে দিলো মোটা চাদর, মাথায় বাঁধলো গামছা, কেউ কেউ হাতে লাঠিও নিলো। উৎসাহে ফেঁপে উঠেছে সবাই, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে চীৎকার করলো, লাফিয়ে লাফিয়ে সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হলো। সকলের আগে আগে চল্ল মাখন। বিষ্টু বয়সে ছোট, তার মনে হল মাখন বুঝি তাদের অনেক উপরে। ভয়ে ভয়ে সে মাখনের পাশে যেয়ে জিজ্ঞেস করলো,—তুমি আমাদের নেতা নাকি মাখন কাকা? মাখন বিবর্ণ হয়ে বল্লো,—চুপ কর পাজী, ছোটবাবু শুনবে। মাখন জানে ছোটবাবু তাদেব নেতা, সুতরাং তাকে নেতা বলা শুনলে ছোটবাবু চটে যেতে পারেন। তা' ছাড়া ছোটবাবুর সম্মান, সে কোন দিনই আশা করে না। অত বড় দুরাকাংখা তার নেই। দয়া করে তাদের সুখের জন্য ছোটবাবু চেষ্টা করছেন বলেই তারা শুধু তাঁর সংগে কথা বলতে সাহস পায়।

গ্রামে পুরুষ মানুষ নেই বল্লেই হয়। সকলেই সভায় গেছে। বিন্দির স্বামী রাইচরণও গেছে। বিকেলের দিকে বারান্দায় মাদুর পেতে সে অনেকক্ষণ ধরে চুলের জট ছাড়ালো। শিশি উপুড় করে সবটুকু নারকেল তেল মাথায় দিলো। অনেকদিন পর ঝামা দিয়ে গা-হাত-পা সে পরিষ্কার করেছিলো, সর্ষের তেল দিয়ে গা-টা সে তেল কুচকুচে করে

ছাড়লো। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে কাপড় পড়লো, জললাগা ময়লা আয়নায় বিন্দি মুখ দেখলো। মুচকি হাসলো।

রাত্রে বাড়ী ফিরে রাইচরণ জিজ্ঞেস করলো,—সেজে গুঁজে বিবিজান হয়ে বসে আছিস যে, ব্যাপার কিরে বিন্দি? বিন্দি কৃত্রিম রাগে মুখ ভার করলো.—না, সাদ আহ্লাদ কি আমার কিছু থাকতে আছে? রাগ করলে বিন্দিকে বেশ দেখায় কিন্তু, হঠাৎ রাইচরণের মনে হল। কেমন একরকম বেয়াড়া ইচ্ছে হ'তে লাগলো ওর, মনে ধরলো জ্বালা, শরীরের শিরায় কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে অস্বস্তি ফুট্‌ছে। মুখের চামড়া হল ওর কুঞ্চিত, গোটা কয়েক দাঁতও বেরিয়ে পড়লো। বিন্দিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজেকে তার পাগল মনে হতে লাগলো।

—সারারাত খোলায় কি কর? বাড়ী ফেরা যায় না? বিন্দি জিজ্ঞেস করলো রাইচরণকে। একা একা রাতে আমার ভাল লাগেনা।

বিন্দিকে আদর করতে করতে রাইচরণ বুঝাতে লাগলো, আঁখ সব কাটা হয়ে গেছে, ক'টা দিন রাত জেগে একটা ব্যবস্থা না করলে সবসর শুকিয়ে যাবে, তাই আর ক'টা দিন বিন্দি লক্ষ্মী মেয়ে তো, ধৈর্য ধরে থাক। তা' ছাড়া আজ সভাতে প্রণববাবু যেরকম হিসাব দিলেন, গুড় দিয়ে অনেক টাকা ঘরে না এনে তারা ছাড়ছে না।

—যাই বল বাপু, ছোট বাবুকে আমার মানুষ ভাল মনে হয় না। বিন্দি প্রতিবাদ করলো।

রাইচরণ খোলায় গেলে রতিকান্ত বাবু নিজেই একবার জিজ্ঞেস করতে এলেন, অনেক টাকা তো খাজনা বাকী হল, দেয়া টেয়ার মতলব আছে নাকি তার?

—উনি বাড়ী নেই গো, খোলায় গেছে। দরজা খুলে বেরিয়ে

কাস্তে

এলো বিন্দি,—খোলায় যে কাজ পড়েছে সারারাত থাকতে হয়, তোমার খাজনা দেবে কে গো বাবু ? তারপর বিন্দি এক রকম অমার্জিত হাসলো। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই রতিবাবুর। রাস্তায় এখনও যখন লোক যাতয়াত করছে, রাত নিশ্চয়ই বেশী হয়নি। ওপাড়ায় একবার খাজানার তাগাদা দিয়ে আসুন তিনি। বিন্দির ঘরের খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে, বিন্দির মুখের ওপরও পড়ছে খানিকটা। সময়টা কিন্তু শীতকাল, তা' হোক বিন্দি চাষার বৌ হলেও সুন্দরী।

খোলা আজ সরগরম। বিকেলের সভার আলোচনা চল্‌ছে। বড়লোকের অত্যাচার নাকী কেউই আর সইবে না। এমন দিন নাকী শীগ্‌গীরই আসবে, যখন ছোট বড় কোন লোক থাকবে না, সবাই সমান।

কিন্তু রাইচরণের এসব কিছুই ভাল লাগছে না। মন তার ভাল নেই। শরীরেও কেমন জ্বর বোধ হচ্ছে। কাজ না করে আগুনের পাশে বসে দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলো সে। হঠাৎ তার মনে হল বাড়ী গেলে হয় না ? বিন্দি খুশী হবে।

মাথায় কাপড় জড়িয়ে, হাতে কাস্তে নিয়ে সে শেষ রাতে বাড়ী ঢুকলো। তার ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে, রতিবাবু বুঝি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেয়ে হাতের কাস্তে সবলে বাবুর মুখের দিকে ছুঁড়ে দিলো রাইচরণ।

কাঙ্খিতার সাধনা

ভবানীপ্রসাদ দত্ত

ভবানীপ্রসাদ দত্ত : জন্ম—তেরশ' চব্বিশ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় প্যারাব গ্রামে। ছাত্রজীবন—ঢাকা। বর্তমানে ইনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়ছেন।

কাঙ্খিতা সেনের বয়েসটা যে কত তা ঠিক বলবার যো নেই। অনেকে বলেন তাঁরা যখন ছোট তখন থেকেই কাঙ্খিতা সেনকে তাঁরা এত বড়ই দেখে এসেছেন। এখন তাঁদের মেয়েরাই ততবড় হতে চলল যতবড় বয়েস থেকে কাঙ্খিতা সেনকে তাঁরা এতবড় দেখে এসেছেন। কাঙ্খিতা সেনের সমপাঠিনীরা আজ কেউ-বা মায়ের মা, কেউ-বা দুই একটী পুত্র কন্যা রেখে এ সংসার থেকে বিদায় নিয়েও চলে গেছে।

তাই কাঙ্খিতা সেনের এমন একটা বিশেষ গুণ আছে যাতে করে তার দেহে তার বয়েস পড়েছে বাঁধা। কাঙ্খিতা সেনের বর্ণ মিশ্ কালো, দৈর্ঘে সাড়ে পাঁচ ফিটের উপরে, দেহের মধ্যে গড়নের কিংবা সৌকুমার্যের কোন বালাই নেই, যেখানে যা কিছু আছে নিজেদের স্থানে তারা 'সলিড' পাকা পোক্ত কায়েমী ভাবেই আছে। তার মধ্যে ক্রমবিকাশের কোন পর্যায় চোখে পড়ে না। কপালের বাঁ দিকের কাটা দাগটা একটা লম্বমান জয়তিলকের মতো। হাতের আঙুল-গুলি যেন একটি নিগ্রো মহিলার, নখগুলি বেঁটে বেঁটে, মনে হয় যেন সাবধানী, আর সবখানে তাও নেই—তাতে করে হয়ত তারা প্রমাণ করছে বাহুল্যের অপ্রয়োজনীয়তা। কাঙ্খিতা সেনের কেবল নাক, চোখ, মুখ দেখে তাকে পুরুষ বলে ভ্রম না করাটাই একটা ভ্রম, কারণ কাঙ্খিতা সেনের মুখখানা টোষ্টেড। আর নাতিদীর্ঘ চুলগুলি একেবারে

সরল, এর মধ্যে বক্রতার কিংবা অবাধ্যতার লেশমাত্র নেই। এই একান্ত বাধ্য চুলগুলিকে নিয়ে কাঞ্চিতার হয়েছে মহামুস্কিল—চুলে খোঁপা বাঁধতে গেলে তার কানে পড়ে খাটো। আবার কান ঢাকতে গেলে খোঁপায় পড়ে টান। এই ঝামেলা থেকেই রেহাই পেতে কাঞ্চিতা আজকাল চুল বাঁধে অনেকটা শিখ সৈনিকের মতো। সবচেয়ে মহিমা বেশী কাঞ্চিতার দাঁতের—তারা মুক্তির পিয়াসী, কিছুতেই তারা মানতে চায়না ঠোঁটের বাঁধন, তাই তারা সব সময়ে ঠোঁটের কারাপ্রাচীর ভেদ করে বিকশিত হয়ে থাকে আপনার মহিমায়। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা এক সময়ে তার নাম রেখেছিলো দন্তিকা। সেটা দুষ্টু ছেলেদের কথা। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, হঠাৎ একদিন কাঞ্চিতা সেন যদি তার শক্ত, পাকা পোক্ত, পেটান কাঠখোট্টা শরীরে একটা হাত-কাটা গেঞ্জীর উপরে একটা আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে আর জন্‌হিং এর একজোড়া পাম্পস্ু পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে কারো বোঝবার সাধ্য নেই কাঞ্চিতা মেয়ে।

বড় লোকের মেয়ে কাঞ্চিতা সেন। অজস্র টাকা তার বাবার। কলকাতার উপরে চারখানা মস্ত বাড়ী। দুখানা মোটর: একখানা মিস্টার সেনের আর একখানা মিস্ সেনের। কাঞ্চিতার মা নেই। আর এ সুসময়ে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরও তাদের বেশ অভাব। কাঞ্চিতার বাবা ব্যবসায়ী। টী-গার্ডেন আর কোল-মাইন আছে তাঁর। কাঞ্চিতা বলে—তার বাবা এক কালে খুব গরীব ছিলেন। এ কথা ঠিক, কপাল যাদের ভালো তাদের তো আর ধরে রাখা যায় না—তার বাবা একবার আইরিশ সুইপে পেলেন ফার্স্ট প্রাইজ, তারপর থেকে তাদের এ উন্নতি। মন্দলোকে বলে—মিস্টার সেন কোন ধনী বাইজির মৃত্যুকালে আপনার নামে উইল করিয়ে তার সমস্ত

গচ্ছিত অর্থের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তারপর থেকেই তাঁর টী-গার্ডেন আর কোল-মাইন ; তারা আরও বলে এই কাঙ্খিতা সেনকেও নাকি তিনি কয়লার খনিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সহজেই বুঝতে পারা যায় মন্দলোকের সব কথা সত্যি নয় অন্ততঃ কাঙ্খিতা সেন কয়লার খনিতে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে নয়।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। কাঙ্খিতা সেবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। এক ঘন সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে বসে পিতাপুত্রীতে পরীক্ষার ফলাফল সংবন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। বছর সতের আঠার বয়সের একটি ছেলে এসে দাঁড়াল তাদের দোর গোড়ায়। খুব সুন্দর চেহারা গৌরকান্তি, জামা কাপড়ের অবস্থা তার দুঃস্থ, বড় বড় চোখ দুটো তার বুঁজে না গেলেও অনেকটা বসে গেছে। ওলটান কোঁকড়া চুলগুলি তার তেলের অভাবে রুক্ষ। পায়ের জুতাজোড়া দামী হলেও ছেঁড়া। আর দেখেই বুঝা যায় আজ তার কিছু খাওয়া হয়নি।

তাদের দু'জনকে নমস্কার জানিয়ে ছেলেটি বললে—আপনার কোন লোক চাই ?

পিতাপুত্রী দু'জনেই একটু আশ্চর্য হয়। জিজ্ঞেস করে—কিসের লোক ?

—কাজ করবার।

—কি কাজ জানো তুমি ?

—এই আপনারা যা বলবেন। ছেলেটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল। বুঝিবা সে পড়ে যাবে।

মিস্টার সেন উঠে এসে বসিয়ে দিলেন তাকে একটা সোফায়। তারপর কাছে বসে বললেন—এখন আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাইনে, তুমি বিশ্রাম করে সুস্থ হও তারপর তোমার কথা শুনব, মা কাঙ্খি, এর জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এস।

চা আর রাশীকৃত খাবার শেষ করে ছেলেটি যখন একটু সুস্থ হল মিস্টার সেন তখন প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম কি বাবা ?

—আমার নাম সীতেশ চৌধুরী।

—তোমার বাড়ী কোথায় ?

—বাড়ী আমার নেই।

—মানে ? সব কথা খুলে বলো। তোমার কোন ক্ষতি আমরা করবনা। তোমার বাবার নাম কি ?

সীতেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রুদ্ধকণ্ঠে বললে—আমার মা বাপ নেই। তারা গেছেন আজ চার বছর, তারপর আমি মামার কাছে থাকতাম বরিশালের এক গ্রামে। কিছুদিন আগে আমার সে মামাও মারা গেছেন এক নৌকাডুবিতে। মামা ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর যা কিছু ছিল সব দখল করে নিয়েছে তার খুড়তুতো ভাইয়েরা। এ সংসারে আমার আর কেউ নেই। নিজের কাছে আমার দশ বার টাকা ছিল। কলকাতা পর্যন্ত ভাড়া আর আমার কালকে পর্যন্ত খাওয়াতেই সব ফুরিয়ে গেছে। আজকে আপনাদের দয়ায় এই আমার খাওয়া হল। আপনি দয়া করে আমায় স্থান যদি দেন তা হলে আমি বাঁচি। কত বড়লোকের বাড়ীতে গেছি, কিন্তু আপনার মত সদয় ব্যবহার আমায় কেউ করেনি, কেউ তাড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ বা বলেছেন, খাবার না থাকে স্টেশনে যেয়ে কুলিগিরি করগে যাও। আমার এখানে কি—। মিস্টার সেন হেসে বললেন—কুলিগিরি করবে কেন, তার চেয়ে বরং তুমি আমার এখানেই থাকো, কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ তুমি ?

—আজ্ঞে এ-বছর আমি আই-এ পাশ করেছি।

—তা বেশ, তুমি আরও পড়তে চাও এখানে থেকেই পড়ো। আমি সমস্ত খরচ দেব। তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে, বুঝলে !

সকলের অজ্ঞাতে সীতেশের মনটা নেচে উঠেছিল—যে জন্যে তার বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসা সে আশা তার সফল হবে তাহলে। অভিমানে তার মনটা আবার কেঁদে উঠেছিল। সত্যি এ যে তার পক্ষে একান্ত দুর্বিসহ! পরের বাড়ীতে থেকে পড়া! তার কিসের অভাব? বিশাল জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। কিন্তু তবু সে এখানেই আঁকড়ে পড়ে থাকবে। ফিরে যাবেনা কিছুতেই তার বাবার কছে। থাকুন তিনি তাঁর জমিদারী আর তাঁর অন্ধ গোঁড়ামি নিয়ে। এই তো সবে তার বয়েস আঠারো। এর মধ্যেই তার বিয়ে করবার কি দরকার পড়ছে! কত তার আশা কত তার আকাঙ্ক্ষা। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সে সিদ্ধিলাভ করবে নিজের সাধনায়। দেখিয়ে দেবে তার ভ্রান্তিবিহ্বল বাবাকে অল্প বয়সে বিয়ে না করলে চরিত্র খারাপ হয় না, বেশী লেখা পড়া শিখলেই বাঙালী ফিরিঙি বনে যায় না।

সীতেশ বি-এ ক্লাশে ভর্তি হয়ে গেছে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে আর কাঙ্খিতা আই-এ-তে। এই সুদীর্ঘ দুটি বছরের দিনপঞ্জী আমাদের কাজে আসবেনা বিশেষ। তবে একটি রাত্রির ঘটনার সংগে 'কালো মেয়ে সংঘের' কোন সংবন্ধ থাকতেও বা পারে।

সীতেশের পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে। সে খুব ব্যস্ত। আর বিশেষ করে ইংরাজীতে তাকে ফার্স্ট ক্লাশ পেতেই হবে, এই ছিল তার পণ। কাঙ্খিতার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। একদিন রাত প্রায় এগারোটার পর, বাসার অন্য সবার যখন ঘুমিয়ে পড়বার কথা, সীতেশের পড়ার ঘরের দরজায় হয় মৃদু শব্দ। তারপর দরজা ঠেলে যে ঘরে ঢোকে সে কাঙ্খিতা। ডাগর চোখ দুটো তার একটু ফুলেছে মনে হয়—এই মাত্র সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে এসেছে। দরজাটা বন্ধ করে তার মাথা রেখে একমিনিট চুপ করে দাঁড়ালো কাঙ্খিতা। সীতেশ তার

উপর দিকে চেয়ে আছে। আশ্চর্যান্বিত সে। এত অধিক রাত্রিতে এমন একটা বিসদৃশ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না সে মোটেই, যদিও ছোটখাটো দু একটা আক্রমণ সে যে সহ্য না করে এমনও নয়। তবু এমনটি সে কিছুতেই আশা করিতে পারে নি। নিজের অজ্ঞাতে শিঁউরে ওঠে তার মন।

হঠাৎ কাঙ্খিতা তার ভাবটা একটু সহজ করবার চেষ্টা ক'রে এসে বসে সীতেশের পড়বার টেবিলের উপর। সহজ কণ্ঠে বলে—রাগ করোনা, তোমার এ রাতটা না হয় আমি চেয়েই নিলাম!

সীতেশ আজ নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছে—কিন্তু কি তোমার দরকার। বললে উষ্ণ সীতেশ।

এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে কাঙ্খিতা আগের কথার জের টেনে বলে—কি হয় একটা রাত না পড়লে, আর এগারোটা তো বেজেই গেছে। এর পর আর কতই বা পড়বে। সত্যি সীতেশ, আমি ভাবি একটা কথা—

হঠাৎ তার কথায় একটা আকস্মিক বিচ্ছেদ আনে কাঙ্খিতা।

সীতেশ শংকিত, সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞেস করে—কি কথা?

—ভাবি ভগবান আমায় এত বঞ্চিত ক'রে সৃষ্টি করলেন কেন? কেন তিনি দিলেন না আমায় এতটুকু দৈহিক ঐশ্বর্য, এতটুকু সৌন্দর্য, এতটুকু নারীদেহের রূপের ছটা, যাতে করে পুরুষ হয় বিহ্বল—কেন তিনি আমায় এতো রিক্তা করে সৃষ্টি করলেন বলতে পারো সীতেশ? আর তুমি পুরুষ, যার একটা পেশীবহুল দেহ হলেই চলে তাকে তিনি সৃষ্টি করলেন রূপের জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। রাস্তায়, পথে, ঘাটে, সিনেমায়, ক্লাশে, যেখানে দেখতে পাই ফর্সা রঙ্‌ তুমি জানোনা সীতেশ কি দুরন্ত সাধ জাগে, ইচ্ছে হয় ওদের

গিলে ফেলে আমি ফর্সা হয়ে যাই। আমি ওদের গা ঘেঁসে হাঁটি। পাশে বসি। ভাবি ওদের ছোঁয়াচ লেগে আমার দৈহিক দীনতা যদি একটু কমে। তারপর আবার নিজেই হাসি, এ যে কমবার নয়, জগতের সমস্ত ফর্সা রঙের মানুষের গা ঘেসে বসলেও এ রঙ্ এত টুকু ফর্সা হবেনা। এ যে কায়েমী হয়ে আছে একেবার মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর কে জানে চিতার আগুনে এ কালো রঙ্ পুড়ে ছাই হবে কি না।

—কিন্তু আমায় ও সব শুনিয়ে কি লাভ? বলে অসহিষ্ণু সীতেশ।

এবার মেজাজ উঠে চড়ে। বলে—লাভ? লাভ এই যে তোমার ঐ জঘণ্য ফর্সা রঙ্, অসহ্য সৌন্দর্যের উপর আমার জেগেছে পিপাসা, যে পিপাসা আমি এই দুবছর সহ্য করেছি কিন্তু আজ আমার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে সীতেশ, আজ আর আমি পারছিনে। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মাতালের পিপাসাও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী নয়। অনেক ভেবেছি, আমার মনের শত শত প্রশ্নের উত্তরে শুধু এই প্রশ্নই আমার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—কেন তুমি রূপের অমন ঐশ্বর্য নিয়ে উদিত হয়েছিলে আমার সামনে।

সীতেশ ভীত হয়। শিঁউরে উঠে।

এই ঘটনাবহুল রাত্রির পরদিন সীতেশকে আর পাওয়া যায়নি। তার বই, জামা কাপড় সব কিছু পড়ে রয়েছে আর সে সংগে একটা চিঠি।

কাঙ্খিতা,

বড়ো অকৃতজ্ঞের মতো চলে গেলাম। না যেয়ে যে আমার উপায় নেই। উদ্যত কামানের মুখে কত পাহাড় উড়ে যায়, আমিতো সামান্য একটা মানুষ। বড়ো মায়া এই দেহটার উপরে।

তুমি কিছুদিন আগে পত্রিকায় যে এক নিরুদ্দিষ্ট যুবকের বর্ণনার সংগে আমার চেহারার মিল খুঁজেছিলে আমিই সেই নিরুদ্দিষ্ট যুবক।

কাঙ্খিতার সাধনা

আমার পরাজয় হয়েছে কাঙ্খিতা। বাবার কাছে আমার পরাজয় হয়েছে।

বন্ধু হিসেবে তোমাকে বলি তোমার এ ডিনামাইটিক বিস্ফোরণ আর যেন কারো উপরে না হয়। এ বিভীষিকা রাত্রি চিরদিন জেগে থাকবে।

সত্যি তোমার জন্যে মায়া হয়। ততোধিক হয় সহানুভূতি। কিন্তু তোমায় যে কোনদিন ভালবাসতে পারিনি কাঙ্খিতা, জানি তুমি বাইরে থেকে ভেতরে অনেক ঐশ্বর্যশালিনী। এ সাধনায় আমি সিদ্ধিলাভ করিনি।

তোমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ পারবনা বোধ হয় শোধ করতে কোন দিন। ইতি—কৃতঘ্ন সীতেশ চৌধুরী।

যাক্ এই গেলো প্রস্তাবনা। এখন আমাদের গল্প আরম্ভ হবে।

সীতেশের চলে যাবার পরে চার বছর কেটে গেছে। আর এই চার বছরে গড়ে উঠেছে কাঙ্খিতা সেনের যুগান্তকারী "কালো মেয়ে সংঘ"। নামটা থেকেই এ সংঘের উদ্দেশ্য সংবন্ধে হয়ত বা কিছু আভায পাওয়া যায়। তবু ব্যাপারটা পরিস্কার করে বলাই ভালো। এ সংঘের নেত্রী হচ্ছে আমাদের কাঙ্খিতা সেন। সংঘের উদ্দেশ্য—সারা বাংলার কালো মেয়ের মুক্তি সাধন। যারা এসভার সভ্যা হবেন তাদের শুধু কালো কুশ্রী হলেই চলবেনা, নিম্নলিখিত সর্তগুলি তাদের মেনে চলতে হবে। সভ্যাদের চিরকুমারী থাকতে হবে, কেহ কোনপ্রকার টয়লেটিং ব্যবহার করতে পারবেনা, কেহ কাণ ঢেকে চুল বাঁধতে পারবেনা, রঙিন শাড়ি পরতে পারবেনা, মানে তারা এমন কিছু করতে পারবেনা যাতে করে এই মনে হতে পারে যে নিজেদের দৈন্যকে তারা বাইরের উপকরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেক রবিবার এই সভার বৈঠক বসে। আর এই সভার আলোচনার বিষয় বস্তু—কেমন করে এই সভার কালো

কুশ্রী মেয়েরা সমস্ত যুবকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাঁড়াতে পারে নিজেদের পায়ে। এই সভার আর একটি উদ্দেশ্য এই সভার উদ্যোগে শিল্পালয় স্থাপন করা, এবং এমনি করে নিজেদের একেবারে স্বাবলম্বিনী করে তোলা।

কাঙ্খিতা সেনের এ উদ্যোগ সৃষ্টি করলো সারা সহরের বুকে ভীষণ উদ্বেগ চাঞ্চল্য। এমন কি এ বার্তা সহর ছাড়িয়ে সুদূর গ্রামে যেয়ে পৌঁছোতেও বিশেষ দেরী হলনা।

কাঙ্খিতা সেনের আজকাল এক মুহূর্তের অবসর নেই। তাই অমিতা গুহকে করে নিতে হয়েছে তার অ্যাসিসট্যাণ্ট। অমিতাও বড় লোকের মেয়ে, রঙ্‌ও তার কাঙ্খিতার মতোই চেহারাটাও বিশ্রী। তবে ভাল বক্তৃতা দেবার, চটপট একটা কিছু বুঝে নেবার ছোট খাটো গুনগুলিও তার আছে বেশ।

সংঘের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে এখন লাফিয়ে লাফিয়ে। সংঘের সভ্যাদের সংখ্যাও বেড়েছে খুব। প্রথমে অভিভাবকেরা একটু আপত্তি করতেন। কিন্তু সংঘের উদ্দেশ্য ও সর্তগুলি শুনে তাদের সে আপত্তিগুলি আজকাল আর নেই; বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে না, টয়লেটিং কিনে দিতে হবে না, নিত্যনূতন ডিজাইনের শাড়ি কিনতে হবে না, সর্বোপরি মেয়েরা হ'তে যাচ্ছে স্বাবলম্বিনী—এর পরে আর কোন চিন্তাশীল অভিভাবকের অমত থাকতে পারে না।

—আপনাদের এ মহান চেষ্টা, সে যে কতো মহান জানি আমরা শুধু যাদের মেয়েরা কালো। কত কালের কত নির্যাতন সহ্য করেছি আমরা, কতো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে কালো মেয়ের বিয়ে দিতে আর কত কালো মেয়েই না স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, অসহ্য নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে।

কাঙ্খিতার সাধনা

বাস্তবিক কালো রঙ্ কি একটা রঙ্ নয়? আমি তো মনে করি কালো রঙ্ই জগতের সমস্ত রঙের স্ট্যাণ্ডার্ড হওয়া উচিত। কারণ এ রঙের ধ্বংস নেই। বরং বয়সের সংগে সংগে এ রঙের মর্যাদা যায় আরো বেড়ে। এক কথায় বলতে গেলে এমন পারমানেণ্ট রঙ্ই-তো আর নেই। আপনার অভিযান জয়যুক্ত হোক! ইত্যাদি নানা প্রশংসা ও স্তুতি আসে নানাদিক থেকে।

মৃত্যুর পূর্বেই কাঙ্খিতা সেনের বাবাকে তার তিনটে বাড়ী, কয়লার খনি আর চায়ের বাগান হাতছাড়া করতে হয়েছিল। কারণ হয়ত ছিল এই যে তিনি জানতে পেরেছিলেন তার আর বেশী দিন নেই। আর তিনি চান নি কন্যার ঘাড়ে একটা ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেতে। কাঙ্খিতার জন্যে নিজের বসতবাটি আর কয়েক হাজার টাকা রেখে এক অপ্রত্যাশিত ক্ষণে তিনি চোখ বুঁজেছিলেন। কন্যার কাছে বিয়ের কথা পেড়ে পেড়ে শেষটায় তিনি হাল ছেড়েছিলেন।

কাঙ্খিতার নিজের বাড়ীতেই আজকাল সভা বসে। কয়েকটা ঘরে বসান হয়েছে তাঁত, আর কয়েকটি কালো কুশ্রী অনাথারও স্থান তার বাড়ীতে।

তার বাড়ীর একটা ঘর প্রায় সব সময়েই থাকে তালাবন্ধ—সেটা সীতেশের পড়ার ঘর। রাত্রিতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে কাঙ্খিতা এসে বসে এই ঘরে। বইগুলোর ধূলো ঝাড়ে, খাতাগুলি উল্‌টে পাল্‌টে আবার গুছিয়ে রাখে। এখানকার একটি বই-খাতা এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয়নি কাঙ্খিতা। টেবিলের উপরে মাথা রেখে সে ভাবে, তার এ উদ্যোগের কথা কি সীতেশ জানতে পারে নি—কোন দিনই কি সে জানবে না? হ্যাঁ, যতদিন না জানে ততদিনই ভালো! সীতেশ জেনে ফেললে তার যে আর কিছু করবার থাকবে না! কে জানে

সীতেশ আজ কোথায় আছে। হয়ত নিজেই সে আজ জমিদার হয়ে বসেছে, রাঙা টুকটুকে বৌ ঘরে, ফুটফুটে একটি ছেলে হয়েছে—সব মিলে যেন একটা গোলাপের বাগান। উঃ, অসহ্য। সীতেশের পাশাপাশি আর একটা মুখ কাঙ্খিতার মনে জাগে। সীতেশের চেয়ে কোন অংশে সে কম সুন্দর নয়। অনিমেষ হয়ত আজ তার এ দেহটা চায় না, হয়ত এর উপর তার যথেষ্ট ঘৃণাই আছে, সে চায় তার অর্থ, কিন্তু এমন একদিন আসবে, সে তার এই দেহটাকে না চেয়ে পারবে না। সেদিনই হবে সীতেশের বিরুদ্ধে তার সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া।

কিন্তু তার সংঘ? সে নেত্রী হয়ে করবে এ কাজ? তাহলে তার কর্মের সিদ্ধি?—সে চায় না সিদ্ধি, হতে পারে না এর সিদ্ধি।

অমিতা এসে বলে—চলো কাঙ্খিতাদি, চাঁদা আদায়টা সেরে ফেলি। আজ এক মস্ত বড় লোকের সন্ধান পেয়েছি, যার বয়েস অল্প কিন্তু মনটা বড়ো।

পথ চলতে কাঙ্খিতা বলে—আচ্ছা অমিতা তুই কি ভাবিস্ আমাদের এ অভিযান সফল হবে?

অমিতা আশ্চর্যান্বিত হয়। জিজ্ঞেস করে—তোমার মুখে আজ এ প্রশ্ন কেন?

কাঙ্খিতা হাসে। বলে—এমনি!

তাদের গাড়ী এসে থামে এক হাল ফ্যাসানের নতুন বাড়ীর সামনে। বেশ বাড়ীখানা। ফটকে মারবেল পাথরে লেখা—এস চৌধুরী এম্-এ।

কাঙ্খিতা এবার থমকে দাঁড়ায়। একটা প্রশ্ন জাগে মনে। তারপর তারা এসে বসে ড্রয়িংরুমে।

ভৃত্য খবর দেয় ভেতরে।

কাঙ্খিতার সাধনা

কতক্ষণ পরে একটি ফুটফুটে ছেলে কোলে করে যে ঘরে ঢোকে সে নিজে আর কাঙ্খিতা দু'জনেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। অমিতা দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায়। কাঙ্খিতা তা পারে না। তার যে নড়বার শক্তি নেই।

অমিতা বলে—বসুন। তারপর চলে তাদের সংগে আলাপ আলোচনা। ভৃত্যকে দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভেতরে।

সীতেশ বলে—হ্যাঁ, তোমার এই সংঘের কথা আমি জানি কাঙ্খিতা। এতে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমার সামর্থ-অনুযায়ী তোমাদের আমি সাহায্য করব।

তারপর তারা উঠে পড়ে। অমিতা বলে—আর একদিন আসব।

—এ ভদ্রলোকের সংগে দেখছি তোমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল—পথ চলতে বলে অমিতা কাঙ্খিতাকে—কি চমৎকার লোক দেখেছে!

কাঙ্খিতা বলে—হুঁ!

অমিতাকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে কাঙ্খিতা আবার চলে আসে সীতেশের বাড়ীতে। সীতেশ তখনো ড্রয়িংরুমে বসেই কাগজ পড়ছিল। কাঙ্খিতার এই অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাবে সে এবার একটু বিশেষ করে আশ্চর্য হয়। একটি বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রির কথা তার মনে জাগে। বলে—বসো।

—না বেশীক্ষণ বসবনা, তোমার সংগে বিশেষ কয়টি কথা আছে তাই আবার এলাম। তোমার কোন ভয় নেই, ঠিক হয়ে বসো। এ বাড়ী করেছ কবে?

—এ বাড়ী আমি করিনি। শ্বশুর দিয়েছেন।

—তা বেশ। বিয়ে করেছ কদ্দিন?

—বছর চারেক হল। তোমাদের বাড়ী থেকে চলে আসবার মাস চারেক পরে।

—ছেলেটির বয়েস কত?

—দু বছর।

—কই তোমার বউকে তো একবার দেখতে বললে না? তিনি নিজেও তো একবার এলেন না আমার সামনে, ওঃ, তিনি হয়ত আমায় চেনেন না।

কতক্ষণ পরে সীতেশের স্ত্রী ঢোকে ঘরে। কোলে তার ছেলে।

—এ তোমার স্ত্রী? সত্যি তোমার? জিজ্ঞেস করে বিস্ময়-বিমূঢ়া কাঙ্খিতা।

সীতেশ হাসে। বলে—হ্যাঁ, এ আমারই স্ত্রী।

—আচ্ছা আপনি ভেতরে যান। বলে কাঙ্খিতা।

সীতেশের স্ত্রী একটু হেসে চলে যায় ভেতরে।

—এ অভিমান তোমার কার উপরে সীতেশ? জিজ্ঞেস করে ব্যথিতা কাঙ্খিতা

—কিসের অভিমান কাঙ্খিতা?

—আমি জানি তুমি ইচ্ছে করলে বাংলার সেরা সুন্দরী বিয়ে করতে পারতে। কিন্তু তবু যাকে কোন মতেই সুন্দরী বা চলনসইও বলা চলে না, যার গায়ের রঙ্‌টা অনেকটা আমারি মতো, তাকে কেন বিয়ে করলে? এ আমি কেমন করে সহ্য করব সীতেশ?

—কিন্তু তোমার এ অভিযান কিসের অভিমানে?

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসে কাঙ্খিতা। —সব কথা জানতে চেয়োনা সীতেশ। একদিন আমার বাবাও তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু দিতে চেয়েছিলেন, সে কথা নয়, কিন্তু তুমি এ কি করলে?

—এ শুধু তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে।

—চুপ করো সীতেশ। চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে কাঙ্খিতা।

—না আজ আর আমি চুপ করব না, শোন কাঙ্খিতা, তোমার নিজের জন্যেই হয়ত আজ আমার কয়েকটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। বিয়ে করবার আগে ভেবেছি একে নিয়ে হয়ত সুখী হতে পারব না, বিয়ের পরেও কিছুদিন এ কথা আমি ভেবেছি, কিন্তু শুনে তুমি হয়তো সুখী হবে না—সত্যি একে আমি ভালোবেসেছি, নিজের সবখানি মন দিয়ে। জানিনা সুন্দরী বউকেও মানুষ এতোখানি ভালোবাসে কিনা!

এবার কাঙ্খিতা একেবারে ভেঙে পড়ে। কে যেন তার মুখটা এইমাত্র পুড়িয়ে দিয়ে গেল। আজ যে সে শেষের সম্বলটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল, এরপরে সে পৃথিবীতে বাঁচবে কি করে। সীতেশ যে তাহলে তাকেও ভালোবাসতে পারতো, একথা কেন সীতেশ আজ তার কাছে এতো স্পষ্ট করে বলে ফেলল! আর একটা কথাও বের হতে পারে না তার মুখ দিয়ে।

ঝড়ের বেগে বের হয়ে আসে কাঙ্খিতা। তার গাড়ী এসে থামে অনিমেষের বাড়ীর সামনে। ব্যস্ত-সমস্ত অনিমেষ জিজ্ঞেস করে—কি খবর?

—আপনার সংগে আমার কোনদিন বিয়ে হবে না, কোনদিন না, কিছুতেই না, অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব।

কাঙ্খিতা স্টার্ট দেয় গাড়ীতে। কিন্তু কোথায় সে চলছে!

অসমান্তরাল

রবিদাস সাহা রায়

রবিদাস সাহা রায়ঃ জন্ম—তেরশ' চব্বিশ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের ফুলবাড়িয়া গ্রামে। পৈতৃক বাসভূমি ঢাকা জেলার বাগবাড়ী গ্রামে। ছাত্র-জীবন—নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায়। এঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'জয়যাত্রা'। বর্তমানে কোন সাময়িক পত্রিকায় কাজ করিতেছেন।

শুধু কাজ আর কাজ। দিনের ভিতর একটুও বিশ্রাম নাই নীলিমার। সেই ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত কাজের আর তাহার অন্ত নাই। এত কাজ কি করিতে পারে মানুষে? নীলিমার ভারি বিরক্তি ধরিয়া যায়।

ভোর হইতেই স্নুরু হয় ছেলেমেয়েদের কোলাহল—খাবারের জন্য বায়না। যাহা হউক খাবার কিছু দিয়া তাহাদিগকে কোনরকমে শান্ত করিয়া নীলিমা নীচে কলতলায় নামিয়া যায় এক বোঝা কাঁথা কাপড় আর থালা গ্লাস লইয়া। কাঁথা কাপড়গুলি কাঁচিতে আর বাসনগুলি মাজিতে সময় অনেক লাগিয়া যায়। কিন্তু ইহার মাঝেও আবার ঘটে বিভ্রাট। ছোট মেয়ে মিনি হয়তো কাঁদিয়া উঠিয়াছে, ছেলে দীপকের চপেটাঘাত হয়তো মিনির পিঠের উপর সশব্দে বর্ষিত হইতেছে...... হাতের কাজ রাখিয়াই নীলিমা উঠিয়া আসে উপরে।

মেয়েটা কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে। কোলে উঠিবার জন্য বায়না ধরে। ছেলেটা অহেতুক অভিমানে মায়ের আঁচল ধরিয়া টানে। নীলিমা কি করিবে ভাবিয়া পায় না। সময় যে তাহার অল্প। কাজ সারিয়াই স্বামীর জন্য ভাত চড়াইয়া দিতে হইবে। অফিসের বেলারও তো বেশী বাকী নাই।

অজয় ঘুম হইতে উঠিয়াই যে কোথায় গিয়াছে—এখনও তাহার ফিরিবার নাম নাই! ঘরে থাকিলে ত ছেলেমেয়েকেও আগলাইতে পারিত। নীলিমা একা কতদিক সামলাইবে? অনুপস্থিত স্বামীর উপর নীলিমা বিরক্ত হইয়া ওঠে।

ছেলেমেয়েকে কোন রকমে শান্ত করিয়া নীলিমা পুনরায় নীচে চলিয়া যায়।

সিঁড়ির উপর শোনা যায় জুতার শব্দ। অজয় আসিয়াছে। মিনি ও দীপক কোলাহল করিয়া ওঠে। মিনি চায় বিস্কুট আর দীপক চায় একটা স্প্রিংয়ের মোটর গাড়ী। অফিস হইতে ফিরিবার মুখে সব আনিয়া দিবে, অজয় তাহাদিগকে এই আশ্বাস দেয়।

সদ্যস্নাতা নীলিমা কাঁধের উপর নিঙড়ানো কাঁথাকাপড় লইয়া উপরে উঠিয়া আসে। অজয়কে স্নান করিবার নির্দেশ দিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া যায়। স্নান করিয়া প্রস্তুত হইতে অজয়ের লাগে দুইঘণ্টা—এই অপবাদটা স্মরণ করাইয়া দিতেও নীলিমা কসুর করে না।

ছেলেমেয়েরাও বাবার সংগে স্নান করিবার জন্য বায়না ধরিয়া বসে। গায়ে মাথায় তেল মাখিয়া অজয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়। ছেলেটিও বাবার সংগে নামিবার চেষ্টা করে। মেয়েটির স্নানের উৎসাহ ততক্ষণে দমিয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির উপর পতনের শব্দ হয়। অজয় ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, ছেলেটি পা পিছলাইয়া পড়িয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া ধরিয়া উঠায়। ছেলেটি ততক্ষণে কাঁদিয়া বাসা মাথায় তুলিয়াছে।

চড়ন্ত ভাতের হাঁড়িটা উনুনের উপর রাখিয়াই নীলিমা ছুটিয়া আসে।

—আমি আর পারিনা বাপু, এত ঝঞ্ঝাট কি সহ্য হয় মানুষের? একা কয়দিক সামলাবো? স্বামীর দিকে চাহিয়া পুনরায় নীলিমা বলে

—ছেলেপুলে নিয়ে একটু হুঁসিয়ার হয়েও চলতে পারো না? সারাদিন তো বাইরেই থাকো। যতক্ষণ ঘরে থাকো ততক্ষণও ওদের একটু দেখতে পারো না?

অজয় চুপ করিয়া থাকে। বোধ হয় জবাব খুঁজিয়া পায় না।

ছেলেকে কোলে তুলিয়া নীলিমা উপরে উঠিয়া আসে। আঘাত স্থানে জলের ঝাপটা দেয়। ছেলে কিছুটা শান্ত হয়।

কিন্তু ওদিকে চড়ন্ত ভাত হাঁড়িতে লাগিয়া পোড়াগন্ধ বাহির হইয়াছে। নীলিমা ছেলেকে একস্থানে বসাইয়া রাখিয়া উনুনের দিকে ছুটিয়া আসে। ব্যাপার দেখিয়া তাহার কান্না পাইতে থাকে।

নাঃ, আজ আর সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। সে অজয়ের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। আজ সে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবে তাহার অক্ষমতা। এত ঝঞ্ঝাট কি সহ্য হয় মানুষের?

ভাতের হাঁড়িতে একঘটি জল ঢালিয়া দিয়া নীলিমা হাতা দিয়া নাড়িতে থাকে। না, আমি আর একদণ্ডও এসব কাজ করতে পারবো না। ঝি চাকরের ব্যবস্থা করে তো করুক। রোজ রোজ এত ঝঞ্ঝাট আমি সইতে পারবো না। নীলিমার কান্না এবার শব্দ-মুখর হইয়া ওঠে।

স্নান-ব্যস্ত অজয়ের কাণে কথাগুলি যায়। সে ভালরূপে স্নান না করিয়াই ভিজা কাপড়ে উপরে উঠিয়া আসে। কিন্তু নীলিমার কান্নামুখর মুখ সহসা মৌন হইয়া যায়। চোখের কোণে নিষ্ফল অশ্রু নীরবে বহিতে থাকে।

অজয়ের দৃষ্টিতে তাহা এড়ায় না। সে নীরবে ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। ভিজা কাপড়টা ছাড়িয়া মাথা না আঁচড়াইয়াই তক্তপোষের উপর গা এলাইয়া দেয়।

অনেকক্ষণ এইভাবে চলিয়া যায়।

নীলিমা খাবার জন্য তাগিদ দিতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। মনের ভিতর দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। অজয়ের হঠাৎ শরীর খারাপ হইয়া পড়িল না তো ?

ধীরে ধীরে নীলিমা অজয়ের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। শংকিত দৃষ্টিতে অজয়ের মুখ চোখের দিকে তাকায়।

অজয় চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছে। ঘুমাইয়াছে কিনা বুঝা যায় না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া নীলিমা স্বামীর পা স্পর্শ করিয়া একটু নাড়া দেয়। ঘুমের মানুষকে জাগানো সম্ভব, কিন্তু যে ঘুমের ভাণ করিয়া থাকে তাহাকে কি কখনো জাগানো চলে! অজয় ঘুমের ভাণ করিয়া থাকে—সাড়া দেয় না। নীলিমা এবার আরও জোরে নাড়া দিতে থাকে। অজয় চোখ কচলাইবার ভাণ করিতে করিতে উঠিয়া পড়ে।

অফিসে যাইবার সময় আর বেশী নাই। অজয় খাইতে বসে। ছেলে মেয়ে আসিয়া ভীড় করে। বাবার সংগে যাইবার সাধ তাহাদের উগ্র হইয়া ওঠে। ইচ্ছা। অন্যদিন হইলে নীলিমা কিছু বলিত না, কিন্তু আজ একেই স্বামীর সময় অল্প এবং নিজের মনও প্রকৃতিস্থ নয়—কাজেই ধমক দিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। অজয় তাড়াতাড়ি কোনরকমে কয়েকগ্রাস মুখে পুরিয়া উঠিয়া যায়। নীলিমা বলে—কিগো, খাওয়া ফেলে যে উঠে গেলে ?

অজয় আঁচাইতে আঁচাইতে বলে—আমার খাওয়া হয়ে গেছে, আজ খিদে বেশী নেই।

নীলিমা ইত্যবসরে স্বামীর জন্য পান সাজিয়া আনে। অজয় অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে গিয়া আবার কি ভাবিয়া পানটি হাতে নেয়। কিন্তু মুখে না দিয়া পকেটে ভরিয়া রাখে।

নীলিমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, কিছু বলেনা।

অজয় চলিয়া গেলে ছেলেমেয়েকে স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া নীলিমা নিজেও খাইতে বসে। খাবার ইচ্ছা যেন তাহার চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু ক্ষুধা তো যায় নাই। একরূপ জোর করিয়াই যেন ভাতগুলি মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেয়। কিন্তু সেগুলিও যেন আজ বিষাক্ত লাগিতেছে। নীলিমা আর খাইতে পারে না। উঠিয়া পড়ে।

দীপক আর মিনি তখন ঘরের ভিতর হট্টগোল তুলিয়া দিয়াছে। দীপক মিনির পুতুলটা ইচ্ছা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই মিনিও তাহার জামাটা ছিঁড়িয়া দিবে, গা কামড়াইয়া দিবে—কাজেই এই অসহযোগ। এঁটো হাতেই নীলিমা ছুটিয়া আসে। উভয়কেই খুব জোরে ধমক দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে। মিনি কাঁদিয়া ভাঙা পুতুলটা মাকে দেখায়। বাঁ হাতে দীপকের গালে চড় মারিয়া নীলিমা মিনিকে কোলে তুলিয়া নীচে চলিয়া যায়।

কাজ সারিয়া নীলিমা যখন উপরে উঠিয়া আসে তখন ঘরের পরিস্থিতি অন্যরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। দীপক রাগে অন্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ঘরের জিনিষপত্র ভাঙিয়া চূরিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে।

দেখিয়া তো নীলিমার চক্ষু স্থির। সর্বনাশ, যে ক্ষতি আজ দীপক করিয়াছে এই গরীবের ঘরে তাহার পূরণ কি করিয়া হইবে? ধনীর ছেলে হইলে হয়তো দীপক রেহাই পাইত, কিন্তু গরীব অজয়ের ছেলে সে। কাজেই রেহাই পাইল না। নীলিমার দুর্দমনীয় ক্রোধ মুষ্ট্যাঘাতে তাহার উপর বর্ষিত হইল।

দীপক কিছুক্ষণ কাঁদিয়া ঘরের এক কোণে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। নীলিমা অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া অবিন্যস্ত ভাবেই তক্তপোষের উপর গা এলাইয়া দিল।

নীলিমা ভাবিতে লাগিল তাহার জীবনের বিগত দিনগুলির কথা। জীবনে কি সে ভাবিয়াছিল আর হইলই বা কি? সে চাহিয়াছিল একটি সুখের নীড়, নিরবচ্ছিন্ন একটি নীড়ের সুখ। কিন্তু একি হইল! শুধু কাজ আর কাজ! দিনের ভিতর একটুও বিশ্রাম নাই তার। তার উপর এই নানা ঝঞ্ঝাট। নীলিমার পক্ষে বাস্তবিক ইহা সম্ভাবনার অতীত।

একটি চাকর কিংবা ঝি রাখিলে অবশ্য এই ঝঞ্ঝাট একদিনেই শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু সংসারের এই অবস্থায় তাহা কল্পনা করাও অন্যায়।

কি ভাগ্য নিয়াই নীলিমা জন্মিয়াছিল! না হইলে এত দুঃখ তাহার কপালে জুটিল কেন? নীলিমা আজেবাজে অনেক কিছু ভাবিতে থাকে।

যদি সমরের সংগেই তাহার বিবাহ হইত? তাহা হইলে তাহার জীবনের সব কিছুই হইত অন্যরূপ। সমর ছিল ধনীর ছেলে। বাড়ী ছিল তাহাদের বাড়ীর পাশেই। তাহাদের কৈশোরের আলাপ, পরিচয়, ভালবাসা—সব কিছুই নূতন করিয়া নীলিমার মনে পড়িল। সমরের সংগে বিবাহ হইলে হয়তো সে সুখীই হইত। এই রকম দাসীর মত তাহাকে সংসারের ঘানি টানিতে হইত না। তাহার হুকুমেই কত দাসদাসী চলিত। মনের দুর্বলতার সুযোগে নীলিমা স্বপ্নের রঙীন জাল রচনায় বিভোর হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্য নীলিমার। না হইলে অজয়ের সংগে কেন তাহার বিবাহ হইল? সমরের সংগে সমস্ত বিবাহের আয়োজন ঠিক। হঠাৎ কোথা হইতে ঝড় উঠিল। উভয় পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সামাজিক কারণে যে সহসা বিবাদ বাধিয়া উঠিল—আর মিটিল না। রাগে দুঃখে সমর দিল্লীতে তাহার দাদার কাছে চলিয়া গেল।

তারপর কি ভাবে যে অজয়ের সংগে নীলিমার বিবাহ হইল, কি ভাবে সে সংসার পাতিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিল, তাহা নীলিমারই

স্বপ্নের মত মনে হয়। অজয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বিদ্বান্—কিন্তু অবস্থা-বিপাকে আজ সে সাধারণ কেরাণী।

নীলিমা ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। চক্ষু বুঁজিয়া নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে।

কিসের যেন শব্দ হয়। নীলিমা চাহিয়া দেখে—সমর। সে চমকাইয়া ওঠে। বলে—একি সমর তুমি?

সমর বলে—হ্যাঁ, আমি, এইমাত্র দিল্লী থেকে ফিরলুম। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। শীগ্‌গীর আমার সংগে চল। সমরের কথাবার্তায় ব্যস্ততা, চোখে মুখে অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব।

—তুমি এসেছ সমর? আঃ—বাঁচলাম। এইমাত্র তোমার কথা আমি ভেবেছি। একটু বসো—তোমাকে অনেকদিন দেখিনি—বসো, তোমার সংগে একটু কথা বলি। নীলিমা আবেগে অধীর হইয়া উঠে।

সমর বলে—না, আমার একটুও সময় নেই, শীগ্‌গীর চলো। সহসা নীলিমার কপালের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া ওঠে। —ওকি, তুমি বিয়ে করে ফেলেছ?

সমর চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। নীলিমা প্রাণপণে তাহাকে ডাকে—সমর! সমর!

সহসা নীলিমার ঘুম ভাঙিয়া যায়। চাহিয়া দেখে ঘরে কেহই নাই। স্বপ্ন মাত্র। দীপক তেমনিভাবে ঘরের কোণে মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে।

নীলিমা নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পায়। হঠাৎ কি করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল? ছিঃ ছিঃ। জানলা দিয়া পাশের বাড়ীর ঘড়িটা

দেখা যায়। চাহিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। একি, এখনো তাহার স্বামী অফিস হইতে ফিরে নাই? সাড়ে চারটার বেশী যে তাহার কোনদিনই হয় না।

দীপককে ঘুমন্ত অবস্থাতেই আলগোছে উঠাইয়া আনিয়া বিছানার উপর যত্ন করিরা শোয়াইয়া দেয়। জানালাটা দিয়া সরু গলিটার যতটা দেখা যায়—তাকাইয়া থাকে। অনেকক্ষণ চলিয়া যায়—তবু অজয়ের দেখা পাওয়া যায় না। নীলিমা মনে মনে কত কিছু অমঙ্গল কল্পনা করিয়া শিহরিয়া ওঠে।

সহসা মুখ ফিরাইয়া নীলিমা বিছানার দিকে চায়। দীপকের মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়ে। সে দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারে না। এ-যে অজয়েরই প্রতিচ্ছবি। সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ। নীলিমার কি একটা মাদকতা ধরিয়া যায়—সে ছুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত দীপকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুখে চুমু খাইতে থাকে। অজস্র চুমু। সে চুমুর যেন আর শেষ নাই।

মৃত্যুর রূপ

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী: জন্ম—উনিশ শ' দু'ই সালে, মুর্শিদাবাদ জেলায়। পৈতৃক বাসভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে। ছাত্রজীবন—হাজারিবাগ ও বহরমপুরে। 'শৃংখল', 'পান্থনিবাস', 'ক্ষণবসন্ত' এঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বর্তমানে ইনি আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

ডাক্তারে বলে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া।

হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। টাইফয়েড কিংবা নিউমোনিয়া, কলেরা কিংবা কালাজ্বর, কিংবা অন্য যে কোনো একটা ল্যাটিন নামের শক্ত রোগ হলেও ক্ষতি ছিল না। তাতে রোগের লক্ষণের হয়তো তফাৎ হ'ত, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনেরও, কিন্তু আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। আমি তখন পরলোকের যাত্রী। আমার কাছে তখন যাওয়ার সমস্যাটাই মুখ্য, যানের সমস্যাটা গৌণ। অসংখ্য লতা-পাতা-ফুলে-ভরা এই পৃথিবী, তারায়-ভরা এই আকাশ, চেনা-অচেনা অগণিত লোকের প্রতিদিনের স্পর্শ, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে যাওয়ার দিন-ক্ষণ যদি ঠিক হয়ে গিয়েই থাকে, তাহ'লে কিসে চড়ে যাচ্ছি, ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া না টাইফয়েড, তা নিয়ে মাথা ঘামানো মিথ্যে।

তবে ডাক্তারে বলে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। আমিও বলি তাই, অর্থাৎ আমার তাতে আপত্তি নেই।

মৃত্যুর সংগে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ কোনো দিন? দেখেছ মৃত্যুর রূপ? সরীসৃপের মতো লক্‌লকে জিহ্বা দিয়ে কেমন ক'রে লেহন করে নেয় মানুষের প্রাণশক্তি, অনুভব ক'রেছ কখনও? ঠাণ্ডা হয়ে আসে

মৃত্যুর রূপ

পায়ের পাতা, তারপরে হাঁটু, কোমর, বুক! পরাজিত রাজার মতো একটি একটি ঘাঁটি ছাড়তে ছাড়তে প্রাণশক্তি আশ্রয় নেয় রাজধানীর সর্বশেষ দুর্গের অভ্যন্তরে। একটির পর একটি অংগ স্তিমিত হয়ে মৃত্যুর ধূমল স্পর্শের কাছে করে আত্মসমর্পণ। দুর্দান্ত শত্রু পরিবেষ্টিত রাজা দুর্গ-কোণে বসে ধুক্ ধুক্ করে কাঁপতে থাকে। তারপরে সেই শেষ আশ্রয়ও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। রাজারও কাঁপুনী আসে ঝিমিয়ে। যুদ্ধেরও সমাপ্তি হয়।

তারপরে? ধোঁয়া।

ধোঁয়ার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী যা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো প্রথমে এসে পায়ের তটদেশে আঘাত করছিল, দেখতে দেখতে সমস্ত চৈতন্যকে তাই গ্রাস করে ফেলে। এর নাম মৃত্যু।

একদা এই মৃত্যুর মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি অনুভব করেছি, সেই সরীসৃপের লেহন। তার ধূম্রবাহিনীর স্পর্শহীন আঘাত শুধু টের পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় না। পরম মৃত্যুকে তেমনি করে একদিন আমার চেনবার সুযোগ ঘটেছিল।

সপ্তমী পূজোর দিন। ভোরের দিকে সানাইএর সুরে ঘুম ভাঙল। দেখি মাথা তোলা যায় না, এত ভারী হয়েছে। বেশ শীতও করছে। চেয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। পূজোর আয়োজনে এত ভোরেই সব উঠে গেছে। তাদের কলরব ওপরে বসেই শুনতে পাচ্ছি।

একটা কিছু গায়ে দেবার দরকার। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে কোথাও কিছু খুঁজে পেলাম না। শুধু বাচ্চুর দলিত-মর্দিত ছোট্ট বিছানাটি এক পাশে প'ড়ে রয়েছে।

ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় বোধ করি আমাকে ডাকবার জন্যেই গৃহিণী এলেন। বললাম, একটা কিছু গায়ে চাপিয়ে দাও তো।

গৃহিণী চমকে উঠলেন। বললেন, সে আবার কি ?

—জ্বর।

—তাই নাকি ? দেখি !

হাত দিয়ে ললাট স্পর্শ করে গৃহিণীর মুখ শুকিয়ে গেল।

—উঃ! এযে খুব জ্বর! দেখ তো কাণ্ড! বাড়ীতে পূজো। কোথায় খাটবে-খুটবে, আমোদ-আহ্লাদ করবে, তা না জ্বর করে বসলে ঠিক এই সময়েই।

গৃহিণী একটা লেপ আমার গায়ে বেশ ক'রে গুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, আর আমি নিঃশব্দে শুনতে লাগলাম। সত্যিই কাজটা ভালো হয়নি। জ্বর মানুষের হয়, আমারও হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে ? যখন নিজের বাড়ীতে পূজো ? যখন বাইরে সানাই বাজছে ? সময় নির্বাচনের দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে, জ্বরের সময়টা ঠিক উপযোগী হয় নি।

তারপর থেকে গৃহিণী একবার বাইরে গিয়ে পূজার্চনা, কাজকর্ম দেখে আসেন আর একবার আমার শয্যাপার্শ্বে এসে ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করেন। উত্তাপ কেবলই বেড়ে চলতে লাগল। ১০২° থেকে তিন, তা থেকে চার, বারোটার সময় উঠল পাঁচ। বাইরের আনন্দ-উৎসব-কলরব, পূজা-অর্চনা, বাইরেই পড়ে রইল। সবাই এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন। তাঁদের মুখে উদ্বেগের চেয়ে অপ্রসন্নতার লক্ষণই বেশী।

একশো পাঁচ জ্বর অবশ্য খুব বেশী। কিন্তু ম্যালেরিয়ার দেশে তাও খুব বেশী নয়। অর্থাৎ উদ্বেগের কারণ নেই। কিন্তু কাল মহাষ্টমীর রাত্রে থিয়েটার আছে। তার পরদিন লোকজন খাওয়া আছে। সে সব দেখবেই বা কে ? করবেই বা কে ?

মৃত্যুর রূপ

ডাক্তার এসে বলে গেলেন, ম্যালেরিয়া। জ্বর একটু বেশী হয়েছে।

ব'লে গেলেন, মাথাটা বেশ করে ধুয়ে ফেলে কপালে জলপটি দিতে।

ভীষণ শীত এবং কাঁপুনি! মাথার স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সব কথা ঠিক মনে পড়ে না! বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল।

কেবল মনে পড়ে রায়-বাড়ীর জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, ওকে মহিমের পাচন খাইও ঠাকুরপো। মহিম কবরেজ তো নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আমাদের পুঁটুকে সেবার, দেখেছ তো!

পাঁচটার পরে আমার ঘুম ভাঙলো। গায়ে ঘাম দেখা দিল। শীত এবং কাঁপুনী দুই-ই অনেক কমে গেল। আমি চোখ মেলে চাইলাম। তখন উত্তাপ একশো একের কিছু বেশী। জ্বর ছেড়ে আসছে। ম্যালেরিয়াই বটে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, বাবা! কি ভয়ই হয়েছিল!

ললাটে যুক্তকর ঠেকিয়ে তিনি মা দুর্গাকে প্রণাম জানালেন।

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে গৃহিণীও কটাক্ষে হাসলেন। ভাবটা, এত ভয়ও তুমি দেখাতে পার!

ভ্রাতুষ্পুত্র মিণ্টু সকালে আমার কাছ থেকে এক বাক্স তারাকাঠির প্রতিশ্রুতি 'আদায় করেছিল। বেচারা কতবার যে এসে ফিরে গেছে কে জানে! দরজার কাছে এখন এসে দাঁড়াতেই সে কথা মনে পড়ল। বেচারার মুখখানি শুকনো। তারাকাঠির লোভ আছে, কিন্তু সকালের সে উৎসাহ নেই। মা বললেন, কি গো তুমি কি মনে করে?

মিণ্টু লজ্জায় দরজার সংগে মিশিয়ে গেল।

বললাম, কি রে, তারাকাঠি? এই নিয়ে যা।

বালিশের নীচে থেকে মানিব্যাগটা বার করে ওর হাতে একটা সিকিই দিয়ে দিলাম। মিণ্টু আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না।

আমরা হাসলাম।

পাঁচটায় উত্তাপ স্বাভাবিক হল।

এতক্ষণ মা আমার কাছে বসেছিলেন। নীচের কাজকর্ম সেরে গৃহিণী আমার ঘরে আসতেই মা বললেন, তুমি একটু বোসো বৌমা। আমি গা'টা ধুয়ে আসি।

মা চলে যেতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কেমন আছ?

—ভালো।

—জ্বরটা ছাড়ছে, নয়?

—হ্যাঁ।

গৃহিণী ললাটের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছিয়ে বললেন, এত ঘামছে কেন?

—বোধ হয় জ্বরটা ছাড়ছে, সেইজন্যে।

গৃহিণী যেন ঠিক প্রসন্ন হলেন না। আপন মনেই বললেন, তাই ব'লে এত ঘাম!

ভারী ভারী লেপ দু'খানা তুলে ফেলে দিয়ে একটা পুরু চাদর আমার গায়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল।

বললেন, কাল থিয়েটার। কানু ঠাকুরপো এসে আমার শাড়ী আর ব্লাউজ চেয়ে গেছে! ও বুঝি রাণী সাজবে!

—হুঁ।

—তোমার তো আর দেখা হবে না।

—কেন? জ্বর তো ছেড়ে গেছে।

—তা হ'লেও এই হিমে ওটি চলছে না। আজ জ্বর উঠেছিল অত, আর কাল থিয়েটার দেখ! সখটুকু খুব!

মনে-মনে একটু বিরক্ত হলাম। কিন্তু প্রকাশ্যে সাড়া দিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, পূজো হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। প্রসাদ বিলি হচ্ছে। মা গেলেন সেই জন্যে।

—এত দেরীতে ?

সস্নেহে আমার মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে গৃহিণী মৃদু হাস্যে বললেন, বেশ! যে কাণ্ড তুমি বাধিয়েছিলে? সারা দুপুর আমরা কি কেউ পূজোর দালানে যাবার সময় পেয়েছিলাম ?

সে ঠিক। একটু সুস্থ হতেই ওই কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। শীতল করস্পর্শে চোখ জড়িয়ে আসছিল। চোখ বন্ধ করে সেই স্পর্শ গভীর আলস্যে অনুভব করতে লাগলাম।

—কিন্তু তুমি এত ঘামছ কেন ?

—জ্বরটা ছাড়ছে বলে।

—এত ঘাম !

গৃহিণী কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন :

—ডাক্তারকে আর একবার খবর দিই বরং।

—পাগল নাকি! ম্যালেরিয়া জ্বর এমনি ঘাম দিয়েই ছাড়ে, জান না ?

চিন্তিত মুখে গৃহিণী বললেন, এত ঘাম !

—তাই হয়।

—হোক বাপু, আমি একবার ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই।

তাঁর কণ্ঠে সুস্পষ্ট উদ্বেগের স্বর। ক্রমশ যেন তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমার কোনো নিষেধই শুনলেন না। স্ত্রীলোক স্বভাবতই উত্তেজনাপ্রবণ, এই কথা মনে করে আমি কিছুটা বিরক্তভাবে, কিছুটা নিরুপায় ভাবে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম।

মহিম কবিরাজ যত বড় কবিরাজ, পশার ততটা নয়! সে দোষ তাঁর নয়, বর্তমান যুগের। যেখানে আজ পাড়াগাঁয়েও ধুতির উপর বুকখোলা কোট এবং কোটের পকেটে স্টেথোস্কোপ নিয়ে কলকাতার

পাশ করা ডাক্তার আছে, সেখানে উত্তরীয়মাত্রসম্বল কবিরাজ যথেষ্ট পণ্ডিত হলেও অচল।

মহিম কবিরাজেরও সেই অবস্থা। লোকে যখন তাঁকে ডাকে, তখন ফি দিতে হবে না বলেই ডাকে। যখন ফি দিতে পারে, তখন ডাকে নিবারণ ডাক্তারকে। ফি ছাড়া তিনি এক পা'ও চলেন না।

আমার লোক যখন নিবারণ ডাক্তারকে ব্যস্তভাব ডাকতে যাচ্ছিল, কবিরাজ মশায় তখন পূজার দালানে পুরোহিত মহাশয়ের সংগে সৃষ্টিতত্ত্ব সংবন্ধে আলোচনা করছিলেন।

লোকটিকে ব্যস্তভাবে ছুটে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বাপু, এত ছুটে যাও কোথায়?

—আজ্ঞে ডাক্তার ডাকতে।

—কি ব্যাপার? কার অসুখ?

—বড়দার।

যাঁরা আলোচনা করছিলেন, সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকলেই জানতেন, জ্বর ছেড়ে আসছে। ভয়ের কারণ নেই। ইতিমধ্যে এমন কি ঘটতে পারে তার জন্যে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হল, ভেবে সকলেই চিন্তিত হলেন।

—চল তো কবরেজ, দেখে আসা যাক।

—চল।

এই ঘটনা অবশ্য পরে শোনা। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখেছি, তা এই যে, কবিরাজকে পুরোভাগে করে আমার ঘরে একটি দল লোক প্রবেশ করলেন।

আমি মনে-মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। বাড়ীতে পূজো। কাজ-কর্ম উদ্যোগ-আয়োজন অনেক কিছু আছে। সেই অত্যন্ত আবশ্যকীয় কাজ-

কর্মের মধ্যে অকস্মাৎ আমাকে নিয়ে এই অনাবশ্যক সমারোহ অত্যন্ত অশোভন বোধ হচ্ছিল। কিন্তু এই অশোভনতা সংসারে একমাত্র স্ত্রীলোকেই দেখাতে পারে, এই ভেবে আমি নিঃশব্দে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করলাম। সেই সংগে অবশ্য এই বিশ্বাসও ছিল যে, কবিরাজ মহাশয় যখন এসেছেন, তখন এই বিড়ম্বনা অধিককাল স্থায়ী হবে না। তাঁর বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, ব্যাপারটা গুরুতর কিছুই নয়। শুদ্ধ জ্বরটা ছাড়ছে, তাই এই প্রবল ঘামের প্লাবন।

ঔৎসুক্যের সংগে দক্ষিণ হস্ত কবিরাজের দিকে প্রসারিত করে দিলাম। কবিরাজ মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাইতে চাইতে পরম ঔদাসিন্যের সংগে সেখানি তাঁর দুই হাতের মধ্যে তুলে নিলেন।

অনেকক্ষণ তিনি নাড়ী টিপতে লাগলেন। কতক্ষণ জানি না। সমস্ত ঘর নিঃশব্দ। নিঃশ্বাস পতনের মৃদু শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। উপস্থিত সকলের মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া যেন নেমে আসছে। কবিরাজ মহাশয়ের মুখ যেন ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে যেতে লাগল।

হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

—কেমন দেখলে কবরেজ ?

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে কবিরাজ শুধু হাতের ইংগিতে আমার একটি ভাইকে ডাকলেন। বললেন, তুমি ছুটে গিয়ে, ঘণ্টাকে বল, আলমারীর সব ওপরের তাকে ডান দিকের কোণে যে মকরধ্বজ আছে সেইটে নিয়ে আসতে। জলদী।

বাড়ীর মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা বাপু, তাড়াতাড়ি করে একটু মুসুরীর ডালের যূশ করে নিয়ে এস। এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেক না।

—কি রকম দেখলে কবরেজ?

অন্যমনস্কভাবে তিনি শুধু বললেন, হুঁ।

ঠিক সেই সময়েই ডাক্তার এলেন। নিবারণ ডাক্তার পাতলা, মাঝারি গোছের লোক। অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ। হাত, মুখ, চোখ সকল সময়েই অত্যন্ত বেশী মাত্রায় সক্রিয়।

দরজার গোড়া থেকেই তার হাঁক-ডাক শোনা গেল:

—কি হয়েছে? কি হয়েছে? দেখি, ভিড় ছাড়ুন। এই যে বোকরেজ কেমন দেখলে? ডাক্তার কবিরাজকে বোকরেজ বলেন।

ভিড় সরিয়ে তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। নাড়ীটা একবার দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কবিরাজের দিকে চাইলেন।

কবিরাজ হতাশভাবে শির-সঞ্চালন করে কি জানালেন তিনিই জানেন। বোধ হয় এই জানালেন যে, নাড়ী নেই।

ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমার বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কবিরাজ-পুত্র ঘণ্টা এল খল-নুড়ি মকরধ্বজ নিয়ে, যে মকরধ্বজ আলমারীর বিশেষ একটা কোণে সযত্নে এবং সংগোপনে লুক্কায়িত ছিল, বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায়। আর বাড়ীর মেয়েরা নিয়ে এলেন মুসুরীরডালের যূশ।

উভয় পদার্থই একটু একটু খেলাম। তার উপর খেলাম ডাক্তারের দেওয়া ব্রাণ্ডি। এরও উপর সমবেত সকলে কড়ায়ে রক্ষিত কাঠের আগুনে হাত তাতিয়ে তাই দিয়ে আমার হাত-পা ঘষতে আরম্ভ করলেন।

আমি নিঃসাড়ে পড়ে এই অত্যাচার সহ্য করতে লাগলাম নিরুপায়ভাবে।

ডাক্তার কানের কাছে চুপি চুপি কথা কইছেন, ইংরেজীতে:

মৃত্যুর রূপ

—নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে ?

—না।

—বড় জোর তিনটে পর্যন্ত, কি বল ?

—তার বেশী নয়।

—ইনজেকশন ধরছে না ?

—একেবারেই না।

—হুঁ। তিনটের বেশী নয়।

চোখ বুঁজে অসাড়ে শুয়ে শুয়ে ওঁদের দিকে চাইলাম। মনে হ'ল ওঁদের দু'জনেরই মুখ নোড়ার মতো লম্বা হয়ে গেছে।

তিনটে ? তার পরে সব শেষ হয়ে যাবে ? তার পরে আর আমি থাকব না ? শুধু পড়ে থাকবে এই দেহ, যা আমাকে এই অসীম মমতায় এতকাল ধরে ঘিরে রেখেছিল ? যা আমার এতকালের পরিচয় ? আমার আত্মার পরিচয়ে যা এতকাল পরিচিত হয়ে এসেছে ? আমার সেই পরিত্যক্ত ভ্রান্ত পরিচয়কে ঘিরে উঠবে রোদনের কলরব ?

আমি হাসলাম।

কিন্তু তিনটে ? ভোর তিনটের অন্ধকারে চোরের মতো চ'লে যাওয়া ? সে কি রকম হবে ? আলো জাগবে না, পাখী ডাকবে না, দক্ষিণের জানালার গা ঘেঁষে ফুলে-ভরা শিউলিগাছ পাতার আঙুল দুলিয়ে আমায় শেষ বিদায় দেবে না ! আমার মনটা দমে গেল।

চারিদিক ঘিরে অসংখ্য লোক। কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ ভালোবেসেছিল, কেউ বাসতে পারেনি। এদেরই জীবনের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। এদের সবারই চোখে আজ জল !

কিন্তু এদের মুখ অমন লম্বা হয়ে গেল কেন ?

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

ঘরে বিশ্রী ধোঁয়া। সব আবছা দেখাচ্ছে ছায়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে-মনে আবৃত্তি করলাম: "ওগো মরণ, হে মোর মরণ।" ভুল তো হ'ল না। সবই তো মনে আছে।

তিনটেয় আসবে মৃত্যু, কে জানে কেমন ক'রে! জেগে থেকে দেখতে হবে, কেমন তার রূপ। সে কি আসে রাজার মতো বিজয়গর্বে? না বধূর মতো কুণ্ঠিত চরণে? জেগে থেকে দেখতে হবে। চোখ জড়িয়ে এলে চলবে না।

গৃহিণীকে টানাটানি করছে ক'টি প্রৌঢ়া, সব শেষ হবার আগে শেষবারের মতো দুটি মাছ-ভাত খেয়ে নেবার জন্যে। ওর সিঁথির সিঁদুর যেন জমাট রক্তের মতো বিবর্ণ দেখাচ্ছে। আমার পা ছেড়ে ও নড়বে না কিছুতে। কিন্তু ওরাও ছাড়বে না। অবশিষ্ট জীবন-কালের জন্যে যার খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে চলেছে, শেষবারের জন্যে তাকে দু'টি খাইয়ে দেওয়া নিতান্তই চাই।

কিছু কি বলবার আছে ওকে? কিছু না। এতগুলি বসন্ত এসেছে, গেছে; তার মধ্যে বলা যদি শেষ হয়ে না গিয়ে থাকে, এই শেষ মুহূর্তে আর কি বলতে পারি আমি?

মাকে নিয়ে কারা যেন কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বোধ করি যত দেবতার দোরে দোরে। তা ছাড়া আর কোথায় হবে? কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে আসছেন আর এঘরে ফিরে এসে মেঝেয় লুটোচ্ছেন।

কিন্তু ঘরে এত ধোঁয়া কেন? ভালো ক'রে সবারই মুখ দেখা যাচ্ছে না যে!

দেওয়ালে কে যেন হিজিবিজি কি লিখে দিয়ে গেল! দেওয়ালের গা ঘেঁষে কারা যেন ছায়াছবির মতো একটির পর একটি এসে দাঁড়ায়।

গান্ধীজী? কিন্তু অত লম্বা নাক কেন?

চার্লি চ্যাপলিন? চুলগুলো অমন খাড়া কেন?

ও কার চোখ আলেয়ার মতো ঘন ঘন একবার নিভছে, একবার জ্বলছে? অমন ক'রে ও কেবল ডাকছে কেন?

তিনটে বাজতে আর কত দেরী?

পরলোক, সে কোথায়? আমি কোথায় চলেছি? বৈতরণীর উপর দিয়ে? হাত-পা অবশ হয়ে আসে কেন? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যে!

পরলোক আর কত দূর? তার চিহ্নমাত্রও তো দেখা যায় না,—না দূরের বনলেখা, না ভেসে-আসা অস্পষ্ট কলরব।

—আর ভয় নেই কাকা, এ যাত্রা বেঁচে গেল।

কে কথা বলছে? নিবারণ ডাক্তার? কে বেঁচে গেল? আমি? ফিরে এসেছে নাড়ী?

কে যেন কেঁদে উঠল না?

বাবা?

কি হ'ল তাঁর? উঠতে পারছেন না যে! সারারাত ঠাঁয় উবু হয়ে ব'সে থেকে কোমর বেঁকে গেছে! ও কি হ'ল? মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলেন যে!

মৃত্যুকে দেখতে চেয়েছিলাম।

অবশেষে তাকে দেখতে পেলাম। পেলাম, দেওয়ালের গায়ে হিজিবিজি লেখায় নয়, বিচিত্র দর্শন মূর্তির মধ্যে নয়, আলেয়ার মতো জ্বালাময় চোখের দৃষ্টিতেও নয়।

তাকে দেখলাম, আমার বৃদ্ধ পিতার ভূলুণ্ঠিত দেহে, আমার মায়ের উদাসীন রূপে, আমার স্ত্রীর ধূমাংকিত চোখের কোটরে। তাকে দেখলাম, একান্ত প্রিয়জনের উদ্বিগ্ন চোখের কাতরতায়। কি নিষ্ঠুর সে রূপ!

বাসবদত্তার স্বপ্ন

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জন্ম—তেরশ' পঁচিশ সালে কলিকাতায়। পৈতৃকবাস—কলিকাতা। ছাত্রজীবন—কলিকাতা। বর্তমানে ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। লেখক এই গল্পটি শ্রীযুত প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন।

বেলা পড়িয়া আসিলেই ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতে থাকে। ওধারে, অনেক দূরে বিশ্বনাথের মন্দির। চূড়াটা চোখে পড়ে। বেণী-মাধবের ধ্বজা দুইটার মাথা আরও স্পষ্ট দেখা যায় ওদিকে, মনে হয়, নীল আর নির্মেঘ আকাশটার সহিত কবে যেন জড়াইয়া গিয়াছে হঠাৎ!

রোজ এই সময়েই, জানালাটার ধারে আসিয়া শ্রীলতা বসিয়া পড়ে। শ্রম-শিথিল ক্লান্ত দেহটাকে ছাড়িয়া দিতে ভারি ভালো লাগে তাহার। জানালায় বসিয়া বসিয়া দশাশ্বমেধের জনতার দিকে চাহিয়া থাকিবার ভিতরে নাকি চমৎকার একটা শান্তি আছে—অলস মন্থর মুহূর্তগুলি বেশ কাটিতে থাকে।

কয়েকদিন আগেও সে নীপুকে লইয়া সন্ধ্যার আগে ঘাটে যাইয়া বেড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজকাল যেন আর কিছুই ভালো লাগে না; কয়েকদিন হইল বাবার বুকের ব্যথাটাও বাড়িয়াছে—একলা মা সমস্ত সংসার ঠেলিয়া কতোদিকই বা সামলাইবেন—শ্রীলতাকেও কাজ করিতে হয়। কিন্তু বেলা বাড়িয়া আসিলেই সে এই ছোট জানালাটির ধারে আসিয়া বসে, কিছুই ভালো লাগে না তখন আর—মনটা হু হু করিতে থাকে যেন!

বাতাসে ক্যালেণ্ডারটা উড়িতেছিল, সত্যই আজকাল যে কী হইয়াছে তাহার, তাহা নিজেই সে বুঝে না—কেমন যেন একটা গভীর বিষন্ন

ছায়া নামিয়াছে তাহার মনে—ফাল্গুন তো কবেই শেষ হইয়া গিয়াছে, চৈত্র আসিয়া পুরানো হইতে চলিল আর কি—মাসটা বদলানো হইল না আজো; শ্রীলতা বেশ বুঝিতে পারে, কেমন যেন একটা ক্লান্তি তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নামিতেছে—চুপ করিয়া সারা দিনরাত তাহার এই জানালার ধারেই বসিয়া থাকিতে ভালো লাগে—চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আপনার এই গভীর নিঃসংগতায় ভাবিতে ইচ্ছা করে শুধু!

অথচ ভাবিয়াই কি কূল মিলিবে তাহার? আজিকার ডাকও হতাশ করিয়াছে তাহাকে, সকাল বেলা এই জানালা হইতেই গলির মোড়ে পিয়নটাকে দেখিতে পাইয়াছিল সে, তার পর সোজা নীপুকে পাঠাইয়াছিল তাহার কাছে, বুকটা কাঁপিয়াছিল একটু, লজ্জার একটু সামান্য ছায়াও পড়িয়াছিল চোখে, কিন্তু কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই পিয়ন নির্মম হাত নাড়িয়াছে—না, না, আজো কোনো চিঠি নাই শ্রীলতা দেবীর নামে। নীপু ফিরিয়া আসিয়াছিল, পিয়নটার মতই তাহার কচি দুইখানি হাত নাড়িয়া বলিয়াছিল, "না দিদি, আজো তোমার চিঠি দিলে না রামলগন— ।"

শ্রীলতার হাসি পাইয়াছিল একটু—রামলগনের হাতেই যদি পত্র সৃষ্টির উপায়টা থাকিত! বোকা ছেলে! কি বলিয়া যে বুঝাইবে তাহাকে!

ঘড়িটার দিকে চাহিয়া তাহার চমক ভাঙিল—সাড়ে দশটা বাজিয়া বন্ধ হইয়া আছে; কাল, আজ দুইদিনই দম দেওয়া হয় নাই!

কেমন যেন একটা অবসরক্লান্তি, উদাস ঔদাসীন্য তাহাকে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এতোদিন ইচ্ছা করিয়াই সে এই দীর্ঘ দিবসের নিরবচ্ছিন্ন অবসরগুলিকে কর্মমুখর করিয়া তুলিয়াছিল, সময়কে প্রাণপণে ফাঁকি দিতে চাহিয়াছিল সে—কিন্তু পাথরের মতো সময় তাহার

বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, দিন আর কাটিতে চাহে না যেন !

কাজ তো সকল মানুষেরই থাকে--বিশ্ব-সংসারের কঠিন প্রয়োজনকে এড়াইয়া কে কবে সময় কাটাইতে পারিয়াছে বলো। কিন্তু এইভাবে নিখিল যে কি করিয়া রহিয়াছে, সেইটাই আশ্চর্য লাগে শ্রীলতার। সেই কথাই শ্রীলতা আজকাল ভাবে।

অথচ যাইবার সময় নিখিল কি ভাবেই না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, মোটেই সে দেরী করিবে না, কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই ফিরিয়া যাইবে কাশীতে—শ্রীলতার সেই নিবিড় নির্জনতায়। শুধু এই কয়টা মাস ! সুবিধা থাকিলে কি আর নিখিল তাহাকে সংগে লইত না ! সেই আসামের গভীর জংগল, সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা, কে জানে কোথা হইতে কোন নূতন বিপদ পাখা মেলিয়া বসিবে হঠাৎ। কাজ নাই, বরং এই কয়টা মাস শ্রীলতা কাশীতে তাহার পিতার কাছেই কাটাইয়া দিক—ফাল্গুনের প্রথমে গিয়াই নিখিল তাহাকে লইয়া আসিবে। আর চিঠি ? —চিঠি—সে সপ্তাহে একখানা করিয়া দিবেই, সে বিষয়ে শ্রীলতা যেন মোটেই ভাবনাচিন্তা না করে।

ভাবনাচিন্তা সে মোটেই এতদিন করে নাই, ঠিকমতোই নিখিল আসাম হইতে চিঠি লিখিয়া আসিয়াছে ; তাহার পরে হঠাৎ একদিন মাঘের মাঝামাঝি লিখিল : খুব বেশী কাজ পড়িয়াছে এখন—চৈত্রের প্রথমে গিয়া সে নিশ্চয়ই লইয়া আসিবে শ্রীলতাকে। ব্যাস্—তাহার পরেই গম্ভীর নিস্তব্ধতার যবনিকা ! চৈত্র শেষ হইতে চলিল, আর কোনো উত্তর নাই।

অথচ শ্রীলতা ইহার ভিতরে এক একখানি করিয়া অনেকগুলি চিঠিই লিখিয়াছে, প্রতিদিন এই ভাবেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে ডাক পিয়নের

পদধ্বনি শুনিয়াছে সে, প্রতিদিনই ভাবিয়াছে : আজ চিঠি পাইবেই—কিন্তু প্রতিদিনই সে ঠকিয়াছে প্রতিদিনের ব্যর্থতায় শ্রীলতা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে ধীরে ধীরে।

কয়টা মাসই বা নিখিলকে সে কাছে পাইয়াছিল! বিবাহের মাস তিনেক পরেই তো তাহাকে যাইতে হইল আসাম—সেই গভীর জংগলে, যেখানে বাঘেরা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়ায়, জোনাকীরা জ্বলে ;—যেখানে শ্রীলতা যাইতে পারিবে না কোন দিন।

মাঘের চিঠিতে নিখিল লিখিয়াছিল : কলিকাতায় আসা তাহার একরকম ঠিক হইয়াই আছে, এখন খালি এখানকার কাজটা শেষ হইলেই হয়। তখন আর এই ঘন জংগলের বাঘ আর হাতীর মিছিলের ভিতরে সশংক চিত্তে দিন কাটাইতে হইবে না—ঘন গাছগুলির ফাঁক দিয়া পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কোনো রাত্রিতে শ্রীলতারাণীর মুখখানি আর মনে করিতে হইবে না তাহার। চিঠিটা পড়িতে পড়িতে শ্রীলতা হাসিয়া ফেলিয়াছিল ; দিনের ভিতরে দশবার 'রাণু' বলিয়া না ডাকিতে পারিলে নিখিলের যেন সময় কাটিত না—নামের কথায় শ্রীলতার ভারি একটা লজ্জার ব্যাপার মনে পড়িয়া গেল। নিখিল শ্রীলতার আরো একটি নাম দিয়াছিল বেশ—নামটা মনে হইলেই তাহার হাসি আসিল খুব, নাম দিয়াছিল বাসবদত্তা।

শুনিয়া শ্রীলতা বলিয়াছিল—"ধ্যেৎ"। "বাঃ, নামটা বুঝি ভালো লাগ্‌লো না তোমার", নিখিল বলিয়াছিল, "রাজা উদয়ন আর উজ্জয়িনীর রাজকুমারী বাসবদত্তার গল্পটা জানো না?" বলিয়া নিখিল সমস্ত গল্পটাই বলিয়াছিল। ভারি চমৎকার গল্পটা—শুনিয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীলতার ভালোই লাগিয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে নায়িকাদের নামগুলি নাকি ভারি সুন্দর। শ্রীলতা অবশ্য অত-শত বুঝে নাই ;

নিখিল তত্ক্ষণে তাহার মুখখানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে: রাগ করবে তুমি বাসবদত্তা বল্‌লে ?

"জানি না—যাও" সম্মুখে ছোট ভাইটি দাঁড়াইয়া, হাত সরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি শ্রীলতা সেখান হইতে পলাইয়াছিল, "আচ্ছা মানুষ তুমি !—" শ্রীলতার এত লজ্জা করিতেছিল তখন।

বছর চারেক আগেকার কথা শ্রীলতার মনে পড়ে। তখন তাহারা কলিকাতায় থাকিত। বাবা সবে রিটায়ার করিয়াছেন, বড় মেয়েটির বিবাহ দিতেই তিনি একরূপ সর্বস্বান্ত হইয়াছেন —তাহার উপর শ্রীলতাও মাথায় মাথায় হইয়া উঠিয়াছে, বিবাহ না দিয়া তাহাকেই বা কতোদিন রাখা যায়। ছোট একটা ফ্ল্যাটে তাঁহারা থাকিতেন। হঠাৎ তাঁহাদের পাশেই এক তরুণ-দম্পতি আসিয়া উঠিল। মেয়েটির নাম মালতী।

পাশের ঘরের প্রায় সব খবরই এ ঘরে ভাসিয়া আসে। ছেলেটি কোন্ এক মার্চেণ্ট অফিসে চাকুরী করে—রোজ দশটার সময় স্নান করিয়া খাইয়া বাহির হইয়া যায়, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসে কোনোদিন একটী বেলফুলের মালা লইয়া, অথবা ছোট একটী এসেন্‌সের শিশি হাতে করিয়া। মালতী তখন হয়তো রান্নাঘরে বসিয়া ডালে কাঁটা দিতেছে, পিছন হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া সম্মুখের দিকে সে অগ্রসর হইয়া আসে, তাহার পরে এক সময়ে চোখ দুইটী টিপিয়া ধরে অকস্মাৎ। এ ঘরের জানালা হইতে শ্রীলতা দেখিতে পায় সব। মালতী এবারে একেবারে দারুণ চীৎকার করিয়া উঠে—বাড়ীতে যেন তাহার ডাকাত পড়িয়াছে সন্ধ্যাবেলা; স্বামীটি ভারি অপ্রস্তুত হইয়া যায়—স্বামীকে দেখিয়াও মালতীর কম্পন যেন থামিতে চায় না। বলে, "ওরকম ক'রে আস্‌তে হয় ? একটুও যদি বুদ্ধি থাকে তোমার, কি রকম ভয় পেয়েছিলুম বলোতো ?" স্বামী বেচারী কি যে বলিবে ঠিক করিতে পারে না।

শ্রীলতা জানালার আড়ালে বসিয়া হাসিয়াছে—একটুও যদি রসবোধ থাকে মেয়েটার।

আর একদিন ভারি একটা মজার ঘটনা শ্রীলতার চোখে পড়িয়াছিল। সবে ভোর হইয়াছে—শ্রীলতা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ জালাটার কাছে আসিয়া সে থামিয়া গেল। জানালাটা খোলা। মালতীকে ভোরবেলা বেড়াইতে লইয়া যাইবার কথা ছিল সেদিন। ছেলেটি তাহাকে অনেক ডাকাডাকি করিয়াছে—মালতী উঠে নাই—ও একবার সাড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে আবার। এবার ছেলেটি আর ডাকিল না; ধীরে ধীরে মালতীর মুখখানি ধরিয়া নিজের ঠোঁট দুইটিকে আগাইয়া আনিল—মালতী তখনও চোখ বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পরেই···। শ্রীলতা লজ্জায় আর কিছু দেখে নাই, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল।

হঁ্যা, থাকিতে হইলে ওইরকম ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকা উচিত তাহাদের। মাত্র পঞ্চাশটি টাকায় এখন হইতে হিসাব না করিয়া চলিলে কি করিয়াই বা চলিবে? সেই রকম ছোট ফ্ল্যাট, শান্ত একটি নীড়—ব্যস্ আর কিছুই তাহাদের লাগিবে না। সে আর নিখিল, দুইজনে মালতীদের মতো সিনেমায় যাইবে প্রত্যেক রবিবারে দেখিও, অবশ্য খরচ হইবে ইহাতে একটু;—বেশ! প্রত্যেক রবিবারে না হউক মাঝে মাঝে দেখিতেই হইবে; ভালো বই আসিলেই। আর লেক?—লেকের কথা ছাড়িয়াই দাওনা এক রকম,—ইচ্ছা করিলেই তো লেকের ধারে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহারা। শ্রীলতা নিখিলের অলস-মন্থর দিনগুলিকে তাহার প্রচুর সেবায় ভরিয়া তুলিবে—প্রচুর শোভায়, শ্রীলতার আনন্দ নিখিলকে ঘিরিয়া থাকিবে রাতদিন—নিখিল হাসিবে।

আর—কথাটা ভাবিতে কিন্তু শ্রীলতার ভারি লজ্জা করে: আর,

কোনো ভোরবেলা হয়তো সে বেড়াইতে যাইবার জন্য মালতীর স্বামীর মতো নিদ্রিত নিখিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িবে হঠাৎ! না—না সেই বরং দুষ্টামি করিয়া চোখ বুঁজিয়া বিছানার উপরে পড়িয়া থাকিবে, আর নিখিলই ঠিক সেইভাবে তাহার শ্রীলতারাণীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আধবোঁজা চক্ষুদুইটির উপরে···শ্রীলতা নিজের মনেই লজ্জায় হাসিয়া ফেলে। বসিয়া বসিয়া আচ্ছা-সব কথা সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে আজকাল।

পরের দিন। ঘরের ভিতরে শ্রীলতা শাড়ীগুলি এক এক করিয়া গুছাইয়া গুছাইয়া আলনার উপরে রাখিতেছিল। হঠাৎ দরজা খুলিয়া নীপু ছুটিতে ছুটিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল, "দিদি, তোমার চিঠি এসেছে আজ।"

"এ্যাঁ—" শ্রীলতা একেবারে চমকাইয়া উঠিল যেন, "এসেছে?" তাড়াতাড়ি সে খামটা নীপুর হাত হইতে ছিনাইয়া লইল—ঠিক! নিখিলের হাতের লেখাই তো ঠিকানা! শ্রীলতা যেন নিজের চক্ষু দুইটাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না কিছুতে,—সত্যই তাহা হইলে নিখিল উত্তর দিয়াছে তাহাকে! হাতের কাছে একটা আধুলি ছিল, সেইটা নীপুর দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "পরে একটা টাকা দেবো তোকে, লক্ষ্মী ছেলে নীপু,—এখন নীচে যাও তো ভাই!" নীপুর সম্মুখেও আজ চিঠিটা খুলিতে পারিবে না সে। খুলিলেই পত্রের সমস্ত শুচিতাই নষ্ট হইয়া যাইবে যেন!

. চিঠিটা লইয়া শ্রীলতা জানালার ধারে আসিয়া বসিল—বুকটা তাহার এখনও ঢিপ ঢিপ করিতেছে যেন—ক্ষিপ্র হস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিল —নাঃ, কোনো ভয় নাই, ভালো চিঠিই নিখিল লিখিয়াছে তাহাকে।

তাড়াতাড়ি একবার নীচের দিকে শ্রীলতা চোখটা বুলাইয়া লইল— ইতি, নিখিল লিখিয়াছে—ইতি—তোমারই—ব্যাস্, আর কিছু নাই—

তাহার পরেই বড়ো বড়ো করিয়া লেখা : "কে বলো দেখি ?" ভারি হাসি পাইল শ্রীলতার—চিঠিটা ভালো করিয়া মেলিয়া ধরিয়া পড়িতে লাগিল। দুইদিন আগের তারিখ রহিয়াছে চিঠিটায়। প্রথমেই বহু বিশেষণে বিশেষিত সেই 'রাণু' বলিয়া সম্বোধন, তাহার পরেই লিখিয়াছে, দেরী করিয়া চিঠি দিতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই শ্রীলতা রাগ করিয়াছে খুব—কিন্তু সত্যই সে এ পর্যন্ত মোটেই সময় পায় নাই ; শ্রীলতা যেন এ কথা বিশ্বাস করে, আর বৈশাখের প্রথমেই সে কাশী যাইতেছে—অন্যথা হইবে না কোনো রকমে এবার।

এখানে তাহার একটি অতি সুন্দর বন্ধু মিলিয়াছে নাকি, তাঁহার নাম অমিয় বাবু। লেক রোডে বাড়ী আছে। তিনি বলিয়াছেন : কলিকাতায় যখন যাইবে তখন তাঁহার বাড়ীতেই নিখিল আসিয়া উঠে যেন—নিখিল রাজী না হইয়া পারে নাই—বাড়ীটা নাকি প্রায় লেকের কাছেই ! তাহার পরেই : শ্রীলতার সেই দুলের কথা নিখিল ভুলে নাই, কলিকাতা যাইয়াই কিনিয়া দিবে সে সেই দুল। তাহার স্মরণ শক্তিকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত শ্রীলতার। এখানে সে ভালই আছে—তবে সব সময়েই যেন ফাঁকা লাগে,—আজকাল দিনরাত শ্রীলতারাণীর কথাই নাকি মনে পড়িতেছে খুব !

শেষের দিকে কিন্তু নিখিল একটা কথা লিখিয়া দিয়াছে, লাইনটা পড়িয়া শ্রীলতার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠে. ভারি দুষ্টু হইয়া উঠিয়াছে নিখিল আজকাল !

খালি চিঠিতে চিঠিতে কথাটা মনে করাইয়া দেয় সে।—নিখিলের অনেকদিন হইতেই নাকি মেয়ের সাধ, শ্রীলতা কতো কথা শুনাইয়াছে তাহাকে এইজন্য—মেয়ে আবার কেউ চায় নাকি পৃথিবীতে ? বরং একটি সুন্দর ঠিক্ নিখিলের মতো দেখিতে—

শ্রীলতা খামের ভিতরে চিঠিটা সযত্নে ভরিয়া রাখিল। এখনই, আজই সে উত্তর দিবে নিখিলকে। কলম আর প্যাড্ লইয়া আবার জানালার ধারে আসিয়া বসিয়া পড়িল সে!

বেশ হইবে। লেক রোডের বাড়ীটা তাহাদের নিশ্চয়ই দোতালা—দোতালা না হইলে শ্রীলতা কিন্তু যাইবে না। উপরের ঘরে খোলা জানালায় অবারিত দাক্ষিণ্যে দিন কাটাইবে তাহারা। নিখিলকে সে তখন পাইবে একান্ত করিয়া: বড়ো খোলা জানালাটার ধারে দাঁড়াইয়া নিখিল আবৃত্তি করিবে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা, শ্রীলতার কিন্তু সব লাইনগুলি মনে পড়ে না, সেই যে, 'পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি'—এই একটা লাইনই শ্রীলতার মনে আছে—খোলা জানালার হাওয়ায় শ্রীলতার চুল মুখের উপর আসিয়া পড়িবে বারবার,—নিখিল উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া চলিবে—ভারি চমৎকার আবৃত্তি করিতে পারে নিখিল।

দেয়ালে কিন্তু কয়েকটা জাপানী ছবি তাহাকে টাঙাইতে হইবে—যে যাহাই বলুক, সম্মুখে দিগন্তব্যাপি সমুদ্রের সুনীল উচ্ছ্বাস, আর তাহারই একধারে শান্ত সমাহিত ধূসর ফুজিয়ামা—কবে তাহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার চিহ্ন হিম-রেখার অন্তরালে আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—তপস্যামগ্ন মহেশ্বরের সহিত কতোদিন শ্রীলতা তুলনা দিয়াছে তাহার।

হ্যাঁ, ইহারই ভিতরে ছোট একটি ড্রয়িং-রুম শ্রীলতা করিবেই, স্থান না হইলে বারান্দায় খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া কাজ চালাইবে সে।

চাকর?—হ্যাঁ ভারি দায় পড়িয়াছে শ্রীলতার দাসী-চাকর রাখিবার, সে কি নিজে কাজ করিতে পারে না একটুও? নিজের সংসারের প্রত্যেকটি কাজ আপনার হাতের স্পর্শে জাগাইয়া রাখিবার সুখ কি কম? —না—না নিখিলকে সে ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিবে।—বরং সেই

পয়সায় নিখিলের খাওয়া-দাওয়ার একটু ভালো ব্যবস্থা করিয়া দিবে সে। অফিসে তাহার যে পরিশ্রম করিতে হয় সারাদিন।

নিখিল হয়তো অনুযোগ করিবে, বলিবে—"তুমি এইভাবে খাটবে, আর আমি বেশ আরাম ক'রে"—শ্রীলতা তাড়াতাড়ি নিখিলের মুখটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিবে, বলিবে, "থাক্—ঢের হ'য়েছে মশাই—আর লেকচার দিয়ে কাজ নেই, এখন যা বল্‌ছি শোনোতো লক্ষ্মী ছেলেটির মতোন—"

শ্রীলতা কলমটা উঠাইয়া সাদা কাগজের উপর ধরিয়া ধরিয়া লিখিল, 'শ্রীচরণেষু'—ব্যাস্ তাহার পরেই বাধিল মুস্কিল, কি বলিয়া যে চিঠিটা আরম্ভ করিবে, তাহা আর সে ভাবিয়া পায় না। এইভাবে 'শ্রীচরণেষু' লিখিয়া কতোদিন যে সে চুপচাপ বসিয়া থাকিয়াছে এর আগে!

কিন্তু কে যেন কাঁদিতেছে পাশের বাড়ীতে! শ্রীলতা কলমটা রাখিয়া কান পাতিয়া শুনিল খানিক্ষণ, তাহার পরেই আবার কলমটা উঠাইয়া লইল—কাঁদিবার আর সময় পাইল না উহারা; কোথায় তাহার এখন একখানা চিঠি আসিয়াছে, সকলে মিলিয়া আনন্দ করিবে, তা নয়—কে যেন কাঁদিতে বাসিয়াছে পাশের বাড়ীতে। বাস্তবিক এইজন্যই শ্রীলতা লোকালয় ছাড়িয়া নির্জনে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে! কিন্তু নাঃ, চিঠিটা লেখা আর হইবেনা তাহার, কান্নাটা যেন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে! শ্রীলতা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্যাড্ আর কলম টেবিলের উপর রাখিয়া সোজা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল নীচে—প্রতিবেশী হিসাবে প্রতিবেশীর সুখদুঃখের খবর লওয়া উচিত বই কি তাহার!

কিন্তু বারান্দার উপর নামিয়া সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে—একি! শ্রীলতার মাথাটা ঝিন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল একবার, একি! মাটির

উপরে লুটাইয়া লুটাইয়া তাহার মা-ই যে কাঁদিতেছেন! শ্রীলতাকে দেখিয়া মা একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কাছেই ছোট ভাইটি চীৎকার করিতেছে প্রাণপণে—"কি হোল মা?" শ্রীলতার গলাটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। বুকের ভিতরে তাহার দশটা হাতুড়ি কে যেন পিটিতেছে একসংগে—অদূরে পিতা দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছেন—হাতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে একখানা টেলিগ্রাম! "কি হোল মা আমাদের?" শ্রীলতা যেন বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল—ঠক্ ঠক্ করিয়া সারা দেহটাই কাঁপিতেছে তাহার! বুকের ভিতরে শ্রীলতাকে চাপিয়া ধরিয়া মা আবার জোরে কাঁদিয়া উঠিলেন—সে কান্নায় পাশের বাড়ীর দরজা খুলিয়া গেল। নিখিল নাকি নাই—আসাম হইতে কে এক অমিয়বাবু তার করিয়াছেন আজ!

সাদা দীর্ঘ দেয়ালটাকে আঁকড়াইয়া কোনও রকমে শ্রীলতা উঠিয়া দাঁড়াইল—চৈত্রের খর রৌদ্র আসিয়া সমস্ত উঠানটুকুর উপর ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। শ্রীলতা সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল—একবার মনে হইল অতল অন্ধকারের গর্ভে সে যেন ক্রমশঃই নামিয়া যাইতেছে—দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকারের সমুদ্র তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে বারবার। তাহার পরেই মনে হইল, কিছুই হয় নাই তাহার—কিছুই নয়; ভারি বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখিতেছে সে এখন। এখনি তাহার ঘুমটা ভাঙিয়া যাইবে হয়তো।—তারপরে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া ভাবিবে এমন বিশ্রী স্বপ্নও মানুষে দেখে! স্পন্দমান বক্ষের ভিতরে হাতদুইটি ডুবাইয়া দিয়া হয়তো বা বলিবে: ভাগ্যিস্ ঘুমটা তাহার ভাঙিয়া গিয়াছিল তাড়াতাড়ি।

সতীকুমার নাগ : জন্ম—তেরশ' বিশ সালে ময়মনসিংহ সহরে। পৈতৃক বাসস্থান—বিক্রমপুর, রাজানগর গ্রামে। ছাত্রজীবন—বহরমপুর ও ময়মনসিংহ। এঁর প্রথম রচিত বই ছেলেদের নাটক 'চলার পথে'। অনুজ সনৎকুমার নাগের সহযোগিতায় ছেলেদের গল্প-বই 'কবি বিষ্টুদা' লিখেছেন। বর্তমানে 'চয়নিকা' মাসিকপত্রের যুগ্ম সম্পাদক।

প্রতিচ্ছবি

সতীকুমার নাগ

নীলিমার শেষটায় সত্যি-সত্যি চোখ দু'টো জলে ভ'রে ওঠে। একা একা শুধু নীলিমা এই জনমানবহীন দেশে। এখানে এই তার প্রথম আসা। আশেপাশে কারো বাড়ী নেই। যা দু'এক ঘর আছে তাও ভিন্ন জাত।

কিসের একটা শব্দে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে নীলিমার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, পিছনের জানালার ভিতর দিয়ে বিড়ালটা মেঝেতে লাফিয়ে প'ড়েছে।

ধীরে-ধীরে সাঁজের আঁধার ঘনিয়ে আসে বনানীর ওপারে।

নীলিমা আলোটা ধরিয়ে নেয়। তার ঘর-ভরা জিনিষ। ঘরের এক পাশে র'য়েছে ড্রেসিং টেবিল, তার একধারে নানা রকম প্রসাধনের জিনিষ আর এক পাশে চিঠির প্যাড্, দোয়াতদানি, এমনি অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ —টেবিলের দু'পাশে দু'টো কাচের আলমারী। একটিতে সাজানো আছে কাপড়, জামা ইত্যাদি—অপরটিতে র'য়েছে যত রাজ্যের মাটীর ফল, চিনা মাটীর ছোট বড় পুতুল এই সব। সেদিন একটা ফ্রেমে বাঁধানো জাপানী ছবি কিনে এনেছে দীপেন্দু। কি সুন্দর একটি ফুটফুটে

ছোট্ট ছেলে মার গলা ধ'রে আছে। ছবিটিতে ফুটে উঠেছে জননীর স্নেহ সন্তানের প্রতি। কি ক'রে জানি ছবিটা একটু হেলে গিয়েছে, সোজা ক'রে রাখে।

আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলি চিরুণী দিয়ে বুলিয়ে নেয়। দু'টো হাত দিয়ে ঠিক ক'রে নেয় এলো-খোঁপাটা। কি আর করে? হাতে কোনো কাজ নেই। শেষটায় গ্যাটাপারচারের বড় পুতুলটাকে আলমারীর মাথার উপর থেকে নামিয়ে আনে।

ওকে একবার কাপড় পরায় আবার খুলে নূতন ক'রে সাজায়। নীলিমা পুতুলের আদর ক'রে নাম রেখেছে 'মণি'। নিজের মনেই বলে, "খোকা খুব দুষ্টু হ'য়েছিস, না?" কোলের ওপর টেনে নেয় তাকে। গালে একটা চুমো দেয়। খিল খিল ক'রে হেসে উঠে নীলিমা নিজেই।

"বা রে, আমার দিকে দুষ্টুমি ক'রে তাকিয়ে আবার?" বালিশের উপর পুতুলটা শুইয়ে রাখে। মনে মনে নীলিমা কত সব কল্পনার জাল বোনে। তার পর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘণ্টাখানেক পরই ফিরে আসে দীপেন্দু কাজ হ'তে। সাইকেলটা ঠেকিয়ে রাখে দেওয়ালের গায়ে। তাইতো—দরজা খোলা! দায়িত্ব ব'লে নীলিমার কিছু কি নেই! দেখেছো—দরজা না বন্ধ ক'রেই ঘুমিয়ে প'ড়েছে! আলো এখনও জ্ব'ল্ছে মাথার কাছে। কি যে মেয়ে ও!

নীলিমার মাথার বালিশটা স'রে গেছে একটু। গায়ের চাদরটা ঝুলে প'ড়েছে মাটীতে। দীপেন্দু ঠিক ক'রে দেয়। নীলিমার ব্যাপার দেখে অবাক হ'য়ে যায়। নীলিমার পাতলা ঠোঁটদু'টি যেন একটু ন'ড়্ছে। আবার তখনই মুখে ফুটে ওঠে হাসি। চিবুকদু'টি টোল খায়। পরণে নীল সাড়িখানা নীলিমার শুভ্র দেহের সাথে মিলিয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য স্বষ্টি ক'রেছে। সাজান পুতুলটি বুকের ওপর টেনে

নিয়েছে। দীপেন্দু যেন নূতন ক'রে নীলিমাকে দেখলো। দীপেন্দুর হাসি পায় নীলিমার ভাব-ভংগিমায়। এই পুতুলকে নিয়ে নীলিমা কি যে ক'র্‌বে ঠিক পায় না কিছু।

একটু পরেই জেগে ওঠে নীলিমা। দীপেন্দু বলে, "উঠলে যে?" ঘাড় ফিরিয়ে নীলিমা দেখে দীপেন্দু। চোখের পর চোখ পড়ে। নীলিমা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে ঢেকে ফেলে পুতুলটাকে।

দীপেন্দু হেসে বসে নীলিমার পাশে। বলে, "কি লুকোলে নীলি? ও আমি দেখেছি।" নীলিমা যতই চেষ্টা করে গোপন ক'র্‌তে ততই ধরা প'ড়ে বিব্রত হয় বেশী। দীপেন্দু বিছানার ভিতর হ'তে বের ক'রে বসায় পুতুলটাকে। বেচারী পুতুল কিন্তু তখনই উল্টে পড়ে।

"দেখ, দেখ নীলিমা, তোমার ছেলে ব'স্‌তে জানে না। ভারী দুষ্টু ত'!"

কি উত্তর দেবে? চুপ ক'রেই থাকে নীলিমা।

"বা রে—কথার উত্তর দিলে না যে?"

একটু দূরে স'রে যায় নীলিমা। মৃদু স্বরে উত্তর দেয়, "যাও।" দীপেন্দুর সুরু হয় গল্প—পুতুলকে মাঝখানে রেখে।

নীলিমা হেসে লুটোপুটি খায়। "হ'য়েছে গো, আর রাত জেগে গল্প ব'ল্‌তে হবে না।" হাত বাড়িয়ে আলোটা কমিয়ে দেয় নীলিমা। হঠাৎ দীপেন্দু ব'লে ওঠে, "সত্যিই নীলিমা, তুমি কত সুন্দর!"

একটু অভিমান ক'রেই নীলিমা উত্তর দেয়, "তা জানি ও-সব।" অভিমানে নীলিমা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

"রাগ ক'রলে তুমি?"

রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় নীলিমা, "এত দেরী ক'রে ফিরে এলে কেন?"

—"কি করি বলো? নতুন সাহেব এসেছে। জানতো ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজ? বেশ, এবার হ'তে সব ফেলে দিয়ে তোমার কাছে এসে ব'সে থাকব। কি বল?"

"আমি বুঝি তাই ব'লেছি······" অভিমানের পশরা নেমে আসে তার চোখে মুখে।

অনেকটা সময় তাদের নীরবে কেটে যায়।

"একি নীলিমা কাঁদ্‌ছো? ছিঃ, একটুতেই তোমার কান্না এল?"

ধীরে ধীরে নীলিমা জবাব দেয়, "ভয় করে যে আমার একা—"

"ওঃ—তাই।" হেসে উঠে দীপেন্দু।

তখনই নীলিমার মুখে হাসি ফুটে উঠে, "যাও তুমি ভারি ইয়ে।"

কিছুদিন পরের কথা।

আজকাল নীলিমা খুব ভোরে ওঠে। ঘরের কাজ সব গুছিয়ে রাখে। দীপেন্দু বাইরে থেকে একটু বেরিয়ে আসে।

নীলিমা তখন পা' দু'টো ছড়িয়ে মুখ নীচু ক'রে সেলাই ক'রে চ'লেছে। কাপড়ের আঁচলটা পিঠে থেকে মাটিতে প'ড়েছে লুটিয়ে। দীপেন্দু কিন্তু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছুঁচে সুতো পরাতে গিয়ে ফুটে যায় আঙুলে, 'উঃ' ক'রে একটা অস্ফুট শব্দ করে নীলিমা। দীপেন্দু হেসে ফেলে। নীলিমা অপ্রস্তুত হ'য়ে যায়।

—"লুকিয়ে কি দেখছিলে?"

—"দেখছিলুম শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য।" কোনো কথার উত্তর না দিয়ে নীলিমা মুখ ফিরিয়ে আপন মনে হাসে। দীপেন্দু আপন মনে ব'কে চলে, "বেশ সুন্দর হ'য়েছে তো এ ফুলটি—এর পাশে এটা কি?"

কোন কথার জবাব না দিয়ে নীলিমা ধীরে ধীরে কাঁথাটা গুটিয়ে রাখে বাক্সে।

"বল্লে না ত'?" নৈরাশ্যের স্বরে প্রশ্ন করে দীপেন্দু।

নীচের ঠোঁটটি ওলটিয়ে নীলিমা উত্তর দেয়, "জানি না," বলে উঠে দাঁড়ায়। দীপেন্দু হাত ধরে নীলিমাকে বসায়, নিজেও তার পাশে ব'সে পড়ে।—"বা রে, বেলা হ'য়ে গেল। আঃ, ছাড় না!" নীলিমা একছুটে পালিয়ে যায়।

সুদূর অনাগত ভবিষ্যতের কত কথাই না মনে আসে নীলিমার আজ। নীলিমার ভিতরে এসেছে একটা নূতন অনুভূতি। কিসের এক অজানা পুলকে তার ছোট বুকখানি দুলে ওঠে। নীলিমা যেন চ'লেছে নূতন ক'রে নীড় বাঁধতে কোন্ এক অনাস্বাদিত জীবনের রাজ্যে। সে আস্‌বে হয় তো রূপকথার সোনার রথে চ'ড়ে ঐ নীলাকাশ হ'তে নেমে। চোখের সুমুখে ফুটে ওঠে তার ভাসা-ভাসা দু'টি চোখ। মুখখানি কিসের এক মনভুলানো মায়ার পরশে আঁকা। চুলগুলি কোঁক্‌ড়ান, ফুরফুরে। নীলিমা মনে মনে এক কল্পনার সৌধ নির্মাণ করে। তার এই রঙিন্ স্বপ্নের মাঝে পুতুলের কথা ভুলে যায়।

এর পর পথ চেয়ে ক'মাস কেটে গেছে।

নীলিমার একটি খোকা হ'য়েছে। ওকে নিয়েই দিনগুলি বেশ কাটে। খোকাকে দীপেন্দুর কাছে নিয়ে এসে বলে, "একটু ধর না।" হাত বাড়িয়ে কোলে নেয় দীপেন্দু। মায়ের কোল ছাড়া পেয়ে ছেলে কেঁদে ওঠে।

দীপেন্দু বলে, "ওগো খোকার মা দেখ, তোমার ছেলে কাঁদছে।"

তেমনি ক'রেই উত্তর দেয় নীলিমা, "ছেলে একা তো আমার নয়।

বড় হ'য়ে তোমারই নাম ব'ল্‌বে। হ্যাঁ—" খোকাকে মাঝখানে প্রতিনিধি রেখে তাদের দু'জনের কথা কাটাকাটি হয়। দীপেন্দু পরাজিত হয়। নীলিমা বলে, "দেখ্‌লে তো?"

এমনি ক'রেই তাদের সুখের তরী চ'ল্‌তে থাকে।

একদিন ভোরে দেখা গেল নীলিমা চুপ ক'রে খোকার মাথার কাছে ব'সে আছে। কোথা হ'তে কি যে হ'ল কিছুই বোঝা গেল না। কেঁদে কেঁদে নীলিমার চোখদু'টি ফুলে উঠেছে। সহসা কি একটা রোগই না এলো খোকার! ওই তো একটুখানি কচি শিশু—ভাষা ফুটে উঠেনি এখনো তার। মার দুঃখ সে বুঝ্‌বে কিসে? খোকা মার কোল খালি ক'রে বিদায় নিল। দীপেন্দু বোঝাল নীলিমাকে, "চোখের জল ফেলে কি ক'র্‌বে? যারা থাকবার নয় তারা ত এমনি ক'রেই চ'লে যায়।"

দীপেন্দু পুরুষ তাই আঘাতকে সহজে গোপন ক'রে চলতে পারে। নীলিমা কাঁদে আর কাঁদে। আজ ঐ ছোট একটি শিশু নীলিমার মাঝখানে মাতৃত্বের পদ শুধু সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেল কিন্তু তার আসন করে গেল খালি। সন্তানের বিয়োগবেদনায় নীলিমা মুসড়ে পড়ে।

মানুষকে তার শোকদুঃখ ভুলে চ'ল্‌তে হয়। এমনি ক'রে চ'লে এসেছে জগৎ। দীপেন্দু ভাবলো নীলিমাও বুঝি ভুলে গেছে পুরনো দিনের হারানো ব্যথার স্মৃতি।

এক দিনের একটি ছোট্ট ঘটনা।

সে দিন আফিস থেকে ফির্‌তে দীপেন্দুর দেরী হ'য়ে গেছে। নীলিমা ঘুমিয়ে প'ড়েছে। দীপেন্দু নীলিমাকে জাগাতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। তার পাশে একটি ছোট বিছানা পাতা। আগাগোড়া সেই ফুলতোলা

প্রতিচ্ছবি

আলোয়ানটা দিয়ে কা'কে যেন সযত্নে ঢেকে রেখেছে। নিজের ডান হাতটা তার গায়ে দিয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে এনেছে নীলিমা।

দীপেন্দু অপলক দৃষ্টিতে নীলিমার দিকে চেয়ে থাকে। নীলিমার অন্তরের কিসের এক অজানা ব্যথা যেন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে তার সারা মুখখানিতে স্পষ্ট হ'য়ে। দীপেন্দু তাকে জাগাতে গিয়ে থেমে যায়।

তাইত—নীলিমা হয়ত এতক্ষণ কেঁদেছে! বালিশ ভিজে গেছে চোখের জলে, চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল তখনো টল্‌মল্‌ করছে। দীপেন্দু কিছুই বুঝতে পারে না।

ধীরে ধীরে দীপেন্দু নীলিমার গায়ের চাদরখানা তুলে। বিস্ময়ে নির্বাক—পাষাণের মত নিশ্চল সে।

সারা অন্তর মথিত ক'রে দীপেন্দুর একটা করুণ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

এ-যে সেই গ্যাটাপারচারের পুতুলটা—যেটা এতদিন ছিল ধূলির মাঝখানে পড়ে।

কে জানে সন্তানহারা মা এই নির্জীব বাক্‌হীন পুতুলটাকে বুকে ক'রে একটু সান্ত্বনা পায় কিনা।

শোক

সন্তোষকুমার ঘোষ

সন্তোষকুমার ঘোষ: জন্ম—উনিশ' শ বিশ সালে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ী গ্রামে। পৈতৃক বাস বরিশাল জেলায়। ছাত্রজীবন—ফরিদপুর ও কলিকাতায়। "ভগ্নাংশ" গল্প গ্রন্থের যুগ্ম লেখক।

পা টিপে টিপে আমরা বাড়ীটাতে প্রবেশ করলাম। মৃত্যুর চিহ্ন বাড়ীটার সর্বত্র এত স্পষ্ট যে বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। বাইরের ঘরে একজনকে দেখলাম। তার ওপর বোধহয় অতিথি অভ্যর্থনার ভার।

'মিঃ লাহিড়ী কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'সাহেব, ওপরে তাঁর ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।'

পরিচিত বাড়ী। তবু কেমন একটা কুণ্ঠা হচ্ছিল। আমরা ক'জন এই বিমর্ষ বাড়ীতে অনুচিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করছি, এই রকম আশংকা হচ্ছিল।

'আসুন', আমাদের শব্দ পেয়ে গৃহস্বামী মিঃ লাহিড়ী বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। আমরা প্রতিনমস্কার করলাম।

মিঃ লাহিড়ী দু' দিনেই কেমন বিশীর্ণ হয়ে পড়েছেন মনে হ'ল। মুখের সে দীপ্তিটাও নিষ্প্রভ, এমন কি নিরুদ্দিষ্ট। ঘরে কয়েকটা আরামপ্রদ কেদারা ছিল। ক'জন মিলে বসলাম।

তারপর আমাদের পরস্পরকে দৃষ্টি-বিনিময় করতে হল। কি বলে আরম্ভ করা যায়? আমাদের কর্তব্য সান্ত্বনা দেওয়া। কিন্তু স্বরে, ভংগীতে যাতে অকৃত্রিম বেদনা সঞ্চারিত করা হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। আবার উচ্ছাস এ সমাজে জলচল কিনা সে সন্দেহও আছে।

'মিঃ লাহিড়ী, আমরা সব শুনেছি।' আরম্ভের পক্ষে এইটেই বোধহয় সর্ব-সম্মত পন্থা। তারপর বেদনা-নিষিক্ত কণ্ঠে,—'কি আর করবেন বলুন,—আমাদের কি হাত আছে!'

কিংবা মিঃ লাহিড়ীর শোকরুগ্ন কান্তি নিয়েও সুরু করা যায়—'আপনাকে দু'দিনেই কী রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে মিঃ লাহিড়ী। যেতে তো সবাইকেই একদিন হবে, দু'দিন আগে আর পরে। তাই বলে নিজের দেহটাকে নষ্ট করলে তো চলবে না!'

অগত্যা আমিই সুরু করলাম।

'মিসেস্ লাহিড়ী কি খবর পেয়েছেন?'

'ন্‌নাঃ।' মিঃ লাহিড়ীর কণ্ঠ অসম্ভব সুদূর শোনালো,—'ওকে এখনো জানাইনি। আমার কি কোন দিকে নজর দেবার ক্ষমতা আছে। মাকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন জানিনি। উনি যে এমন করে ফাঁকি দেবেন, ভাবতে পারিনি।'

'অসুখটা কি হয়েছিল, মিঃ লাহিড়ী?'

'অসুখ? কিছু না। দিন দশেক আগেও প্রেসীডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের ফেয়ারওয়েল মিটিংএর নিমন্ত্রণ চিঠি এলো। ওঁর সে কি উৎসাহ! আজ পর্যন্ত একটা এন্‌গেজমেণ্টও নষ্ট করেননি কিনা! এত বয়স, এ বয়সেও হাঁটা চলা করে বেরিয়েছেন, আমার তো তিনটে গাড়ী,—গাড়ীতে উনি চড়তেই চাননি।'

'আপনার মা বাঙালীর আদর্শ ছিলেন, মিঃ লাহিড়ী।'

'আদর্শ?' মিঃ লাহিড়ী যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছেন মনে হ'ল; 'আদর্শ কি বলছেন, তিনি একক ছিলেন। সেবার ওঁর উদ্যোগে যে 'শিশু-প্রদর্শনী' খোলা হয়েছিল, গভর্ণর সেটার দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়ে কী বলেছিলেন, মনে আছে তো সিতাংশু বাবু?'

সিতাংশু করুণচোখে তাকালো। তার স্বভাবতই মনে নেই। কিন্তু একজন শোকাহতকে এভাবে আঘাতদেওয়া নীতিবিরোধী। সিতাংশু বললে, 'আছে মিঃ লাহিড়ী। লাটসাহেব খুব প্রশংসা করেছিলেন।'

'মনে আছে?' নিদারুণ শোকের মধ্যেও মিঃ লাহিড়ীকে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠতে দ্যাখা গেল,—'তাহলে আপনি বলতে পারবেন। শেষলাইনটাতে কীযেন বলেছিলেন, আমার এখন ঠিক মনে আসছে না, কীযেন,···কীযেন—মা গিয়ে আমার মেমরিও যেন দুর্বল হয়ে গেছে।'

আমরা সকলে বিব্রত বোধ করলাম। 'থাকগে', ভয়েভয়ে বললাম।

'থাকবে কি? I've got in my file'. মিঃ লাহিড়ী পুরানো কাগজের ফাইল আনতে আদেশ দিলেন।

ওঁর বাবার সংগে ছোটবেলা যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, তখন ওঁর বয়স কতোই বা? অথচ সেই ভ্রমণের কী নিখুঁত ছবিই না এঁকে গেছেন, ওঁর লেখা 'সাগর পাড়ে' বইটাতে। You happened to see the book, did you not সোমনাথ বাবু?'

বললাম,—'দেখেছি। প্রি-ওঅর ইংলণ্ডের অমন নিপুণ প্রতিচ্ছবি আর বেশি নেই—'

'বেশি?' মিঃ লাহিড়ী আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—'There's hardly any. টেগোর পোয়েট একবার ওঁর সংগে আলাপ প্রসংগে বলেছিলেন, "আমার ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্র আপনার এ সম্পদের কাছে তুচ্ছ লেডী লাহিড়ি!"

চুপ করে রইলাম।

'উনি গিয়েছিলেন সেই কবে, আমি এই তো সেদিন ওদেশে গেলুম। এখনো ওখানে তাঁর কতো নাম। পরিচয় দিতেই সকলে চিন্‌লে। মানুষকে আপনার করে নিতে ওঁর ক্ষমতা অসাধারণ ছিল।'

এইখানে মিঃ লাহিড়ী চোখে রুমাল তুললেন।

'ওঁর সব চেয়ে উৎসাহ ছিল মেয়েদের শরীর-চর্চায়। প্রায়ই বলতেন রুগ্ন মেয়েরাই রুগ্ন সন্তানের জননী। মেয়েদের জন্যে কোন Institute of Physical Culture হয়েছে শুনলেই উনি অকাতরে অর্থসাহায্য করেছেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল, নিজেই একটা শরীরচর্চা সমিতি স্থাপন করবেন। তা আর হয়ে উঠলো না।' মিঃ লাহিড়ীর দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রায় অন্তরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এলো,—'ভাবছি ওঁর শেষ ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখব না। একটা Institute স্থাপন করবো। আমাকে আপনাদের সাহায্য করতে হবে সিতাংশুবাবু।'

'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো মিঃ লাহিড়ী।' আমরা অকৃত্রিম আবেগের সংগে বলে উঠলাম।

মিঃ লাহিড়ী একটুখানি উঠে গিয়ে একখানা ফোটোর এ্যালবাম নিয়ে এলেন।

'এই দেখুন, ওঁর শেষ বয়সের ছবি।'

আমরা সাগ্রহে ঝুঁকে পড়লাম।

'ছবিগুলো খুব ভাল উঠেছে। সব ক'খানাই বিলেত থেকে প্রিণ্ট করিয়ে আনানো। এদেশী কোন কিছুর ওপর ওঁর ভরসা ছিলনা।' মিঃ লাহিড়ী একটু অদ্ভুত ভংগীতে হাসলেন।

'এই ছবিটা—ওঁর ছোটবেলাকার গভর্ণেস মিস্ ডেস্‌ট্রিয়ার-এর সংগে তোলা। মালাবার হিলস্-এ। মিস্ ডেস্‌ট্রিয়ার খুব গিফ্‌টেড মহিলা ছিলেন, কেম্‌ব্রিজের এম্-এ।'

'ও', আমরা বললাম।

'আর এইটে, এটা মুস্যূরীতে তোলা, সঙ্গে কে জানেন তো?'

'কে, মিঃ লাহিড়ী?'

'জানেন না? উনি বরোদার দেওয়ান। ওঁকে ছোটবেলা থেকেই খুব ভালবাসতেন।'

'আর এইটে, এটা রামেশ্বরম্-এর। সংগে মিসেস্ অগস্টীন—মিসেস্ অগস্টীন্এর স্বামী ওএস্টর্ন্ স্টেট্ এজেন্সীর রেসিডেণ্ট ছিলেন।' মিঃ লাহিড়ীর দু' চোখ দীপ্ত হয়ে উঠলো,—'উনি সব সমাজেই মিশেছেন, খোলাখুলি ভাবে। ওঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভাইস্রোয়ের এ-ডিকংএর স্ত্রী দুঃখপ্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন, দাঁড়ান পড়ে শোনাই।'

আমরা উস্খুস্ করলাম। চিঠি যদি দীর্ঘ হয়? কিন্তু ভাগ্য ভাল, চিঠিটা পাওয়া গেল না। হতাশার ছাপে মিঃ লাহিড়ীর মুখে চোখে আবার বিবর্ণতা এলো।

'এত বড়ো বড়ো লোকের সংগে মিশেছেন, অথচ দুঃস্থ জনগণের জন্যে কী গভীর বেদনাবোধই না ওঁর ছিল! চার পাঁচটা অরফ্যানেজ-এ ওঁর ডোনেশান আছে।'

'জানি, মিঃ লাহিড়ী।' কিছু বলা উচিত ভেবে বললাম।

'ওঁর মৃত্যুতে শহরে সর্বত্র শোকের ছায়া পড়েছে। লেডী নন্দী কাল এসেছিলেন, বলে গেলেন,—এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি।'

'তা ছাড়া', মিঃ লাহিড়ী বলে চলেন, 'তা ছাড়া এই দু'দিনে কত লোক যে আমার সংগে দেখা করতে এসেছেন, অন্তত একহাজার হবে। আপনারা আজ এসে ভালই করেছেন সোমনাথ বাবু। আজ ভিড় নেই।'

'কাল সকালে এসেছিলেন ডক্টর সিওনার্ড, ওঁর নাম শুনেছেন তো পরিমল বাবু?'

'শুনেছি, মিঃ লাহিড়ী।'

'আর, ইণ্ডোব্রিটিশ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী এইচ্, কে, এণ্ড্রুজ—'

'হ্যাঁ।'

'আর স্যার টি, পি, অধিকারী—সবাই এসেছেন সিতাংশু বাবু। প্রত্যেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কিন্তু মন তো প্রবোধ মানে না, সোমনাথ বাবু!' মিঃ লাহিড়ীর চোখ দিয়ে এবার সত্যিই জল বেরিয়ে এলো।

আমরা মিঃ লাহিড়ীর জন্যে ব্যথিত হয়ে উঠলাম।

'সব কাগজে কমেণ্ট করেছে, আপনারা দেখেছেন? অমৃতবাজার, ট্রিবিউন, লীডার—সব জায়গা থেকেই। স্টেট্‌স্‌ম্যান, হ্যাঁ স্টেট্‌সম্যানেও।' মিঃ লাহিড়ীর চেহারায় একটা গর্ববোধের ইংগিত এলো।

'স্টেট্‌সম্যানের নিউজ এডিটর তো পারসোন্যালী এসেছিলেন। বলে গেলেন, ওর জীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পেলে, প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করতে পারেন। 'টাইম্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া' থেকেও অফার পেয়েছি। দেখি কী করতে পারি।'

ঘরের ঘড়িটাতে সাড়ে ন'টা বাজলো। আস্তে আস্তে বললাম, 'এবার উঠি মিঃ লাহিড়ী। ট্রামরাস্তা অনেকদূর—সেই পার্ক সার্কাস।'

'উঠবেন? আচ্ছা, সোমেশবাবু আপনি একটু দাঁড়ান, আপনার সংগে একটা কথা আছে।'

আমরা দুজনে একটু আড়ালে এলাম। মিঃ লাহিড়ী নিম্ন-কণ্ঠে বললেন,—'আপনি তো কবি সোমনাথ বাবু?'

'মাঝে মাঝে লিখেছি, মিঃ লাহিড়ী।' উত্তর দিলাম।

'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সোমনাথ বাবু।' একটু ইতস্ততঃ করে মিঃ লাহিড়ী বলে গেলেন,—'ওঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ক'রবো ভাবছি। 'ইন্‌ মেমোরিঅম্‌' গোছের আর কি। এ কাজটির ভার আপনাকে নিতে হবে সোমনাথ বাবু। অবিশ্যি আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমি তো ওঁর জীবন সংবন্ধে বিশেষ কিছু জানিনে, মিঃ লাহিড়ী!' কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম।

'বেশ, যা জানবার, আমার কাছ থেকে জেনে নিন্।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'ভেবে দ্যাখা নয়, এ কাজটির ভার আপনাকে নিতেই হবে, সোমনাথ বাবু। একশো টাকা দেবো। ওঁর মহীয়সী স্মৃতিকে এভাবে জনসাধারণের মন থেকে মুছে যেতে দেওয়া ঠিক হবেনা।' উত্তেজিত হয়ে মিঃ লাহিড়ী আমার হাত দু'খানা চেপে ধরলেন। 'আমার নামেই না হয় ছাপা হবে, আপনি যদি না চান। সম্মতি দিন সোমনাথ বাবু! এতে শুধু মা'রই স্মৃতি রক্ষা হবেনা, আমার নামও ছড়িয়ে যাবে সোমনাথ বাবু। না হয় একটু উপকার করলেনই!'

'আচ্ছা', অন্যমনস্কভাবে সম্মতি দিলাম।

রাস্তায় নামতেই পরিমল বল্লো,—'বাবা, পোণে দশটা বাজিয়ে দিয়েছে। মানুষটা মরলো, সেজন্য দুঃখুর তো অবধি নেই দেখলাম। এতক্ষণ খালি ক'হাজার লোক এসেছেন, কোন প্রাতঃস্মরণীয়েরা পায়ের ধূলো দিয়েছেন, স্টেট্স্‌ম্যানে ছাপা হয়েছে,—এক ফিরিস্তি শুনতে হ'ল।'

সিতাংশুর মুখটা কালো হয়ে উঠলো। 'তুই একটা হৃদয়হীন পশু পরিমল। মানুষের-বেদনা বোঝবার মতো তোর মনের গভীরতা নেই।'

'হৃদয়হীন'? হৃদয়হীনই ভাল। তোমার ওই মিঃ লাহিড়ীর বিগলিত হৃদয়বত্তার চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। কি বলিস্ সোমনাথ?'

কোন উত্তর দিলাম না। আমার মন তখন ত্রিশটাকার কেরাণী পরিমলের হৃদয়হীনতার সংগে ল্যান্সডাউন রোডের মিঃ লাহিড়ীর হৃদয়-বত্তার পার্থক্য কতোখানি, এমন কি আদৌ পার্থক্য আছে কিনা, এই সব জটিল সমস্যা-মগ্ন।

শান্তিকুটীর

কনকলতা ঘোষ

কনকলতা ঘোষ : জন্ম—বর্ধমানে, বঙ্গভংগ আন্দোলনের সময়। পিতা ৺শ্রীশচন্দ্র সরকার এম্-বি। পৈতৃক বাসস্থান—নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। কলিকাতা শিকদার বাগান নিবাসী ৺সতীশচন্দ্র ঘোষের পত্নী। এঁর রচিত পুস্তক "রেখা", "পাঞ্চজন্য", "অনুরাগ", "পত্রলেখা", "নূতন পথে", "প্রাণের পরশ", "বিবেকবাণী" প্রভৃতি।

বাংলার একখানি বিশিষ্ট পল্লীগ্রামের উপকণ্ঠে চারিপাশে গাছপালায় ঘেরা একখানি ছোট সুন্দর বাড়ী।

তাহার পশ্চাৎ দিকে একটী ছোট পুষ্করিণী, পাড়ে পাড়ে নানাবর্ণের ফুলের গাছ ও তাহার পাশে ডাল কলাইয়ের ক্ষেত ।

বাহিরের দিকে দেওয়ালের গায়ে সাইনবোর্ড লেখা—

"শান্তিকুটীর"। শ্রীবিজনকুমার পাল।

বৈঠকখানা-ঘরে একখানি টেবিল, একখানি চেয়ার, একপাশে মেজের উপর তিন চারিটি চরকা ও লাটাই, কিছু তুলা এবং দেওয়ালের অন্যান্য কয়েকখানি ফটোগ্রাফের সহিত মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারী, সুভাষ বোস প্রভৃতি দেশনেতাদের প্রতিকৃতি টাঙানো আছে।

এই বৈঠকখানায় আজ আর কেহ বন্ধুবান্ধব লইয়া বৈঠক বসায় না।

মাঝে মাঝে শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া প্রতিবেশী ও পথচারীদের জানাইয়া দিত যে বাড়ীটা মনুষ্যবর্জিত নয়, নতুবা আর বিশেষ কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইত না।

পাড়ার লোকেরা কখনো কখনো বাড়ীটার দিকে চাহিয়া 'আহা

বেচারী', 'গ্রহ-বরাত' প্রভৃতি দুইচারিটি কথা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিয়া চলিয়া যায়। বাড়ীটীতে দুইচারিজন যুবক ও একজন বৃদ্ধা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। নবাগত কোন লোক এ গ্রামে আসিলে পাড়াপ্রতিবাসীদের নিকট ঐ নিস্তব্ধপ্রায় বাড়ীখানার দিকে চাহিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করে, উত্তরে তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া ফিস্ ফাস্ করিয়া কত কি বলিয়া যায়।

একবার কে একজন ভদ্রলোক ঐ বাড়ীর সম্মুখে একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁ মশাই, এ বাড়ীর কর্তা কি এখানে উপস্থিত আছেন? নামটা যেন চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।

বৃদ্ধ গলার স্বর যথাসম্ভব কমাইয়া কহিলেন, ওঃ কপাল, তা বুঝি জান না? সে ত এখন জেলখানায় আছে, সে এক হৈ চৈ ব্যাপার! খবরের কাগজে কত লেখালেখি হ'ল, তা ঐ লেখাই সার। শুনবে তার কথা? আচ্ছা, তবে আমার বাড়ীতে এস ভায়া. পথে দাঁড়িয়ে সে সব কথা বলা তো ঠিক নয়, দেয়ালেরও কাণ থাকা অসম্ভব নয়, দিন কাল যা পড়েছে—বলিয়া বক্তা একবার সভয়ে চারিদিক চাহিয়া ল'ন।

পরে আগন্তককে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দাওয়ার উপর বসাইয়া বৃদ্ধ তখন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীর ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন—সে আজ প্রায় দু'বছর আগেকার কথা, একদিন সকালে উঠে শুনি চারদিকে যেন কি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, দেখলুম কি জান, ঐ যে লাল বাড়ীটা দেখলে না—ঐ বাড়ীটার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা লাঠি হাতে একদল পুলিশ।

দেখেই তো চক্ষুস্থির! তাড়াতাড়ি আমরা বুড়োরা এসে যে যার বাড়ী ঢুকে পড়লুম। বাব্বা, ওদের সামনে আর বাঘের

সামনে পড়া প্রায় একই কথা। একটু পরেই ছোঁড়ার দল সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল "বন্দেমাতরম্"। বার দুই তিন চেঁচিয়ে তারা চুপ করল। তারপর যখন সব গোলমাল থেমে গেল তখন দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়া গেল ব্যাপার কি জানবার জন্য। বেরিয়ে শুনলুম যে ঐ লোকেরা এসে লালরঙের বাড়ীখানা খানাতল্লাসী করে গেছে আর যাবার সময় ঐ বাড়ীর বর্তমান কর্তা, আমাদের বন্ধু ৺হরি র পালের একমাত্র পুত্র বিজন পালকে গেরেপ্তার করে নিয়ে গেছে। শুনে সত্যি বড় দুঃখ হ'ল, বিশেষ করে মনে পড়ল তার বিধবা মা আর সদ্যপ্রসূতা বৌটার কথা, কেই-বা এখন তাদের রক্ষক হয়ে থাকে, আর কেই বা করে দেখাশুনা। কিন্তু দুঃখ হ'লে কি হবে আমরা গিয়ে যে একটু দেখা শুনা করব, কি মেয়েরা গিয়ে মেয়েদের একটু যত্ন আত্তি করবে, দুটো ভাল কথা বলবে তার তো উপায় নেই। শেষে কি পরোপকার করতে গিয়ে বুড়ো বয়সে শ্রীঘর বাস করব ভায়া, বুড়ো হাড়ে কি আর সে সাহস আমাদের হয়? তোমরা যোয়ান ছেলেরা অনেক দুঃসাহসের কাজ করতে পার। কাজেই দুঃখ হলেও সাহায্যই করতে পারি নি। ইতিমধ্যে পাড়ার আরো দুই চারিজন ভদ্রলোক আসিয়া সেখানে জমায়েৎ হইয়াছেন।

বৃদ্ধ বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—তাকে যেদিন ধরে নিয়ে যায় তার আগের দিন বেচারার মেয়েটির সবে ষষ্ঠীপূজা হয়েছে, ওই প্রথম সন্তান কিনা, কত আমোদ আহ্লাদ করে সকলকে খাওয়ালে, ভিখারীদের পয়সা মিষ্টি দিলে, আর তার পরদিনই ঐ ব্যাপার। গ্রহের ফের ছাড়া আর কি বলব বল।

একজন বলিয়া উঠিল, ছেলেটি বড় ভাল ছিল। কেন যে ধরলে ঠিক বোঝা গেল না আদালতে বিচারও হ'ল না, শুনলুম কি

এক নতুন আইনে নাকি ঐ রকম আটক রাখার নিয়ম হয়েছে। যতদিন ইচ্ছা ধরে রাখবে, ইচ্ছা হ'লে ছেড়ে দেবে।

আর একজন একটু বেশী মুরুব্বীয়ানা করিয়া বলিলেন, আজকালকার ছেলেগুলোও হয়েছে বড় জেদী, বড় একরোখা, ভয় ডর নেই। আবার জান ভায়া, আমাদের শুদ্ধু দলে টানতে চায়—বলে ছোট বড় সবাই মিলে দেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করতে হবে, তা নইলে এত বড় কাজ কি করে সম্পন্ন হবে। আরে বাপু, আমাদের কি আর সেই বয়েস আছে যে জ্যাঠামিপনা করে তোদের সংগে নেচে বেড়াব?

অপর একজন কহিলেন, বিজন ছেলেটা সবদিকে ছিল ভাল, ঐ স্বদেশী স্বদেশী করে কি পরিশ্রমটাই না করত আর টাকাও খরচ করত কম নয়। সেই জেলে গিয়ে অবধি গ্রামটা যেন নিঝুম হয়ে আছে, আর সব ছেলেরাও মনমরা হয়ে পড়েছে। তবু তারা যা পারছে করতে ছাড়ছে না—খদ্দর, চরকা, বক্তৃতা এই সব নিয়েই আছে।

তিনি চুপ করতেই আগন্তুক ভদ্রলোক সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, আহা, তাইত ওঁদের বাড়ীর সকলের বড় বিপদ মেয়েদের দেখা শুনা করছে কে? বলিয়া তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

বৃদ্ধ সোৎসাহে কহিলেন, তার ভাবনা নেই ভায়া, আমরা যেতে পারিনে বটে, কিন্তু ওদের পাশের বাড়ীর একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর বিজনের চার পাঁচজন বন্ধুবান্ধব সদা সর্বদা দেখাশুনা করে, যাতে ওদের কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য খুব চেষ্টা করে। আমাদের ছেলেরাও সুযোগ পেলে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধবার গিয়ে বন্ধু বাড়ীর সংবাদ নিয়ে আসে। বিজনকে সকলেই খুব ভালবাসে কি না।

আজকালকার ছেলেরা যা ভাল বুঝবে তা করবেই, কারো কথা:

মানবে না এমনি দিনকাল পড়ে গেছে ভায়া। তোমরাও 'ইয়ংম্যান' বলনা কথাটা সত্যি কিনা ?

আগন্তুক একটু হাসিয়া কহিলেন, সে ত' ভাল কথা মশাই, যা অন্যায় নয় তা করলে তাতে লোকে দোষী বললে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়, তা'তে ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ছোট গ্রামখানায় এখনো তাহলে বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার, বিপন্নকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবার লোকের অভাব হয়নি, ভগবানের কৃপায় আর এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই আমরা মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করতে শক্তি ও উৎসাহ লাভ করেছি এটা কম আনন্দের কথা নয়।

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাইতে উদ্যত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন আমি কংগ্রেস দলের একজন প্রচারক, কোথায় কি ভাবে স্বদেশী আন্দোলন চলছে, তাই দেখে বেড়ান ও যারা জেলে গিয়েছেন, তাঁদের বাড়ীর যথাসম্ভব অভাব অভিযোগ জেনে তার প্রতিকার করবার চেষ্টা এই আমাদের কাজ। আপনার কাছে বিজনবাবুর বাড়ীর সংবাদ জেনে খুব উপকৃত হলুম।

এ্যাঁ, আপনি ঐ কংগ্রেসওয়ালাদের দলের লোক, তাইতো না জেনে অনেক চর্চা করেছি মশাই, কিছু মনে করবেন না।

উপস্থিত সকলের মুখেই, ভয় ও বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

আগন্তক হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই মশাই—সি-আই-ডির লোক ত নই, সুতরাং থানায় গিয়ে সংবাদ দিয়ে আপনাদের বিপদে ফেলব না। আমরা লোককে স্বদেশীব্রত নিতে অনুরোধ করে থাকি মাত্র। আচ্ছা আসি তা'হলে নমস্কার। বলিয়া ভদ্রলোক পথের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রতিবেশীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

গুপী কবিরাজ

নরেন্দ্র দেব

নরেন্দ্র দেবঃ জন্ম—বারশ' পঁচানব্বই সালে কলিকাতায়। ছাত্রজীবন—কলিকাতায়। এঁর রচিত কয়েকখানা বই 'যাদুঘর', 'খেলার পুতুল', 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি। অধুনা 'পাঠশালা' নামক পত্রিকার সম্পাদনা কর্‌ছেন।

ডাক্তারী চিকিৎসার ঘোরতর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও একটা অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য গুপী কবিরাজকে বাধ্য হয়ে আসতে হ'ল শহরের এক বড় হাঁসপাতালে।

যাবার দিন রায় বাহাদুর গোপাল রায় জিজ্ঞাসা করলেন—

কিহে, তোমার আয়ুর্বেদ বুঝি আর হালে পানি পেলো না? শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি চিকিৎসারই আশ্রয় নিতে হ'ল!

গুপী কবিরাজ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললেন—আয়ুর্বেদ অগাধ সমুদ্র—হাল ধরতে জানলেই পানি পাওয়া যায়! শল্য-চিকিৎসার কাছে তোমাদের ডাক্তারি ত এখনও শিশু!

রায় বাহাদুর একটু হেসে বললেন—সেই শিশুরই ত দ্বারস্থ হ'তে হ'চ্ছে কবরেজ!

—নইলে উপায় কি বলো? দেশের চিকিৎসাকে অবজ্ঞা করে বিদেশী শাসনকর্তারা যে নিজেদের ক্ষুদ্র বিদ্যার অহংকারে তাদের চিকিৎসা শাস্ত্রটাই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলে! নইলে লাখো লাখো টাকার বিলিতি ওষুধ বিক্রী হবে কেমন করে আর মোটা মাইনের সব 'আই এম্ এস্'ই বা প্রতিপালিত হয় কিসে?

আচ্ছা তা না হয় মানলুম, কিন্তু তা বলে তোমাদের শল্য-চিকিৎসাটা মরলো কিসে? আয়ুর্বেদ বেঁচে থাকতে তার এ অকালমৃত্যুর কারণ কি?

কারণ কি যদি তোমার মত গর্দভেরা বুঝতো তা হ'লে আয়ুর্বেদের আজ এ দুর্দশা হবে কেন? শল্য চিকিৎসা ত আর পুঁথি পড়ে অধিগত হয় না, হাতে-নাতে অস্ত্র ধরে এ চিকিৎসা শিক্ষা করা চাই।

এই নিরস্ত্র পরাধীন দেশে তুমি অস্ত্র ধারণ করতে চাও? তোমার সাহস ত কম নয়!

তা হ'লে বঁটি কাটারিগুলো বাড়ি থেকে বিদেয় করে দাও! তোমার রায়বাহাদুরত্ব নিরাপদ হোক।

ও-ও! তোমাদের আয়ুর্বেদের শল্য চিকিৎসা বুঝি ঐ বঁটি কাটারির সাহায্যেই করতে হয়?

তোমার মত রায় বাহাদুরদলকে কচুকাটা করতে হয়!

আহা! চটো কেন কবরেজ? আচ্ছা—একটা কথা বলতে পার! সার্জারির নাম তোমাদের আয়ুর্বেদে শল্য-চিকিৎসা হ'ল কেন? ওটা কি চরক সুশ্রুতের কোনো শ্যালক আবিষ্কার করেছিলেন?

গুপী কবিরাজ কোনো উত্তর দিলেন না। চটে উঠে চাদরখানা কাঁধে ফেলে হন্-হন্ ক'রে চলে গেলেন।

রায়বাহাদুর প্রাণ খুলে হো হো শব্দে হেসে উঠলেন।

গুপী কবিরাজ হাঁসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন। রায়বাহাদুর তাঁকে 'কেবিনে' থাকবার খরচা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কবিরাজ তাতে সম্মত হন নি। একলা একখানা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকলে হাঁপিয়ে উঠবো বাবা! পাঁচ জনের মুখ না দেখতে পেলে মরে যাবো—এই বলে তিনি এক রকম জোর করেই জেনালের ওয়ার্ডের সাত নম্বর বেডটা বেছে নিয়েছিলেন।

তাঁর ডানদিকে ছিল ছ' নম্বর বেডে একজন ডায়াবিটিসযুক্ত কার্বাংকল রোগী, আর বাঁ-দিকে ছিল আট নম্বর বেডে একজন ট্রাম থেকে পড়ে-

যাওয়া পা-কাটা রোগী। দু'জনেই প্রায় কবরেজের সমবয়সী, কাজেই আলাপ জমে উঠতে বিলম্ব হয় নি।

কবরেজের কাল অপারেশন হয়ে গেছে! কিন্তু যন্ত্রনায় সারারাত কাতরাচ্ছে, ঘুমুতে পারেন নি। যতবার নার্সদের ডেকে বলেছেন—ওগো মাসি বাবারা, একটা কিছু ঘুমের ওষুধ দিয়ে বুড়োটাকে বাঁচাও—তারা বলেছে—সরি! সার্জেনের অর্ডার নেই।

গুপী কবরেজ বলেন—দূর তোর সার্জেনের নিকুচি করেছে!—ক টেলিফোনে খবর দিয়ে একবার জেনে নাওনা বাছা!

নার্স বলে—রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করবার হুকুম নেই। কাল সকালে তিনি যখন রাউণ্ড দিতে আসবেন তখন জেনে নেবো!

কবরেজ বলেন—এ কি রকম ব্যবস্থা তোমাদের মাসী বাবা! সারারাত না ঘুমিয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করে মরবো আর তোমরা কাল সকালে তার ব্যবস্থা করবে! এই জন্যেই কেউ হাঁসপাতালে আসতে চায় না! এখনি একটা উপায় করো মাসী নইলে তোমাদের ভাল হবে না বলছি!

নার্স বললে—আচ্ছা আমি হাউস সার্জেনকে তোমার বিষয় জানাচ্ছি।

কবিরাজ বলেন—হাউস্-সার্জেন—হোম-সার্জেন বুঝিনি বাবা, চটপট ঘুমিয়ে পড়ি এমন একটা ওষুধের ব্যবস্থা করো—যন্ত্রনা আর সহ্য করতে পারছিনি মাসী!

ক্ষণকাল পরে নার্স এক শিশি ওষুধ নিয়ে এল। তা'তে তিন দাগ ওষুধ ছিল। গুপী কবিরাজকে তা' থেকে একদাগ ঢেলে খাইয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘণ্টাদুই পরে কবিরাজের যখন বেশ একটু তন্দ্রার মত ভাব এসেছে

নার্স এসে তখন তাঁকে আর একদাগ ওষুধ খাওয়াতে গেল।

গুপী কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা আবার কি? এ ওষুধ কিসের?

নার্স বললে—ঘুমের ওষুধ।

কবরেজ বললেন—একটু আগে আমায় দিলে যে!

নার্স বললে—হ্যাঁ, ডাক্তার তিনদাগ ওষুধ দিয়েছেন। প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করে দিতে বলেছেন!

গুপী কবিরাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ঠিক জানো এ ঘুমের ওষুধ? নার্স বললে—নিশ্চয়!

গুপী কবিরাজ ওষুধের শিশিটা দেখতে চাইলেন। নার্স শিশিটা তাঁর হাতে দিতে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন সত্যিই ঘুমের ওষুধ লেখা রয়েছে 'স্লিপিং ড্রাগ্' তিন দাগও বটে, ডাইরেকশান রয়েছে 'ওয়ান ডোজ এভ্রী টু আওয়ার্স'। তিনি আর কিছু না বলে—শিশি শুদ্ধ ওষুধটি ছুঁড়ে বারন্দায় ফেলে দিলেন।

নার্স উত্যক্ত হ'য়ে কি বলতে যাচ্ছিল—গুপী কবিরাজ তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন--নিজের কাজে যাও, বিরক্ত কোর না। যে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দু-ঘণ্টা অন্তর একদাগ করে খেতে দেয় তার মাথায় মারি আমি ঝাড়ু! তোমাদের একটা 'কমনসেন্স্' নেই? রোগী ঘুমুবে—না সারারাত ধরে দু'ঘণ্টা অন্তর তোমাদের ঐ ছাইপাঁশ দাওয়াই গিলবে? তোমাদের এ হাউস্-সার্জেনকে 'ওয়্যার-হাউসে' পাঠিয়ে দাও, হাঁসপাতালে রাখা ওকে নিরাপদ নয়।

সারারাত গুপী কবিরাজ ঘুমুতে পারেন নি। সকালের দিকে যন্ত্রনা আরও বেড়েছে। তিনি যতই অস্থির হয়ে ওঠেন নার্সরা বলে 'ওয়েট', এখনি বড় সার্জেন দেখতে আসবেন—ইম্পেশ্যেন্ট্ হয়ো না।

কবরেজ বলেন—আমরা ত হস্‌পিটালের পেশ্যেন্ট্ হয়েই রয়েছি মাসী বাবা। তোমাদের অত্যাচারেই 'ইম্পেশ্যেন্ট্' হয়ে উঠছি! ব্যাণ্ডেজ্‌টা যে চড় চড় ক'রছে—একটু আলগা করে দেনা বাবা!—

নার্স বলে—সার্জেনের অর্ডার ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না।

গুপী কবিরাজ নিরুপায় হ'য়ে ব্যাকুলভাবে সার্জেনের শুভাগমন প্রতীক্ষায় মিনিট গুণতে থাকেন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ বড় সার্জেন এসে ঢুকলো ওয়ার্ডে। পিছু পিছু তাঁর জনকতক ছাত্র, হাউস-সার্জেনরা, সিস্‌টার, ওয়ার্ড-নার্স সে এক সমারোহ!

গুপী কবিরাজ তাঁকে দেখেই চীৎকার করে উঠলেন—ও বাবা! একবার এদিকে এস ধন, সারারাত যন্ত্রণায় মারা গেলুম! দোহাই তোমার, বুড়োকে বাঁচাও!

রোগীর এই অসভ্যতায় সার্জেনের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার গুপী কবরেজের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং গম্ভীর ভাবে প্রত্যেক বেড পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলেন।

গুপী কবিরাজ আরও বার দুই হাঁকা হাঁকি করলেন—ও সার্জেন সাহেব! ও বড় ডাক্তার বাবু মশাই! একবার দয়া করে এই বুড়োটাকে আগে দেখে যান, প্রাণ যায় দাদা, তীর্থের কাকের মত সকাল থেকে তোমার পথ চেয়ে পড়ে আছি ধন, একবার এদিকে এস মাণিক!

সার্জেন সমাদ্দার অধিকতর বিরক্ত হ'য়ে ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বেড পরিদর্শন করতে লাগলেন, কিন্তু গুপী কবিরাজের সাত নম্বর বেডে এলেন না। পাঁচ নম্বর ছ'নম্বর দেখে তিনি একেবারে আট নম্বরে চলে গেলেন। দেখ্‌তে লাগলেন নয়—দশ—

গুপী কবিরাজ অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—বলি, এদিকে আসবে—না আসবে না?—ডাক্‌ছি বলে বুঝি—ল্যাজ মোটা হয়ে উঠেছে? শীগ্‌গির এস বলছি।

সার্জেন সমাদ্দারের সমস্ত বেড পরিদর্শন শেষ হবার পর তিনি ঘরের এক কোণ থেকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সংগে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে তোমার? অমন অসভ্যর মত চেঁচাচ্ছ কেন?

গুপী কবিরাজ চেষ্টা করে শয্যার উপর খানিকটা উঠে তর্জনি সংকেতে সার্জেনকে নিকটে আসবার জন্য ইংগিত ক'রে বললেন—এদিকে এস, ওখান থেকে পেশ্যেন্টকে কিছু জিজ্ঞাসা করাটাও তোমার পক্ষে সভ্যতা বা শিষ্টাচারের পরিচায়ক নয়।

সার্জেন সমাদ্দার এবার নিকটে এসে বললেন—'তুমি কি জাত? ভদ্রলোকের সংগে কথা বলতে শেখনি?

গুপী কবিরাজ গর্জন করে উঠলেন—"Shut up! এটা কি তোমার বাবার জমিদারী পেয়েছ যে লাট সাহেবী মেজাজ দেখাতে এসেছ? তুমি যে মাইনে করা চাকর এটা তোমার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে ব'লে আমি দুঃখিত। পাব্‌লিকের চাঁদায় এই হাঁসপাতাল চলছে, আমাদের পয়সায় তোমার অন্ন জুট্‌ছে এটা ভুললে চলবেনা! প্রত্যেক রোগী তোমার মনিব। আমাদের দেখবার জন্যই তোমায় মাসে মাসে মোটা টাকা দেওয়া হ'চ্ছে। তুমি দয়া করে অনুগ্রহ করে আমাদের দেখে কৃতার্থ করে দিচ্ছ মনে কোর না। আমরা ইচ্ছে করলে কালই তোমাকে কাণ ধ'রে গলাধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি তা জানো?

গুপী কবিরাজের কথা-বার্তা শুনে ও রকম-সকম দেখে স্টুডেণ্ট্‌রা, হাউস সার্জেনরা, সিস্‌টার ও নার্সরা সব স্তম্ভিত!

আশে পাশের বেডের রোগীরা কিন্তু সব মনে মনে পুলকিত !

গুপী কবিরাজ বলতে লাগলো—কতদিন থেকে এভাবে তুমি রোগী দেখছ ? আমার ডান পাশের বেডে এলে বাঁ পাশের বেডে গেলে, কিন্তু মাঝখানে আমার সাত নম্বর বেড বাদ দিয়ে গেলে—এর মানে কি ? তোমার খুশি-খেয়াল মাফিক কাজ করা হাসপাতালে চলবে না—বুঝলে ! এ সব চাল বাড়ীতে দেখিয়ো—এটা কর্মস্থল—

সিনীয়র হাউস সার্জন বলে উঠলো—আপনি কাকে কি বলছেন ?—জানেন উনি কে ? গুপী কবিরাজ বললেন—উনি যত বড় মহারথীই হোন না, আমাদের বেতন ভোগী কর্মচারী ছাড়া ত' আর কিছু নন ?

সার্জেন সমার্দার উঠে পড়ে হাউস সার্জেনকে বললেন—এ রকম ইনসোলেণ্ট পেশেণ্টকে আমাদের হাঁসপাতালে রাখা চলবে না—আজই একে রিম্যুভ্ করে দিন—ক্যাম্পেবেল কিম্বা শম্ভুনাথ পণ্ডিতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। কাল সকালে আমি সাত নং বেড খালি দেখতে চাই !

এই বলে সার্জেন সমাদ্দার যখন ওয়ার্ড থেকে চলে যাচ্ছিলেন, গুপী কবিরাজ হেঁকে বললেন—কাল সকাল থেকে এ হাঁসপাতালে যাতে তুমি আর ঢুকতে না পাও আমিও সে ব্যবস্থা করবো—!

বেলা তিনটে চারটে নাগাদ রায় বাহাদুর গোপাল রায় ও অনারেবল জ্যাস্টিস্ ঘোষ সাত নম্বর বেডের সন্ধান করে এসে উপস্থিত হলেন হাঁসপাতালে গুপী কবিরাজকে দেখতে।

হাঁসপাতাল শুদ্ধ লোক তটস্থ ! রায়বাহাদুর গোপাল রায় এই হাঁসপাতালে এক লাখ টাকা দান করেছেন। তিনি হাঁসপাতালের গভর্ণিং বডির প্রেসিডেণ্ট ! জ্যাস্টিস্ ঘোষ ভিজিটিং কমিটির চেয়ারম্যান !

হাঁসপাতাল শুদ্ধ লোক এদের চেনে এবং যত বেশী সম্ভ্রম করে তত বেশী ভয় করে।

গুপী কবিরাজ জ্যাস্টিস্ ঘোষের স্ত্রীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। ঘোষসাহেব বললেন—আপনার দয়ায় তিনি বেশ সুস্থ আছেন, তাঁর আর কোনো অসুখ নেই।

রায় বাহাদুর বললেন—ছ'মাসের জ্বরাতিসারগ্রস্থ রোগীকে তুমি যে রকম পোলাও কালিয়া খাইয়েছিলে আর কি তার অসুস্থ হবার উপায় আছে? কিন্তু, সে যাক্, এখন তুমি কেমন আছ বলো?

গুপী কবিরাজ বললেন—তুমি যে হাঁসপাতালের কর্ণধার সেখানে রোগী কখনো সুস্থ থাকতে পারে? আহম্মকের মত লাখ টাকা জলে দিয়েছ দেখছি!

তারপর রাত্রের ঘুমের ওষুধ থেকে আরম্ভ করে সকালের সার্জেন সমাদ্দারের কাহিনী সবিস্তারে তিনি বর্ণনা করে গেলেন।

জ্যাস্টিস্ ঘোষ শুনে ভয়ানক চটে উঠে বললেন—রায়বাহাদুর! এ সংবন্ধে আমাদের 'ইমেডিয়েট্ স্টেপ্' নেওয়া উচিত।

গোপাল রায় শুধু গম্ভীর ভাবে বললেন—হুঁ!' তারপর অনেকক্ষণ বসে তাঁর গুপী কবিরাজের সংগে নানা গল্প গুজব ও রঙ্গ রহস্য করে পাঁচটার আগেই উঠে পড়লেন। কারণ পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত হাঁসপাতালে সাধারণের প্রবেশাধিকার। এঁরা সে নিয়মের অধীন নন।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যে সাতটার পর সার্জেন সমাদ্দার হাঁসপাতালে এসে উপস্থিত! হাঁসপাতালে একটা সাড়া পড়ে গেল। বরাবর সাত নম্বর বেডে এসে তিনি গুপী কবিরাজের দুটি হাত ধরে বললেন—আমায় মাপ করুন। আমার অন্যায় হয়েছে, আমি গুরুতর অপরাধ করেছি!

গুপী কবিরাজ বললেন—সে কি হাঁসপাতালেশ্বর! আমায় তাড়িয়ে

না দিয়ে এ যে উল্‌টো গাওনা স্থুরু করলে দেখছি ! আমি ত ক্যাম্পেবেলে যাবার জন্ম রেডি।

সার্জেন সমাদ্দার বললেন—আর আমায় লজ্জা দেবেন না। বলুন ক্ষমা করলেন --

গুপী কবিরাজ বললেন—আরে, আমি একটা ছেঁড়া কাঁথা বুড়ো হাব্‌ড়া পথের ভিখিরি—দয়া করে হাঁসপাতালে স্থান দিয়েছ' এই আমার বাপ চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি ! আমি তোমায় ক্ষমা করবার কে ? তুমি হলে একটা এতবড় মহামান্য সার্জেন সাহেব !

দেখুন, আমি আপনার পরিচয় জানতুম না, রায়বাহাদুর আমাকে ফোনে বললেন আপনি হচ্ছেন দেশ বিখ্যাত কবিরাজ—

বাপু হে ! আবার ভুল করেছ ! পরিচয়ের সংগে তোমার কি দরকারটা শুনি ! তোমার কাছে আমাদের সকলের শুধু একটী মাত্র পরিচয়—আমরা তোমার পেশেণ্ট !—সকলকে সমানভাবে যত্ন করে দেখবে—এই হ'ল তোমার ডিউটি ! চিকিৎসা ঠিক হচ্ছে কিনা—রোগী কষ্ট না পায় এই গুলো দেখাই তোমার কাজ—

নিশ্চয় ! আপনি যা বলছেন খুব ঠিক—

আর সকালে তোমায় যা বলেছিলুম—

সমস্তই উচিত কথা বলেছেন—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর কখনো এমন কাজ করবো না।

গুপী কবিরাজ মুখের কথায় ভোলেনা সার্জেন সাহেব ! আমি দেখতে চাই তোমাদের সত্যি আক্কেল হয়েছে কিনা ?

তার পরদিন থেকে দেখা গেল সার্জেন সমাদ্দার আর সে লোক নেই। প্রত্যেক রোগীকে সে কী যত্ন করে দেখা ! নার্স, হাউস সার্জেন, সিস্‌টার, সবার ভোল যেন একেবারে বদলে গেছে ! এক্কবারের

জায়গায় সাতবার করে এসে তত্ত্বাবধান করা, যাতে কারুর কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে সর্বদা তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি। গুপী কবিরাজের ত' কথাই নেই! যে কদিন ছিলেন একেবারে রাজার হালেই ছিলেন বলা চলে।

যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি হাঁসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরবেন, ওয়ার্ড শুদ্ধ রোগীর দল কাকুতি মিনতি করতে লাগলো—দোহাই আপনার, আর কিছুদিন থেকে যান! আপনি চলে গেলে আমাদের কি দুর্দশা হবে!

গুপী কবিরাজ তাদের আশ্বাস দিয়ে এলেন—তিনি মাঝে মাঝে হাঁসপাতালে ঘুরে যাবেন।

পুরুষ ও নারী

গোপাল ভৌমিক

গোপাল ভৌমিক : জন্ম—উনিশ শ' আঠার সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত দানিস্তপুর গ্রামে। ছাত্রজীবন—রংপুর ও কলিকাতায়। রবিদাস সাহা রায়ের সহযোগিতায় 'দেশী ও বিদেশী' নামক ছেলেদের গল্পগ্রন্থ লিখেছেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

"মেয়েরা পুরুষের সমান হতে পারে না—এই তবে আপনার মত?" সুনন্দা প্রশ্ন কর্‌লো। গলার স্বরে তার মনের উষ্মাটা একেবারে চাপা পড়্‌লো না।

"হ্যাঁ, তাই আমার মত" সুব্রত জবাব দিলো, "আর শুধু মাত্র মত বল্‌লে ভুল করা হ'বে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি বুঝি তুমি রাগ কর্‌বে—আর রাগ করবার কথা ত বটেই। বিংশ শতাব্দীতে এই পৃথিবীব্যাপী স্ত্রীস্বাধীনতার জয়যাত্রার দিনে, আমার মত একজন অতি আধুনিক তরুণের মুখে এমন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ শুন্‌লে নেহাৎ প্রাচীনপন্থীরাও যে ঘাব্‌ড়ে যাবেন। তোমার ত রাগ করাই উচিত। তুমি আলোকপ্রাপ্তা তরুণী, বি-এ পড়—পুরুষের সংগে সমানাধিকার দাবী কর, তুমি ত রাগ কর্‌বেই!"

"না, আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না, সুব্রতদা"—কৃত্রিম ক্রোধের ভান ক'রে সুনন্দা জবাব দেয়, "আপনি কোন কিছুই সিরিয়াস্‌লি নেন না—সব কিছুতেই আপনি রসিকতা করেন। কিন্তু মেয়েরা যে পুরুষের সমান হ'তে পারে না—আপনার এ মত আমি মান্‌তে রাজী নই। জানেন পৃথিবীর অনেক মহামনীষী নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ব'লে ঘোষণা করে গেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যসমাজের

দিকে তাকিয়ে দেখুন—দেখ্‌বেন নারী পুরুষের সংগে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে জীবনের প্রতিটি বিভাগে। এ-ও-কি আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন ?”

“না, হেসে উড়িয়ে দেব না,” সুব্রত সহাস্যে উত্তর দেয়, “তোমার সব কথা স্বীকার ক’রে নিলুম, কিন্তু মনে রেখো, আমি মহামনীষী নই—আমি শুধু তিনশ’ টাকা মাইনের গরীব ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। কাজেই মহামনীষীদের সংগে আমার মতের মিল হয়ত হ’বে না। তবে আমি যা বলি তা খাঁটি আমার নিজস্ব মতামত—কারও কাছ থেকে ধার করা মত নয়—আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত !”

সুনন্দা জবাব দেয়, “আপনার বিদ্রূপটা না হয় বুঝলুম। আমার ধার-করা মতামতকে লক্ষ ক’রেই যে ব্যংগের ঢিলটি ছুঁড়্‌লেন, তা অতি সহজ বোধ্য। তবে বিশ্ব-প্রসিদ্ধ মনীষীদের মতবাদগুলো ত উপেক্ষার বস্তু নয় !”

“না, তা নয়” সুব্রত জবাব দিলো, “তবে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত দৃঢ় ধারণা এই যে কতকগুলো দৈহিক অসামর্থের জন্য নারী অন্তত‌পক্ষে ব্যবহারিক জীবনে পুরুষের সংগে সমকক্ষতা দাবী কর্‌তে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানসিক অন্যান্য গুণ হয়ত তার পুরুষের চেয়ে বেশীও থাক্‌তে পারে কিন্তু দৈহিক অসামর্থ মেয়েদের সমানাধিকার দাবীর পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।”

“আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—একটু পরিষ্কার করে বলুন।” সুনন্দা ব’লে উঠে। “আচ্ছা বলছি শোন”, সুব্রত ব’লে চলে “মেয়েদের দৈহিক অসামর্থ যে অনেক সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। মাতৃত্ব যা’ তোমাদের নারী জীবনের চরম এবং পরম কাম্য—সেইটাই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। মনে কর বিবাহিতা

একটি মেয়ে—কোন ফার্মে সে টাইপিস্‌টের কাজ করে। তার সন্তান-সম্ভাবনা—তখন তার কতদিনের ছুটি প্রয়োজন? অন্তত ছয় মাসের। কারণ ছেলে হ'বার পরে তার ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এবং ছেলেকে মানুষ করার জন্য অন্তত কিছুদিনের ছুটি প্রয়োজন। প্রতি বছরে না হোক্ যদি প্রতি দুই বছরে বা প্রতি তিন বছরেতাকেও অন্তত ছয়মাসের ছুটি দিতে হয়, তবে ফার্মের কাজ চলে কি ক'রে? এছাড়া অন্যান্য নির্ধারিত এবং আকস্মিত ছুটি ত আছেই। কিন্তু পুরুষ টাইপিস্‌ট্ হ'লে কি এমন ব্যাপার ঘটে? কাজেই দেখতে পাচ্ছ যে এই মাতৃত্বের হাত এড়াতে না পার্‌লে ব্যবহারিক জীবনে পুরুষের সমকক্ষ কখনও হ'তে পার্‌বে না। যে মাতৃত্বকে তোমরা বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান ব'লে মনে কর ব্যবহারিক জীবনে তাই হ'য়ে দাঁড়ায় তোমাদের অভিশাপের মত!" শেষের কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে সুব্রত'র গলাটা ধরে যায়। শোকের একটা উদ্‌গত বাষ্পকে সে যেন অতিকষ্টে দমিয়ে রাখ্‌লো। তার সারামুখে নেমে এলো একটা বিষাদের ঘন-কালো ছায়া। সুব্রত'র এই ভাবান্তর কিন্তু সুনন্দার চোখ এড়াল না। হঠাৎ তার এই ভাবান্তরে কথার মোড় গেলো ঘুরে।

সুনন্দা তার তর্কের বিষয়-বস্তু ভুলে' গিয়ে হঠাৎ সুব্রত'র হাতখানা জড়িয়ে ধ'রে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে ব'লে উঠলো: "সুব্রতদা, আপনার গলাটা অত ভারী হ'য়ে গেলো কেন? না, আপনাকে বল্‌তেই হ'বে। আমি বহুদিন আপনাকে লক্ষ ক'রেছি আপনার মনে কি যেন একটা গভীর দুঃখ লুকানো আছে। মাঝে মাঝে কথা বল্‌তে বল্‌তে আপনি যেন কেমন বিমনা হ'য়ে পড়েন। কোথায় যেন আপনার একটা গভীর ক্ষত আছে। আজ আপনাকে বল্‌তেই হ'বে। আমি ছাড়্‌ব না।"

সুব্রত বলে, "দুঃখ হয়ত আমার আছে—কিন্তু আজ থাক্, আরেকদিন তোমায় সব বল্‌ব। ওই দেখ মা এদিকেই আস্‌ছেন!"

মা ঘরে এসেই বল্‌লেন: "তোমাদের কি আর গল্প শেষ হ'বে না? ওদিকে চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল! তোমরা দুজনে তর্ক জুড়ে' দিলে সে তর্কের কি আর শেষ আছে? আজ কি নিয়ে তর্ক হ'চ্ছিল দু'জনের?"

"আর কি নিয়ে তর্ক হ'বে!" সুনন্দাই জবাব দেয় "চিরকাল যা' নিয়ে সুব্রতদার সংগে তর্ক হয়। সেই চিরন্তন পুরুষ আর মেয়ের সমকক্ষতার প্রশ্ন নিয়ে। সুব্রতদার মতে মেয়েরা নাকি কোনদিন পুরুষের সমকক্ষ হ'তে পারে না। আচ্ছা মা, তোমার কি মত?" সুনন্দা সুব্রতর বিরুদ্ধে মায়ের দরবারে নালিশ জানায়!

নালিশে কিন্তু ফল হয় না কিছুই। সুনন্দার মা পতি-ভক্তি-পরায়ণা হিন্দু রমণী, একটু সেকেলে। তিনি সুব্রত'র পক্ষ নিয়েই কথা বলেন: "তা' সুব্রত ত ঠিকই ব'লেছে। মেয়েরা আবার কখনো পুরুষের সমকক্ষ হ'তে পারে নাকি? যত সব আজগুবি কথা! আজকাল তোরা যে সব কি শিক্ষাই পাচ্ছিস্! পুরুষ পুরুষ—মেয়ে মেয়ে। মেয়েরা থাকবে পুরুষের অধীন—এই ত সৃষ্টির নিয়ম।"

বিজয়ের হাসিতে সুব্রত'র মুখ ভ'রে যায়। আর পরাজয়ের করুণ-গ্লানি নেমে আসে সুনন্দার সমস্ত শরীরে। সুনন্দা মাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে: "তোমার মত সে-কেলে মেয়ে মানুষ যতদিন থাকবে—ততদিন সুব্রতবাবুদেরই হ'বে জয় কিন্তু সে-দিন আর বেশী দূরে নয়, যে-দিন মেয়েদের সমকক্ষতা পুরুষরা স্বীকার করতে বাধ্য হ'বেই!"

হতাশ হ'য়ে মা ব'লে উঠেন: "নে, এখন তোর বক্তৃতা থামা!

আয় এখন চা খাবি চল। এস বাবা সুব্রত!' বলতে বলতে মা অন্দরে প্রবেশ করেন। সুব্রত ও সুনন্দা তাঁর অনুসরণ করে।

সুব্রত অতি সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষ। সুনন্দাকে সে প্রাইভেট্ পড়ায়। সুনন্দা দেখতে পরীর মত না হ'লেও তাকে সুন্দরী বলা চলে। হাল-ফ্যাসানের আধুনিকা তরুণী সে। স্কটিশ চার্চে বি-এ পড়ে। বুদ্ধির দীপ্তিতে তার সমস্ত চেহারাখানা ধারালো। সুনন্দার বাবা এ্যাটর্নী—প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। মাস্টার এবং ছাত্রী যে অধ্যয়নের ফাঁকে প্রেমের পথে বহুদূর অগ্রসর হ'য়েছে, তা' বাপ মা কারও জান্‌তে বাকী নেই। সুব্রতকে জামাতারূপে পাওয়া তাঁরা সৌভাগ্য ব'লেই মনে করেন। সুনন্দাও সুব্রতকে অত্যন্ত ভালবাসে।

কিছুদিন পরের কথা। সুব্রত তার ছোট মোটরে সুনন্দাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সন্ধ্যার সময়। সুব্রত গাড়ী ছুটিয়ে দিলে গঙ্গার তীরের দিকে। কিন্তু ওদের কারও মুখে কথা নেই। বল্‌বার কথা আজ যেন ওদের সব ফুরিয়ে গেছে। তাই লোকালয় ছেড়ে ওরা এগিয়ে চলেছে নির্জনতার দিকে। অবশেষে গঙ্গার তীরে একটা নির্জন জায়গা দেখে সুব্রত মোটার থামিয়ে দিলে। ওরা দুজন নেমে চুপচাপ এগিয়ে চল্‌লো জলের দিকে। জলের কাছাকাছি গিয়ে দুজনে পাশাপাশি ব'সে পড়ল। আকাশে চাঁদ ছিল পরিপূর্ণ কিন্তু মিলের ধোঁয়া আর কালিতে জ্যোৎস্নার কি দুর্দশা! রোগীর মুখে পাণ্ডুর হাসির মতই এ জ্যোৎস্না নিস্প্রভ, তীক্ষ্ণতাহীন। সুনন্দাই প্রথম এই অস্বাভাবিক মৌনতা ভংগ করে।

'আচ্ছা সুব্রতদা, তুমি আজ আমার একটা কথার সোজা উত্তর দেবে?'

'কি বল?' সুব্রত'র গলা গম্ভীর ঔদাসীন্যে ভরা।

'তোমার এই ঔদাসীন্যের আমি কোন মানে খুঁজে পাই না। তুমি ত আমায় কতদিন বলেছো, তুমি আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসো। আর আজ যখন আমার বাপ মার দিক থেকে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব চল্‌ছে—তুমি তা নির্বিঘ্নে এড়িয়ে চল্‌বার মতলব কর্‌ছো। তোমার ভালবাসা কি তবে ভাণ?' সুনন্দার অনুযোগপূর্ণ তিরস্কার সুব্রতকে ব্যথিত ক'রে তোলে।

'না, সু, আমার ভালবাসা ভাণ নয়—ছলনা নয়—আমি তোমায় সত্যই ভালবাসি—জগতে আর কাউকে এত ভালবাসি না—আমার নিজেকেও নয়। আজ তোমাকে একটা কথা বল্‌ব সুনন্দা—তুমি আমার কাহিনী শোনার জন্য অনেকদিন ঔৎসুক্য দেখিয়েছো। আজ তোমাকে আমার কাহিনী শোনাব—আমার বিষাদ-করুণ স্মৃতি—'

সুব্রত'র কথা শেষ হয় না। সুনন্দা ভেঙে পড়ে, 'না, সুব্রতদা, তোমার কাহিনী আমি শুন্‌তে চাইনে। তুমি যেন আজ তুমিতে নেই—তোমার এই আকস্মিক ভাবান্তরে আমার ভয় হ'চ্ছে সুব্রতদা।'

'ভয়ের কিছুই নেই সু। কিন্তু আমার কাহিনী আজ তোমাকে শুন্‌তেই হ'বে। তাইত তোমাকে আজ এমন সময়ে এখানে নিয়ে আসা। যে বিষাদের চিহ্ন এতদিন আমার মুখে চোখে দেখেছো—আজকের কাহিনী শুন্‌লেই তার কারণ বুঝতে পারবে। নারীজাতি যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে না—আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসের মূলেও এই কাহিনী। আমার জীবনে যার এত প্রভাব তুমি সেই কাহিনী শুন্‌বে না, সুনন্দা?'

অপর পক্ষের আগ্রহ যাচাই করার জন্য সুব্রত একটু থামে। কিন্তু সুনন্দার মুখে কথা নেই—সে পাথর-শীতল হ'য়ে ব'সে আছে। অগত্যা সুব্রত এগিয়ে চলে, 'তোমাকে বিয়ে করার সম্মতি কেন দিচ্ছি না—

সে-কথা তুলে' এই মাত্র অনুযোগ জানালে। জানি তোমার অনুযোগ অন্যায় নয়। তুমি আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসো—আমি তা' জানি। তোমার মত মেয়েকে বিয়ে করার সৌভাগ্য ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তার মানে এই নয় যে তোমায় আমি ভালবাসি না—বরং উল্টো। তোমায় আমি এত ভালবাসি যে তোমায় বিয়ে কর্‌তে পারি না!—যুক্তি?—যুক্তি আমার একটা নিশ্চয়ই আছে। শুন্‌বে? শোন তবে—তোমাকে আজ একটা নতুন কথা শোনাব। কথাটি শুনে তুমি কিন্তু রাগ ক'রোনা! তোমরা আমাকে অবিবাহিত ব'লে জানো—কিন্তু আমি বিবাহিত।'

সুনন্দার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। 'ওঃ, বুঝেছি—তুমি তবে ভদ্রবেশধারী শয়তান! এতদিন পর্যন্ত আমাদের সংগে শঠতা। একটি কুমারী মেয়ের অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছিলে— তুমি নীচ, তুমি ঘৃণ্য! শিক্ষিত লোকের কীর্তিই বটে!' সুনন্দার কণ্ঠে ঘৃণা ও বিদ্রূপ স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠে! 'এই ত তুমি রাগ কর্‌লে! বিবাহিত বল্‌লে তোমাদের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে— সে ছবিতে থাকে একটি শাঁখা-সিঁদুর পরা স্ত্রী—আর দু'একটি ছেলেমেয়ে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমি দিব্যি করে বল্‌ছি, এর একটিও আমার নেই— না স্ত্রী, না পুত্রকন্যা। তোমার সংগে যখন আমার প্রথম আলাপ হয়— তখন আমি এই পৃথিবীতে একা—মৃতদার!'

সুব্রত'র কথা শুনে' সুনন্দার বুক থেকে যেন একটা গুরুভার পাষাণ নেমে যায়। সে একটা আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। সুব্রত ব'লে চলে—'আমার নিঃসংগ জীবনে তুমি এসে দেখা দিলে। তোমাকে দেখে মনে হ'ল আমার রমলার অভাব তুমি পূর্ণ কর্‌তে পার্‌বে। ওঃ, তোমাকে বল্‌তে ভুলে' গেছি—আমার স্ত্রীর নাম ছিল রমলা। তোমাকে

নিয়ে নতুন করে সংসার গড়্‌ব—এই ছিল আমার মনস্কামনা। তাই রমলার অস্তিত্বের কথা, ঘুণাক্ষরেও তোমাকে জান্‌তে দিইনি—কি জানি তার কথা শুনে' তুমি যদি আমার উপর বিরূপ হয়ে ওঠো। কিন্তু আজ তোমাকে সব জানাতে হ'ল—কারণ মনের সংগে অনেক লড়াই ক'রে দেখ্‌লাম—আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—আর পারি না। দেখ্‌লাম কাউকে বিয়ে করে সুখী হ'বার ক্ষমতা আর আমার নেই। এই তরুণ বয়সে রমলার সংগে সংগে আমার সব চলে গেছে। রমলা চলে গেছে বটে কিন্তু যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সে আমার জন্য সঞ্চিত করে রেখে গেছে তাতে আমার সমস্ত জীবন বিষাক্ত হ'য়ে গেছে।' বল্‌তে বল্‌তে সুব্রতর গলা ধরে গেল। সুব্রত'র প্রতি সহানুভূতিতে সুনন্দার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বুঝ্‌তে পার্‌ল সুব্রত কত অসহায়, কত রিক্ত! সে নীরবে সুব্রতর একটা হাত তার কোলের মধ্যে টেনে নিল।

'অনেক আশা—অনেক ভরসা নিয়ে আমি রমলাকে বিয়ে করে-ছিলাম। ওকে আমি ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্ন আমি দেখ্‌তাম। ওকে নিয়ে একটা সুখের নীড়—একটা কল্প-জগৎ গ'ড়ে তুল্‌ব—এই ছিল আমার কল্পনা। আমার কল্পনা সফলও হ'য়েছিল—তাকে আমার সংগিনীরূপেই পেয়েছিলাম। আমি অধ্যাপনা করতাম আর বাকী সময়টা আমাদের দুজনের কেটে যেত যেন ঠিক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। আমাদের দুজনকে নিয়েই ছিল আমাদের জগৎ—এমনি ক'রে একটি বছর কেটে গেলো—তারপর হঠাৎ আমরা একদিন সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লাম। আমরা দু'জনেই জান্‌তে পারলাম যে, আমাদের আর একটি নতুন অতিথি আস্‌ছে। তার আগমন সংবাদ রমলার সারা দেহে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল। রমলা মা হ'বে ভেবে আমার সর্বাংগে একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। উঃ,

কি আনন্দ! আর রমলা? সে যেন আনন্দে কাণায় কাণায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো—ফুলের আগমনে গাছের মতন তার সর্বাংগে সৌন্দর্যের বান ডেকে গেলো। শিশুর জননী হ'বে সে! অনাগত শিশুটির জন্য রমলার কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা! সে যেন দিন গুণে ব'সে থাক্‌তো তার আসার পথের দিকে চেয়ে। কত রাত জেগে সেই অনাগত শিশুটির গল্প আমাকে শোনাতো। খোকার ভবিষ্যৎ নিয়ে ওর কি অসম্ভব জল্পনা কল্পনা! খোকা বড় হ'লে বিলেত যাবে—একটা মানুষের মত মানুষ হ'বে—আরও কত কি! হায়রে মানুষের অন্ধ কল্পনা!' বল্‌তে বল্‌তে সুব্রতর চোখে জল দেখা দেয়।

'সুব্রতদা', সুনন্দা ব্যথিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তোমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। থাক্‌, তোমাকে আর বল্‌তে হ'বে না। কি হ'বে লুপ্ত অতীতের স্মৃতি ঘেঁটে?'

'না, সু, আমাকে যে বলতেই হ'বে। নইলে তোমার কাছে আমি ক্ষমা পাবো কি ক'রে? তারপর একদিন সেই অনাগত শিশুর ভূমিষ্ঠ হ'বার ক্ষণ এসে উপস্থিত হ'ল। উঃ, সেদিনের স্মৃতি আজও আমার চোখের সাম্‌নে জ্বল্‌ জ্বল্‌ কর্‌ছে। ভোরের দিকে রমলার প্রসব-বেদনা উঠ্‌ল—ওঃ, মাতৃত্বের কি অসহ্য যন্ত্রনা! রমলার সেই অসহায় কাতর চীৎকার আজও আমার কাণে বাজছে! একেই তোমরা বল মাতৃত্ব—বিধাতার শ্রেষ্ঠদান! যাক্‌, আমি সর্বক্ষণ রমলার কাছেই বসেছিলাম—এত যে যন্ত্রণা—তবু সে-কি খোকার কথা ভোলে! তারই ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে খোকার কথা বল্‌ছিল। দুপুরের দিকে হঠাৎ রমলা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়্‌লো। তখনই লেডি ডাক্তার আনা হল কিন্তু ফল কিছু হলো না। রমলা চিরদিনের মত পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। তার খোকা আর ভূমিষ্ঠ হ'ল না। মায়ের সংগে

সংগে সেও চ'লে গেল অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। রমলার জীবনের যত সাধ, যত আকাংখা সব অপূর্ণ রয়ে গেল।'

'সুব্রতদা আর নয়—তুমি বড় ব্যথা পাচ্ছ।'—সুনন্দার গলায় নারী-সুলভ স্নেহমাখা কাকুতি।

'না, সু, আমায় বাকীটুকু বল্‌তে দাও। রমলার সেই প্রসব-বেদনা আমার জীবনকে নতুনভাবে গড়ে রেখে গেছে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি পুরুষের সংগে সমকক্ষতা দাবী কর্‌বার পথে মাতৃত্বই নারীর সব চেয়ে বড় বাধা। রমলার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? রমলার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার প্রলয়ংকর ভালবাসা—তাই বিয়ে আমি কর্‌ব না। আমরা পুরুষরা খেলার ছলে মেয়েদের ঘাড়ে মাতৃত্বের যে বোঝা চাপাই তাতে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘট্‌তে পারে। আমি তোমাকে দূর থেকেই চিরকাল ভালবাসবো। ভালবাসার প্রতিদান চেয়ে তোমার মৃত্যু ঘটাতে পার্‌ব না। আমায় ভুল বুঝোনা সু—'

সুব্রতর বলা শেষ হয়।

সুনন্দার গাল বেয়ে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কুকুর ও মানুষ

রাখালদাস চক্রবর্তী

রাখালদাস চক্রবর্তী: জন্ম—তেরশ' বাইশ সালে ময়মনসিংহ জেলায়। পৈতৃক বাসস্থান পালড়া গ্রামে। ছাত্রজীবন—নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ। এঁর প্রথম রচিত কবিতার বই 'রুদ্র' ও প্রবন্ধের বই 'জন-সাহিত্য'। বর্তমানে 'চয়নিকা' মাসিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এবং ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাস্টবিনটার ধারে রোজ দেখি কুকুরটাকে—কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ধার দিয়ে কতলোক হেঁটে যাচ্ছে আসছে, তার সেদিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ হয়তো ঘাড়টা তুলে শূন্যে কি যেন কামড় দিতে যায়। বোধ হয়, একটা পোকার সন্ধানে তার এই নিষ্ফল প্রয়াস। ডাস্টবিনে আশে-পাশের বাড়ী থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত, মাছের কাঁটা ফেলে দিয়ে আসে, কুকুরটা তাই আপন মনে খেতে চায়। অংশীদারও কোন কোন দিন জুটে। তখন সে লেজ গুটিয়ে প্রবলের দিকে হতাশের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নবাগতটী তাকে তাড়া করে আসে, সে একটা বিশ্রী রকমের শব্দ করে দূরে সরে যায়। পথচারীর সাথে একটু হয়তো ছোঁয়া লাগে। পথচারী তাকে একটা লাথি মেরে চলে যায়। আবার একটা আর্তনাদ করে সে অন্যদিকে সরে যায়।

কুকুরটার সারা গায় ঘা। দেহের কোন জায়গায় একটাও লোম চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে শুধু ক্ষত আর পোকা মাছি, একটা দুর্গন্ধও নাকে আসে। কুকুরটা বুঝতে পারে তার এই দৈন্য। কাজেই যায়না সে মানুষের পাড়ার ভিতর। এখানেই এই রাস্তাটায় শুয়ে থাকে। অতীত দিনের দু'একটা স্মৃতিও মনে পড়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে নিমীলিত চোখ মেলে একটু আশে পাশে চায়; নিরাশ হয়ে আবার চোখ বুঁজে ঘুমুতে থাকে।

কুকুর ও মানুষ

তার মা ছিলো ওই সাম্‌নের লাল বাড়ীটার একজন বাসিন্দা। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাকে নিয়ে কত খেলাই না করেছে! আদর করে বিলিতি কুকুরের মতো গলায় চামড়ার বক্‌লস্ এঁটে দিয়েছে, আদর করে বিলিতি নাম দিয়েছে। তারপর যখন বুঝা গেলো তার বাচ্ছা হবে, তখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ভিতর বেজায় সমারোহ লেগে গেলো, তাদের মাঝে ভাগাভাগি হয়ে গেলো কে কোন বাচ্ছাটি নেবে। তার আদর যত্ন বেড়ে চল্‌লো তার দুধের বরাদ্দ হয়ে গেলো, মাছের ভাগটা আরো বেড়ে গেলো।

তার বাচ্ছা হলো—চারটি নয়, পাঁচটি নয়, একটি। ছেলেমেয়েদের মনটা প্রথমে নিরুৎসাহ হয়ে গেলেও শেষে সেই একটা বাচ্ছার উপরই তাদের আদর-যত্ন ঢেলে দিলো। সেই বাচ্ছাটাই আজ ডাস্টবিনের ধারে শুয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের আদর যত্নের পরেও তার শরীরে একটু একটু করে ঘা দেখা দিলো। প্রথমে কাণ, ঘাড়, ক্রমে সারা শরীর ক্ষতে ভরে গেলো। বাড়ীর গিন্নী হুকুম কর্‌লেন, "ঠেঙিয়ে বের করে দে পেত্নীটাকে।" প্রথমটায় সে বুঝ্‌তে পারেনি। তারপর চাকরের লাঠির কঠিন আঘাতে তার বোধগম্য হলো। সেই থেকে সে বেরিয়েছে পথে, আর কোনদিন ভুলেও যায়নি ওই ঘরের পানে।

রাস্তার ধারেই একটা লোক বসে আছে, ডাস্টবিনটার কিছু দূরেই তার আস্তানা গেড়ে। ফুটপাথ দিয়ে লোক যায়, সে তার হাত তুলে বলে, "একটা আধ্‌লা দিয়ে যান বাবু। আপনার ভাল হবে, ভগবান আপনাকে সুখী কর্‌বে"—মুখস্থ করা একঘেঁয়ে গৎ। বাবুরা নাক সিঁটকে একটু তফাৎ দিয়ে চলে যান।

ভিক্ষুকটার সারা অঙ্গে কুৎসিৎ ব্যাধির নির্দয় প্রকাশ। সে বোঝে

তার এই দৈন্য। তাই পাড়ার ভিতর যেতে তার বেজায় ভয়। দূর-দূর করে তাকে তাড়িয়ে দেয়, বুঝে না তার কষ্ট। যখন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারে না তখন ডাস্টবিন থেকে ভাতগুলি কুড়িয়ে নেয়, কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেয়। বাঁচবার জন্য তার এই যুদ্ধ শুধু কুকুরটার সাথেই।

গলিত কুষ্ঠে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়ে গেছে। পায়ে হাতে ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতগুলি বেঁধে রেখেছে। হাতের, পায়ের আঙুলগুলি একটি একটি করে খসে পড়েছে, তবু রোগের দৌরাত্ম্য কমেনি। হাট্‌তে পারে না সে, পায়ে ব্যথা। ধর্‌তে পারে না কিছু ভালো করে, হাত হয়ে গেছে নুলো। ফুটপাথের ধারটায় সে বসে থাকে। সাম্‌নে একটা হাতল-ভাঙা টিনের মগে জল। ভিক্ষার জন্য চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে গলা শুকিয়ে গেলে তাই পান করে তৃষ্ণা মেটায়।

একটা বিশাল মোটর কাঁদা ছিটিয়ে সুমুখ দিয়ে চলে যায়। ভিতরে কয়েকটি ছেলেমেয়ে কি একটা কথায় খিল্‌ খিল্‌ করে হাস্‌তে থাকে ; শুনে লোকটার মাথা গরম হয়ে যায়। ভাবে, সুস্থ সবল দেহ নিয়ে তোমরা মোটর হাঁকিয়ে চল্‌বে, কেন ? দু'পা হাট্‌তে তোমাদের কোন কষ্ট নেই। তবু তোমাদের গাড়ী চাই। অর্থ নিয়ে এত ছিনিমিনি তোমরা খেল কিসের অধিকারে ? তোমরা বড় চাকুরে, তোমরা জমিদার, তোমরা কল কারখানার মালিক। কি নিয়ে তোমরা এত বড় হলে ? আমার মত শত শত গরীব-দুঃখী যারা ক্ষুধায় পায় না অন্ন, রোগে পায় না সান্ত্বনা, বিপদে পায় না কারো সহায়তা, তাদেরই জীবনের উপর, তাদেরই মনুষ্যত্বকে দলন করে তোমাদের এই প্রাচুর্য। কেন তোমরা ভোগ কর্‌বে অহেতুক ঐসব আড়ম্বর ? তোমাদের মোটরের তলায় মর্‌ছে কত ভিক্ষুক, তোমাদের বিলাসের উপকরণ যোগাতে

কুকুর ও মানুষ

কত অসংখ্য ভিটে বাড়ী উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, তবু তোমরা চোখ নামিয়ে দেখনি তাদের। কেন—কিসের এই দাম্ভিকতা? জোর করে টেনে আন্‌বো তোমাদের এই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ থেকে পথের ধূলার ভিতর। তোমাদের মোটর দেবো ভেঙে, তোমাদের বিলাস-প্রাসাদ দেবো চূর্ণ করে।

উত্তেজনায় গায়ের জোরে একটা কিল বসিয়ে দেয় ফুটপাথের বুকের উপর। দগ্‌দগে ঘায়ে আঘাত লেগে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে। কীটগুলি কিল্‌বিল্‌ করে উঠে। যন্ত্রনায় পাগল হয়ে শুধু চেঁচায়। তারপর অবসন্ন হয়ে পড়ে। খানিক পরে আবার সুরু করে, "একটা আধ্‌লা দিয়ে যান্ বাবু, এই অক্ষম আতুরকে।"

দাম্পত্য

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জন্ম— উনিশ শ' ষোল সালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সদরদী গ্রামে। ছাত্রজীবন— ভাঙা, ফরিদপুর ও কলিকাতায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণু ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় এঁর 'জোনাকি' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

কুলকুচো করতে গিয়ে আজ আবার একটা দাঁত পড়ল সৌদামিনীর। বাকি রইল আর তিনটে ডান পাশের মাড়ীর দিকে। অভ্যাস মত দাঁত তিনটির ওপর সস্নেহে আর একবার সৌদামিনী জিভ্ বুলাল, তিনটির গোড়াই ঢিলে হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। যাক্ গেলে আপদ যায় একেবারে। একদিন দু'দিন নয় আজ তিন বছর যাবৎ শশধরকে বলে বলে সৌদামিনী হায়রাণ্ হয়ে গেছে, দাঁত আজকাল কে না বাঁধায়। অনেকে ত রীতিমত শক্ত দাঁত পর্যন্ত তুলে ফেলে দাঁত বাঁধিয়ে আসে সুন্দর দেখাবে বলে। কিন্তু সে ত আর সখের জন্য দাঁত বাঁধাতে চাইছে না, সাধ আহ্লাদের আশা বিয়ের পর থেকেই সে বিসর্জন দিয়েছে। সখের জন্য নয়, এক ফোঁটা পান পর্যন্ত ভাল করে খেতে পারে না সৌদামিনী। আর তা ছাড়া শশধরের যেখানে একটা কি দুটো দাঁত মাত্র পড়েছে সেখানে ঝরঝর করে সবগুলো দাঁতই তার পড়ে গেল। একি ভাল দেখায়? যে দেখে সেই হাসে, শশধরের চেয়ে দ্বিগুণ বুড়ো দেখায় সৌদামিনীকে। অথচ বয়স তার এখনও চল্লিশ পেরোয়নি, শশধরের যদিও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

আজও সৌদামিনী একবার দেখে চেষ্টা করে, কিন্তু কোন যুক্তি তর্কেই শশধর কান দেয় না। পরের গায়ে ব্যথা তাতে শশধরের

কি। হেসে বলে, 'আমার দাঁত পড়ছেনা এই ত তোমার দুঃখের কারণ বড়বউ। তা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর ধৈর্য ধরে, আমিও তোমার সমান হব।'

রাগ সৌদামিনী প্রকাশ হতে দেয় না। বরং আরও মোলায়েম আরও করুণভাবে মিনতি করে বলে, 'কিন্তু সত্যিই বড় বিশ্রী দেখায় লোকে কি ভাবে বল দেখি?'

এর উত্তরে শশধর বলে, 'লোকের ভাবা-ভাবি দেখা-দেখিতে কি এসে যায় বড়বউ? আমি ত এখনও তোমাকে সুন্দর দেখি, আর লোকে বুড়ি বল্‌লেই কি তুমি বুড়ি হয়ে গেলে? আমার নিজের ত একটা হিসাব আছে, আমি ত জানি তুমি আমার চেয়ে দশ বার বছরের ছোট। কেবল চব্বিশ ঘণ্টা পান খেয়ে খেয়েই না অকালে তোমার দাঁতগুলি গেল।'

সৌদামিনীর আর সহ্য হয় না। 'পান খেয়ে খেয়ে? তোমার সংসারে একটার বেশী দুটো পান কোনদিন জুটেছে নাকি কপালে? সেই ভাগ্য নিয়েই এসেছি কিনা, বেরিবেরি হওয়ার পর থেকেইত দাঁতগুলি গেল এভাবে। কিন্তু তোমার এত আপত্তিই বা কিসে শুনি? কোন দিন সোনা গয়না ত তোমার কাছে চাইনি, আর চাইবও না কোন দিন। দাঁত বাঁধাতে তোমার লাখ খানেক টাকা লাগ্‌লে না আর।'

শশধরেরও আর সহ্য হয় না, দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'একপয়সা লাগুক না কেন, তাই বা আসে কোত্থেকে! গরীবের ওসব ঘোড়ারোগ পোষাবে না। বক্‌-বক্ কর না যাও।'

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি সরে আসে শশধরের হাতের কাছ থেকে, বিশ্বাস কি দু' এক ঘা বসিয়ে দিলেই হ'ল। মাত্র এই ক'বছর

যাবৎ শশধর গায়ে হাত তোলে না সৌদামিনীর, আগে এমন দিন খুব কমই যেত, যেদিন স্বামীর লাথি চড় পড়ত না তার পিঠে। সৌদামিনী সরে আসে কিন্তু যায় না একেবারে। খিঁচাবার মত দাঁত এখন আর তার নেই, কিন্তু রাগে সেকথা তার মনে থাকে না। অভ্যাস মত ভেংচি কাটতে গিয়ে দন্তহীন কালো আর উঁচু মাড়ীর খানিকটা বেরিয়ে আসে, কুৎসিত ভংগিতে হাত নাচাতে নাচাতে বলে, 'তাত জানিই, আমি ত কেবল বক্-বক্ই করি, যার কথা গুড়ের মত মিষ্টি—'

শশধর বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলে, 'চুপ-চুপ।'

তার যৌবনের এই একটি দিনের অসংযমের কাহিনীই সৌদামিনীর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সে জানে এই দিনটির লজ্জাকর স্মৃতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে চায়, ভুলে যেতে চায়। কেন-না কৃপণ বলে একটু দুর্ণাম থাকলেও সমাজে তার সচ্চরিত্রতাকে সকলে সম্মান করে। দরিদ্র হয়েও, সকলের এই শ্রদ্ধা আর সম্মানের বলেই মোড়লী পেয়েছে সে গ্রামের পরামাণিক সমাজে। সামান্য অসংযমের জন্য সমাজের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীপুরুষকে নির্মমভাবে সে শাস্তি দিয়েছে। আর শাস্তি যত কঠিন হয়েছে সমাজের শ্রদ্ধাও সে তত বেশী করে পেয়েছে। সে ঘটনার সাক্ষী কাছে-ধারে কেউ আর নেই শুধু সৌদামিনী ছাড়া। গোকুল ধোপা এ গ্রাম থেকে উঠে গেছে। পাড়ার আর যারা জানত তাদের অনেকেই আর বেঁচে নেই, যারা আছে তাদের কারোর-ই আর এখন সাহস হবে না সে সব কথা তুলতে। কিন্তু শশধরের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন এখন ঘর সামলান। শশধর নরম হয়ে বলে, 'আহা-হা, চুপ কর্ বড়বউ, চুপ কর্, তোর দাঁত গেছে কিন্তু দাঁতের বিষ যায় নি।'

'এ বিষ যাবেও না, যতদিন দাঁত বাঁধিয়ে না দিবি।'

শশধর জানে এই দাঁত বাঁধাবার খেয়াল কোত্থেকে এসেছে সৌদামিনীর। বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সেজো গিন্নি নাকি দাঁত বাঁধিয়ে এসেছে কলকাতায় গিয়ে। চমৎকার দেখতে! মুক্তোর মত সুন্দর ছোট ছোট, একরকমের ঠিক বত্রিশটি দাঁত। সৌদামিনী উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে অসংখ্যবার অসংখ্য রকমে বর্ণনা করেছে সে দাঁতের। কিন্তু বড়লোকের যা মানায় গরীবের তাতে লোভ করলে কি চলে? তা ছাড়া শশধর ভেবে পায় না দাঁত বাঁধিয়ে লাভটা কি। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে করে এ সংবন্ধে সব তথ্যই সে সংগ্রহ করে নিয়েছে। পঞ্চাশ ষাট টাকা এর পিছনে খরচ করলেও দাম এর শেষে কাণা-কড়িও থাকে না। এমন জিনিয নয় যে একজনের ব্যবহারের পর আর একজন ব্যবহার করতে পারে কি বিপদে-আপদে বন্ধক বা বিক্রি করা যায়। খরচ যতই হোক না কেন এক পয়সা দিয়েও এ জিনিষ শেষে রাখে না কেউ, তার চেয়ে বরং এ টাকা দিয়ে সংসারের দু' চারখানা আসবাব পত্র কিনলে তা কাজে লাগে। এ সব কথা সৌদামিনী বোঝে না কেন? অবুঝের মত কি যে তার একগুঁয়েমি। এখন যদি দু'পয়সা সঞ্চয় করতে পারে তা ত ছেলেমেয়ের জন্যই থাকবে। একটি মাত্র ত ছেলে। যে দিনকাল আর যা ছেলের আয় তাতে কিছু রেখে না গেলে সে চালাবেই বা কি করে। পাঁচুরিয়ার মাইনর স্কুলে মাস্টারী করে কতই বা সে পায়। পঁচিশ টাকা লেখে পায় ত সতের টাকা। জাতব্যবসা করে এর চেয়ে ডবল আয় করে শশধর। আর এত টাকা-পয়সা ব্যয় করে ম্যাট্রিক পাশ করে সুবল তিন বছর যাবৎ সেই সতের টাকাই ঘষ্‌ছে। শশধরের ইচ্ছা ছিল না মোটেই ছেলেকে পড়াবার। বড় স্কুলে পড়ে ছেলের যে এই দশা

হবে তা সে আগেই জানত। পড়াশুনা করে অহংকার ছাড়া আর কি সুবলের বেড়েছে। অবশ্য এত লেখাপড়া শিখে সে আর জাত-ব্যবসা করতে পারে না শশধরের মত। কিন্তু তাই বলে বাপের ব্যবসাকে এমন ঘৃণার চক্ষে দেখাই কি তার উচিত! আর আজকাল ছেলেদের চক্ষুলজ্জা বলে যদি কোন জিনিষ থাকে। চাকরি পেয়েই বউ নিয়ে চলে গেল পাঁচুরিয়া। রেঁধে খেতে নাকি তার কষ্ট হয়। গরীবের এত বাবু হলে চলে? যাক্ যাতে সে সুখী হয় তাই সে করুক।

এদিকে শশধরের ব্যবহারে আজ আবার নতুন করে পুরনো দাঁত-গুলির শোক জেগে উঠ্‌ল সৌদামিনীর মনে। শুধু দাঁতের দুঃখই নয়, মনে হল সারা জীবনই তার দুঃখে দুঃখে কেটেছে শশধরের হাতে পড়ে। যত গরীবই হোক না কেন প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু ভাল কাপড়-চোপড় আর দু' একখানা গহনাপত্র দিতে পারে স্ত্রীকে। এটা ওটা আব্‌দার প্রত্যেক স্বামীই রেখে থাকে। কিন্তু গালাগালি আর কিল-চড় ছাড়া আর কি দিয়েছে শশধর সৌদামিনীকে? না, দাঁত বাঁধাবার কথা কোনদিন সে আর বলবে না শশধরের কাছে। বলে কোন লাভ নেই। শশধর যে কোন দিনই রাজী হবে না তা সৌদামিনী ভাল করেই জানে। তার চেয়ে সুবল বাড়ী আস্‌ছে কাল গরমের ছুটিতে তার কাছেই একবার বলে দেখবে। টাকা? টাকা সুবলের লাগবে না। দাঁত বাঁধাবার টাকা সৌদামিনী চার আট আনা করে ইতিমধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। সুবল শুধু কলকাতায় তাকে নিয়ে যাবে দাঁত বাঁধিয়ে আনবে। কল্‌কাতা! আনন্দে রোমাঞ্চ হল সৌদামিনীর। কি চমৎকার, কি সুন্দর জায়গাই না কল্‌কাতা, বাঁড়ুয্যেদের সেজগিন্নীর কাছে কত গল্পই না শুনেছে সৌদামিনী। কত রকমের আলো, গাড়ী ঘোড়া লোকজন সে এক আজবপুরী! তারপর যাদুঘর আর চিড়িয়াখানা

যাতে দুনিয়ার সব রকমের জন্তু-জানোয়ার পুরে রাখা হয়েছে। এই উপলক্ষে সবই সৌদামিনীর দেখা হয়ে যাবে।

পরদিন দুপুরের কিছু আগে সুবল আর নির্মলা এসে পৌছল নৌকা করে। সৌদামিনী ওদের উঠিয়ে আনতে গেল ঘাটে। চমৎকার একখানা শাড়ী পরেছে নির্মলা, রামধনু রঙের; সত্যিই বেশ মানিয়েছে নির্মলাকে। কিন্তু এ শাড়ী ত ওর ছিল না। সুবল বোধ হয় কিছুদিন আগে ওকে কিনে দিয়েছে। ওখানকার বাজারে নাকি নানা রকমের ভাল ভাল শাড়ী পাওয়া যায় আর খুব সস্তাও। বেশ, বেশ, ছেলে বউ সুখে থাকলেই ভাল। সৌদামিনীর কি আর রঙীন শাড়ী পরবার বয়স আছে?

নৌকা থেকে নেমে দুজনেই এক সংগে প্রণাম করলে সৌদামিনীকে। তাড়াতাড়িতে সুবল আর নির্মলার হাত হাত লেগে গেল একটু তা তিনজনের কারোরই লক্ষ্য এড়াল না।

সুবল বল্‌ল, 'ভাল আছ ত মা?'

নির্মলা যেন প্রতিধ্বনি কর্‌ল, 'মা ভাল আছেন ত?'

সৌদামিনী লক্ষ না করে পারল না, কথা ওরা তার সংগেই বল্‌ছে কিন্তু চোখ ওদের তার দিকে নয়, পরস্পরের দিকে।

সৌদামিনী বল্‌ল, 'আমাদের একরকম থাকলেই হ'ল। সুবল তুই আগে আগে যা। বউমা এস আমার সংগে। আর একটা কথা মনে রেখ বউমা, টাউন-বন্দরে যাই কর না এটা পাড়া-গাঁ। ঘাটপথ বেছে না চল্‌লে লোকে নিন্দা করবে।'

নির্মলা একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবশ্য কারণ সে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল কিন্তু কোন জবাব দিল না।

টুক্‌টাক জিনিষপত্র যা ছিল মাঝি নিয়ে এল মাথায় করে। শশধর

হুঁকো টানা রেখে মাঝির মাথা থেকে সব একটা একটা করে রাখতে লাগল। সুবল ধরতে এসেছিল কিন্তু শশধর বাধ্য হয়ে বলল, 'না, না তোর আসতে হবে না, তুই বস গিয়ে ওখানে, আমিই নামিয়ে নিচ্ছি। তুই ততক্ষণ জামা খুলে বিশ্রাম কর।' একটা কাপড়ের পুঁটলি, একটা ছোট ট্রাঙ্ক, তারপরে একটা ভারী কাঠের বাক্স নামাতে নামাতে শশধর জিগ্যেস করল, 'এর মধ্যে কিরে সুব্লা?'

সুবল ঠিক্ এই আশংকাই করছিল, 'ও কিছু নয়, একটা ভাঙা হারমোনিয়ম!'

'হারমোনিয়ম! পেলি কোথায়?'

'কিনেছি আমাদের সেক্রেটারী বীরেন বাবুর কাছ থেকে। খুব সস্তাতেই পাওয়া গেছে বাবা। দশটাকা! আর ক্রমে ক্রমে দিলেই চল্‌বে।'

'কিন্তু দিতে ত হবেই! এ সব বাজে জিনিষ কিন্‌তে কে বল্‌ল তোকে? বউমার পরামর্শ বুঝি? হুঁ, মাথায় চুল নেই ত টেরীর ঘটা! মাইনে ত পাস সতের টাকা কিন্তু বাবুগিরি আছে লাট সাহেবের মত!'

সুবল কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর শশধর জিজ্ঞাসা করল সৌদামিনীকে, 'সুবল কোথায়?'

সৌদামিনী একটু অর্থপূর্ণভাবে হেসে বল্‌ল, 'কোথায় আবার?'

শশধরও হেসে জবাব দিল, 'আজকালকার ছেলে। ভালকথা, ছেলে ত বড়লোক হয়ে এসেছে চাকরী করে। দাঁত বাঁধাবার কথাটা তার কাছেই একবার বলে দেখ না?'

সৌদামিনী একটু চমকে উঠ্‌ল প্রথমটা। মনের কথা কি করে টের পেল শশধর?

শশধর আবার একটু হাসল। বেশ যেন কৌতুক বোধ করছে সে। বল্ল, 'বুঝলে আমার সামনেই আজ বল কথাটা সন্ধ্যাবেলায়। চাকুরে ছেলে, বিদ্বান ছেলে কি বলে একবার দেখি!"

ছেলে কি বলে তা শোনবার লোভ সৌদামিনীরও কম নয়।

সন্ধ্যাবেলায় নানা কথার পর সৌদামিনী তুল্ল দাঁত বাঁধাবার কথা, 'চাক্‌রি-বাকরি ত ক' বছর করলে বাপু এখন দাঁত ক'টা আমার বাঁধিয়ে দাও। কিছু খেতে পারি না। আর যা খাই তাও কিছু হজম হয় না।'

সুবল একটু চুপ করে থেকে বল্ল, 'দাঁত ত এখানে বাঁধান যায় না মা।'

'এখানকার কথা ত বলছি না বাবা। কলকাতায় নিয়ে চল, ছুটি ত আছেই একমাস।'

'তা ত আছেই, কিন্তু কলকাতায় যাতায়াত তারপরে দাঁত বাঁধাবার খরচ সে বহু টাকার দরকার মা।'

শশধর একটু দূরে বসে বসে তামাক টানছে, একবার চোখ তুলে সৌদামিনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সৌদামিনীও একটু হাসল সেদিকে চেয়ে। তারপরে সুবলের দিকে চেয়ে বল্ল, 'তা ত দরকারই বাবা, কিন্তু এদিকে কিছুই যে খেতে পাচ্ছি না, এভাবে না খেয়ে খেয়ে ক'দিন আর বাঁচব।'

সুবল একটু ভেবে বল্ল, 'আচ্ছা, কাল থেকে সেরখানেক ক'রে দুধ রোজ করে দেব মা তোমার জন্যে। দুধে সব রকমের ভিটামিনই আছে। শুধু দুধ খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আর তা ছাড়া দাঁত বাঁধায়েও কোন শান্তি নেই মা। খাওয়ার পর প্রত্যেকবার খুলে খুলে ধুতে হবে তিরিশ দিন। আর এক উপসর্গ। কারো ফিট করে না, কারো যন্ত্রণা হয়, তার চেয়ে—'

শশধর আর একবার তামাক টানা থামিয়ে সৌদামিনীর চোখের দিকে চেয়ে হাসল।

রাত্রে শোবার সময় শশধর বল্‌ল, 'দেখলে ত? ছেলে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে।'

সৌদামিনী বল্‌ল, 'ওর আর দোষ কি, ও টাকা পাবে কোথায়? পায় ত মোটে সতের টাকা।'

'তবু বাবুগিরি দেখনা। নতুন শাড়ী, হারমোনিয়ম। আরে ইচ্ছে করলে তিনবার কলকাতায় গিয়ে তোমার দাঁত বাঁধিয়ে আন্‌তে পারি।'

সৌদামিনী বল্‌ল, 'তা ত পারই, ও কিন্তু মনে মনে ভাবে তার মত তোমারও ক্ষমতা নেই।'

'না, নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার দাঁত বাঁধিয়ে দেব আমি দেখে নিও। এক ছিলিম তামাক সেজে আন ত।'

তামাক টান্‌তে টান্‌তে একটু চুপ করে খানিকক্ষণ কান খাড়া করে থেকে শশধর বল্‌ল, 'রাত ত কম হ'ল না, ওরা কি আজ ঘুমাবে না?'

এবার সৌদামিনী অত্যন্ত লজ্জিত হ'ল। 'কি যে বল! যাই শুয়ে থাকি গিয়ে।'

শশধর বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌ল, 'না, না, শোন, বস না এখানে। আচ্ছা দাঁত বাঁধিয়ে দিলে সত্যিই তুমি খুসী হও?'

বাড়ীওয়ালা

লীলা দেবী

লীলা দেবী : জন্ম—উনিশ শ' বিশ সালে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতারা সাবডিবিসনে। পৈতৃক বাসভূমি—ঢাকা জেলার লক্ষ্মীবরদী গ্রামে। স্বামী সু-সাহিত্যিক লীলাময় দে (প্রফুল্ল দে)। শ্বশুরালয়—রাজমহলের বিখ্যাত দে মজুমদার বংশ।

ছাপাখানার কাজ। ছুটির কথা ভাববার অবসর আজ নন্দ'র নেই। রাত জেগে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ করে চলেছে। সুমুখের একটা ভাঙা টেবিলের ওপর রয়েছে একটা অপরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে আধ গ্লাস জল আর একটা পাউরুটীর আধখানা। কাজ করতে করতে পেটের খিদে যখন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, রুটীটা থেকে এক কামড় রুটী খেয়ে জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে খিদেটা একটু কমিয়ে নিয়ে আবার সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো থেকে প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলো বেছে নিয়ে সাজাচ্ছে। ভুল হচ্ছে তুলে ফেলছে আবার ঠিক করে সাজাচ্ছে।

আজ ছুটি সে ইচ্ছে করেই নেয়নি, ওভারডিউটি দিয়ে কিছু পয়সা তার পেতেই হবে আজ। কিন্তু অবসন্ন হাত দু'খানি আজ আর কাজ করতে পারছে না, প্রতিমুহূর্তে চাইছে বিশ্রাম। কিন্তু আজ তার বিশ্রাম নেবার উপায় কৈ—অক্ষরগুলো সাজাতে সাজাতে ডেস্কের ওপরেই সে ঝিমিয়ে পড়ছে। আবার তখুনি সজাগ হ'য়ে উঠে বসে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে যাচ্ছে। হাত যার কাজ করতে চাইছে না, মন যার অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছে কাজ তার এগুবে কি করে? যাক্ শেষ পর্যন্ত একঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টায় শেষ করে নন্দ যখন প্রেস থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে এসে কড়া নাড়লো তখন পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং করে বাজলো একটা।

নন্দ'র স্ত্রী লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজাটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো—আজ এত দেরী হলো যে ?

নন্দ অবসন্নকণ্ঠে উত্তর দিলো—কাজের ভিড়ে দেরী হয়ে গেলো। তারপর মণি কেমন আছে, মণি ? বলতে বলতে অবসন্ন দেহে টলতে টলতে ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো। লক্ষ্মী দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বল্‌লো—মণি আজ একটু ভালই আছে।

'বেশ' বলে নন্দ বিছানার ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

লক্ষ্মী ব্যস্ততার সংগে জিজ্ঞেস করলো—শুয়ে পড়লে যে, খাবে না ?

উত্তরে জড়িত-কণ্ঠে নন্দ বললো—হ্যাঁ, খাব একটু বিশ্রাম করে নি, মণি কোথায়, ঘুমুচ্ছে বুঝি ?

—হ্যাঁ, ওঘরে ঘুমুচ্ছে। বলেই লক্ষ্মী মণিকে দেখে আসবার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো।

মণি, এই সর্বহারা দুঃখী দম্পতির নয়নের মণি তিন বছরের শিশুসন্তান। সে আজ সাতদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। অর্থের অভাবে আজ পর্যন্ত তাকে ডাক্তার দেখানো হয়নি। ডাক্তরের 'ফি' সংগ্রহের জন্যই আজ নন্দ অবসর সময়ে কাজ করছিলো নগদ পয়সা পাবে বলে।

মণিকে দেখে লক্ষ্মী ফিরে এসে ডাকলো—চল, হাতমুখ ধুয়ে খেতে চলো। নন্দ তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীর ডাক তার কাণে গেলো না, লক্ষ্মী এগিয়ে এসে গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো—চল, খাবে চল।

নন্দ চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে উঠে বসে বললো—হ্যাঁ, চল।

স্বামীকে খাইয়ে লক্ষ্মী নিজে খাওয়া দাওয়া সেরে রান্নাঘরের কাজকর্ম শেষ করে যখন শুতে এলো তখন রাত দুটো বেজে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে স্বামীকে আজ আর লক্ষ্মীর কিছু বলা হলো না। সে ঠিক

করে রেখেছিলো স্বামী এলেই বলবে, যেমন করে হোক একমাসের বাড়ী ভাড়াটা সে যেন কালই দিয়ে দেয়, বাড়ীয়ালার কড়া কড়া কথা সে আর সহ্য করতে পারে না। বিকেলে বাড়ীয়ালা এসেছিলো তার বাকী পাঁচ মাসের বাড়ী ভাড়া চাইতে। পাশের বাড়ীর ছেলেকে দিয়ে কাল একমাসের ভাড়া দেওয়া হবে বলে তাকে বিদেয় করে দিয়ে কথার কষাঘাত থেকে সে-দিনকার মত সে রেহাই পেয়েছে। সেই যমদূতের মত লোকটা ত কাল নিশ্চয়ই আসবে টাকা চাইতে। ভাবতে ভাবতে রুগ্ন ছেলেকে বুকে আঁকড়ে লক্ষ্মী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত ঘুমের হাত থেকে যখন সে মুক্তি পেলো তখন ভোরের আলোয় মহানগরীর বুকখানা আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু নানা রকম অভাব-অনটনের ভাবনায় লক্ষ্মীর বুক উঠলো শুকিয়ে। মণির জন্য ভাবনা হয়েছিলো, কিন্তু ভগবানের কৃপায় মণি তাদের সে ভাবনা থেকে কতকটা রেহাই দিলো। আটদিনের দিন মণির জ্বর ছেড়ে গেলো, ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন আর হলো না।

কিন্তু সব চাইতে জটিল সমস্যায় এসে দাঁড়ালো নন্দ। তার কাছে এখন আছে মাত্র দশ আনা পয়সা, কাল অবসর সময়ে ছাপাখানায় কাজ করে তার পাওনা হয়েছে আড়াই টাকা—আজ সে-টাকাটা সে পাবে। দু'টো জড়িয়ে মোট তিনটাকা দু' আনা, এইত' তার পুঁজি? এর থেকে আজকে তাকে বাজার করতে হবে, ছেলেটার জন্য রাখতে হবে দুধ তার ওপর একমাসের বাড়ী ভাড়া আজ সে কেমন করে দেবে?

হাতমুখ ধুয়ে মুখে কিছু না দিয়েই সে ছুটলো ছাপাখানার মালিকের কাছে, এই ভরসায়, হাত পাতলে যদি কিছু অগ্রিম পাওয়া যায় তা'হলে একমাসের বাড়ীভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ীয়ালার হাত থেকে স্ত্রীর সম্মানটুকু রক্ষা করা যাবে।

নন্দকে দেখে ছাপাখানার মালিক অজিতবাবু অসম্ভব রকম ক্ষেপে উঠলেন। নন্দ কিছু বলবার আগেই তিনি রোষদৃপ্তকণ্ঠে বললেন—কিহে, সকাল বেলাতেই এসেছ ক'আনা পয়সার তাগাদায়! না বাপু, তোমাদের মত কাবলিয়ালা লোক নিয়ে আমার কাজ চলবে না। তোমায় আমি কাজে জবাব দিলাম, অন্যত্র তুমি তোমার পথ খুঁজে নাও। হ্যাঁ, তোমার কত পাওনা হয়েছে?—আড়াই টাকা, না? এই নাও। বলে টেবিলের ওপর থেকে দু'টো টাকা আর একটা আধুলি মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন।

নন্দ হাতজোড় করে অনুনয় করে বলতে গেলো, অজিতবাবু সমধিক রূঢ়কণ্ঠে তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন—ভাল চাওত' ঐ টাকা নিয়ে সরে পড়, তা না হ'লে দারোয়ান দিয়ে এখান থেকে বের করে দেব।

নন্দ'র আর কোন কথা বলা হলো না। ধীরে ধীরে টাকা দুটো আর আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে ছলছল চোখে মুখখানা কাচুমাচু করে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলো। রাস্তায় এসে পা আর তার চলতে চাইলো না। লক্ষ্মীর সম্মান আজ সে কি দিয়ে রক্ষা করবে? কেমন করে লক্ষ্মীর সুমুখে আজ সে মুখ তুলে গিয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে কখন যে সে বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নিজেই জানে না, তার চেতনা ফিরলো বাড়ীয়ালার কর্কশ কণ্ঠস্বরে।

নন্দকে দেখেই সে টাকার তাগাদা করলো। নন্দ অনেক করে বুঝিয়ে বললো, আর দু'টো দিন সময় চাইলো, তবু বাড়ীয়ালার কথায় কমনীয়তা এলো না—আরও উচু গলায় গালাগাল করতে লাগলো। বাড়ীয়ালার হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা দেখে লক্ষ্মীর আর সহ্য হলো না। বাইরে বেরিয়ে এসে তার শেষ সম্বল হাতের চুড়ি দু'গাছ টান মেরে খুলে বাড়ীয়ালার পানে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—এই নিন, এতেই আপনার

পাঁচমাসের বাড়ীভাড়া নিশ্চয়ই মিটে যাবে, ওদু'টো তুলে নিয়ে আপনি এখুনি এখান থেকে চলে যান, আর একমুহূর্ত'ও এখানে দাঁড়াবেন না।

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে বাড়ীয়ালা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো, চুড়ি দু'টো তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে নম্রকণ্ঠে বললো—না মা, তা'কি হয়, ও সোনা হাতের শেষ চিহ্নটুকু কি আমি কেড়ে নিতে পারি? এই নাও মা, তোমার জিনিষ তুমি ফিরিয়ে নাও। যখন তোমাদের সুবিধে হয় তখন ভাড়া মিটিও, আমি আর তোমাদের কোন কথাই বলবো না। বলতে বলতে বাড়ীয়ালার চোখে জল ভেসে উঠলো। রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লো—আমায় না জানিয়ে তোমরা কিন্তু এখান থেকে উঠে যেও না মা।

বাড়ীয়ালা চলে গেলে পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনাই অনেকক্ষণ অবাক হয়ে পথের পানে চেয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো—'যার বাইরটা এত রুক্ষ তার ভেতরটা এত কোমল হয় কি ক'রে?'

কিছুক্ষণ পরে নন্দ লক্ষ্মীর পানে মুখ তুলে বললো—জান লক্ষ্মী কারখানার কাজ থেকে আজ আমার জবাব হ'য়ে গিয়েছে।

উত্তরে লক্ষ্মী বললো—তা হয়েছে ত' কি হয়েছে, চল তুমি ভেতরে চল। ভেতরে যেতে যেতে নন্দ বললো—কাল থেকে আমাদের কি করে চলবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী নির্ভাবনায় উত্তর দিল—চলে যাবেই, গরীবের সহায় ভগবান। তুমি আবার নিশ্চয়ই কাজ পাবে।

উদাস কণ্ঠে নন্দ বলল—বড়লোক ছাপাখানার মালিক আমাকে অনায়াসেই জবাব দিল আর গরীব বাড়ীয়ালা কিন্তু তোমার হাতের চুড়ি দু'গাছা নিতে পারলো না।

উত্তরে লক্ষ্মী ছোট্ট একটী কথা বললো—তাই হয়।

জটিল

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত: জন্ম—তেরশ' ষোল সালে মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান—নদীয়া জেলার ভাজন ঘাট গ্রামে। ছাত্রজীবন—মেদিনীপুর ও বহরমপুর। এঁর রচিত কয়েকটি পুস্তক—'কাঁটা তার', 'দুনৌকায়,' 'মিছেকথা' 'প্রেম ও পাদুকা,' 'বনটিয়া' ও 'সেতু'। বর্তমানে যুগান্তরের অন্যতম সম্পাদক।

সর্বস্বান্ত হয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, তবু নিস্তার পেলাম না। বিয়ের পর মেয়ের হল হিস্টিরিয়া—যখন-তখন ফিট হয়, দু'দিন তিন দিন বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে, খায় না, নায় না। বেয়ান ঠাকরুণ গিন্নীকে অম্লমধুর ভাষায় সুখবরটি জানালেন এবং সেই সংগে এই ইংগিতও দিলেন যে যেহেতু আমরা রোগ লুকিয়ে মেয়ে চালান করেছি, মেয়ের ব্যামো ভালো করে দেবার দায় আমাদেরই—নচেৎ তিনি ছেলের আবার বিয়েও দিতে পারেন। প্রমাদ গণলাম। অপমানের কথা মেয়ে বাপের ধর্তব্য নয়, কিন্তু অর্থব্যয়টা সাধ্যাতীত, কাজেই।

মণিকে নিয়ে এলাম। হাড়সার ফ্যাকাশে মূর্তি—চোখের কোল বসা, ওপরের ঠোঁট ভরা ঘা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঠোঁটে কিরে মণি?

—ব্লটিং পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে গিয়ে পুড়ে গেছে।

—ধোঁয়া কেন?

—ফিট ছাড়াতে।

শুনে রাগ হল। পঞ্চাশ টাকার স্কুল মাস্টারের মেয়ে হলেও, একটাই

মেয়ে। যথাসম্ভব আদরেই মানুষ করেছিলাম, হাজার দুই টাকা খরচও করেছিলাম বিয়েতে। জামাইও এমন কিছু তালেবর নন, খবরের কাগজের সাব-এডিটার। চেহারাটা ভালো, আর ছেলেমানুষ, এই যা। সেই মেয়ের ওরা এমন করে খোয়ার করছে? আচ্ছা দেখে নিচ্ছি—একটা মেয়েকে ঘরে রাখতে পারি কিনা। রাগ করলাম বটে, কিন্তু প্রাইভেট টিউসানিটা ক'দিন হল খসে গেছে। এই সংসারই চলেনা। এর ওপর মেয়ের চিকিৎসাই বা করবো কি দিয়ে? আদর যত্নই বা হবে কি দিয়ে?

গিন্নী আমাকে বলতে কিছুই বাকী রাখলেন না। তাঁর মোটামুটি বক্তব্য এই যে, একটা হাড়-হাভাতের হাতে মেয়ে না দিলে এমনটি হত না। হত না তা আমিও জানি। কিন্তু ঐ হাড়-হাভাতের হাতে না দিলে, তাঁর মেয়ের যে গলায় দড়ি দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল এবং তার হয়ে তিনিও যে যথেষ্ট ওকালতী করেছিলেন, সে কথা আমি ভুলিনি। গঙ্গাসাগরে নাইতে গিয়ে গিন্নীর সংগেই সরাসরি প্রমথ'র পরিচয়—সেই পরিচয় ধীরে ধীরে কন্যার সংগে পরিণয় সূত্রে সার্থক হয়েছে। আমি তখনো ছিলাম নিঃশব্দে, এখনো নিঃশব্দেই রইলাম। মধ্যে শুধু প্রমথ'র গর্ভধারিণীর কাছে দরবার করা ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাওলাত করার সময় বার কয়েক মুখ খুলেছিলাম। তবে হ্যাঁ, প্রমথ'র ওপর আমারও টান হয়েছিল—বিশেষ করে, মণি যখন তাকে ভালবাসতো। সেই প্রমথ আজ আমার মেয়েকে এমন করে শাস্তি দিচ্ছে! ধিক কলিকালের ভালোবাসায়!

বললাম, মণি আর তোকে যেতে দোব না। থাক তুই এখানে। ও গুণ্ডটার ঘর করতে হবে না।

মণি শুধু একটু হাসলো।

তারিণী ডাক্তার দেখে শুনে বললেন, এমন কিছু নয়। তবে ছেলে-পুলে হওয়া দরকার। নইলে ফিট সারবে না।

গিন্নী আড়ালে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, মুখে আগুন! ছেলে কি গাছের ফল নাকি? আঁটকুড়ো ডাক্তার!

ডাক্তার যাবার সময় বলে গেলেন, মা, জীব দেবেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ও সব করবেন না। ভগবানের ব্যবস্থা মেনে নিন, শরীরও সারবে, মনও ভালো হবে। আপন সুখ ত পশুতেও বোঝে, পাঁচজনের জন্যেই মানুষ—এম্নি অনেক কথা, যার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।

ডাক্তার দরজা পার হতেই গিন্নী গর্জন করে উঠলেন, হ্যাঁরে কালমুখী, ঐ নির্বংশের ব্যাটা বুঝি তোকে ছাই ভস্ম ওষুধ এনে খাওয়াচ্ছে, ছেলে না হবার জন্যে? তাই বলি, মূচ্ছো কেন হবে? মুখে আগুন অমন জামাইয়ের। আসুক একবার করছি তার ব্যবস্থা।

মণি আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম, আহা কি বলছো?

—থামো, থামো, ন্যাকামো করো না। মেয়ের আমার সর্বনাশ করেছে। মাগী আবার শাসায় ছেলের বিয়ে দোব বলে—দিগে যা। তোর অমন ছেলের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়। মেয়েকে আমার ওষুধ দেয় সে!

বিরক্ত হলাম। জামাইয়ের আচরণের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হল না, তবে বুঝলাম বাবাজী একটা কিছু ঘটিয়েছেন। কিন্তু গিন্নীর উষ্মাটাও ভালো রকম বুঝলাম না।

বললাম, এসব ব্যাপার নিয়ে খিটকেল না করাই ভালো। প্রমথ আসুক, তার সংগে কথা কই—তারপর যা হয় হবে।

গিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন, কথা কইবে তুমি? খরচ হয়ে যাবে না তা'তে? কেমন করে কইতে হয়, সেটা আমিই বোঝাবো সেই আঁটকুড়ীর ব্যাটাকে!

প্রমথ এলেন।

সৌভাগ্য বশতঃ গৃহিণী জ্বরে পড়েছিলেন। নইলে হয়ত জামাইকে এমন কিছুই বলতেন, যার পরিণাম আদালত পর্যন্ত গড়াতো! ঠিক করলাম, আমিই বাবাজীকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলবো—কি ওষুধপত্র দিচ্ছে টিচ্ছে, তা যেন আর না দেয়।

হুঁকো হাতে ভেতরে এসে দেখি—না প্রমথ, না মণি! কোথায় গেল দু'জনে? খানিক খোঁজাখুঁজি করলাম। ছোট ছেলে পটলা বললে, দিদি ত জামাইবাবুর সংগে চলে গেল। এই যে আমাকে চারটে পয়সা দিয়ে গেছে।

শ্বশুর বাড়ীতে যাকে এত শাস্তি দেয়, মুখে ছ্যাঁকা দেয়, খেতে দেয় না, ছেলের অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়, অসুখে-বিসুখে না দেয় এক ফোঁটা ওষুধ, না ডাকে একটা ডাক্তার, সে বাপের বাড়ী থাকতে চায় না? কারুকে না জানিয়ে সেই শ্বশুর বাড়ীতেই পালিয়ে যায়, আর সেই স্বামীর সংগেই, যে তাকে হিস্টিরিয়া হবার ওষুধ দেয়! আশ্চর্য! কিন্তু চুপ করেই থাকি, এবারও থাকলাম।

গিন্নী শুয়ে শুয়েই গুমরাতে লাগলেন, মুখে আগুন অমন জামাইয়ের। যাও মাছের মুড়ো, ক্ষীরের প্যাঁড়া এনে দাও—কুটুম এসেছেন বাড়ীতে। খ্যাংরা মেরে দূর করতে হয়।

বললাম, আঃ কি বলছো? ওরা নেই—কারুকে না বলে ওরা দু'জনে পালিয়ে গেছে। পটলাকে চারটে পয়সা দিয়ে গেছে যাবার সময়।

—অ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।

—এই কালও আমার কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে করলে যে সোয়ামীর ! এদিকে আসবামাত্তর তার সংগেই পালালো !

—মেয়ে মানুষের স্বামীর নিন্দেয় কি বিশ্বাস করতে আছে ? ওসব আদরের নিন্দে—এই যেমন তুমি আমার নিন্দে করো, একি সত্যি ?

গিন্নী গোম হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। বোধ করি সমস্যার গুরুত্বটা ক্রমে ক্রমে তাঁর মগজে ঢুকলো।

আমি বললাম, আহা সুখে থাকে ত থাকনা বাপু।

হঠাৎ গিন্নী ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ওগো এমন সর্বনেশে মেয়েও পেটে ধরেছিলাম। কি ঘেন্না মা !

সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। তিনি বাঘের মত চোখ পাকিয়ে বললেন, কেন তুমিও আমাকে ওষুধ দাও নি, তাহলে এই শূওরের পাল জন্মাতো না, এত খিটকেলও পোয়াতে হত না।

বুঝলাম। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে, কি আর করবো ?

দুরধিগম্য

কমল দে

কমল দেঃ জন্ম—বাংলা তেরশ' বাইশ সালে বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগর গ্রামে। ছাত্রজীবন—আসানসোল, বর্ধমান ও কলিকাতা। ইনি বর্ধমান যুবসম্প্রদায়ের মুখপত্র 'অভিযানের' সম্পাদক গোষ্ঠির অন্যতম। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

সহমরণ জিনিষটার কদর্য দিক একটা ছিল হয়'ত! বেন্টিঙ্ক সাহেব এ'র বীভৎসতা লক্ষ করে এ'কে উচ্ছেদ করে দিলেন,—সমাজ তখন প্রতিবাদ জানাতে বিরত হয়নি।

সহমরণ শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধর্‌লে কিন্তু সমাজকে সবক্ষেত্রে এর স্বপক্ষে বলা চলে না। 'লেকের' জলে যারা নিছক প্রেমের জন্যই হয়ত জুড়িয়ে গেছে, তাদের জড়িয়ে সামাজিক কেলেংকারীর অবধি থাকে না। তাদের প্রেমের পংকজকে পদদলিত করে পংক বিস্তার কর্‌তে সমাজই সবিশেষ সচেষ্ট হয়। সুতরাং নর-নারীর সহমরণ সমাজের দিক থেকেও এক হিসেবে কদর্য—যদি সেটা নিতান্তই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহমরণ হয়।

তালপুকুর গ্রামের স্বনামধন্য তালপুকুরে সেদিন সকালে যখন কুণ্ডুদের স্নেহলতার শবদেহের পাশে পালেদের রাখহরির শব আবিষ্কৃত হ'ল, সারা গ্রামটাই বেতাল হয়ে গেল হঠাৎ। পিসী-মাসীর দল সলজ্জ রসনায় দশনাঘাত করে বল্‌লেন,—"ওমা! কি ঘেন্নার কথা! কালে কালে হ'ল কি?"

ঘোষেদের তরুণী নববধূ তার সখীর কাণে কাণে বললে,—"দেখ্‌লি ভাই বকুলফুল, চিনি ঠাকুরঝির কাণ্ডটা,—আর এদিকে আমাদের

কাছেও মনের কথাটা ভাঙে নাই। বিয়ে কর্‌লেই হ'ত,—মনের মানুষকে নিয়ে ঘরকর্‌ণা করত,—এমন নভেলীপনা করে মরবার কি দরকার ছিল?" বকুলফুল চুপি চুপি গানের সুরে বল্‌লে,—

"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ-সমান।"

পিছন হ'তে গঙ্গাজলও গালে হাত দিয়ে বল্‌লেন,—"কানুর পিরীতি কি জানি কি রীতি—"

পুলিশ এসে লাস দুটো সহরে চালান কর্‌লে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও পোস্ট-মর্টেমের তুল্য বিশ্বস্ত বন্ধু আর নাই। জলে ডুবে মরল না মরে জলে ডুবল, এ সংবন্ধে স্থিরনিশ্চয় হতেই হবে। তারপর সুরু হ'ল পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজনের উপর হুম্‌কি,—তদন্তের স্বরূপ নিয়ে শ্বদন্তের দংশন। রাত্রে কি খেয়েছিল হ'তে কি শাড়ী পরে শুয়েছিল ইত্যাদির পুংখানুপুংখ বিবরণ বহন করে দারোগার ডায়েরী হ'ল চমৎকার একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

একটি নর ও একটি নারীর যুগপৎ অপঘাত মৃত্যু গ্রাম্যজীবনের মন্থর প্রবাহে আবর্তের সৃষ্টি কর্‌লে বেশ একটু জটিল রকমের। পুলিশের প্রস্থানের সংগে সংগে সে আলোচনা হ'ল জটিলতর।

সিংমশায় সদ্য-মৃতার জনক'কে সংবোধন করে বল্‌লেন,—"কি হে রাসু? এই যে বল্‌ছিলে মেয়ে তোমার রাখুকে বিয়ে করতে রাজী নয়,—তার উপর আবার সেদিন খোকার মা বল্‌ছিল যে রাখুর সংগে বিয়ের ঠিক্‌ হ'লে চিনি নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। কিন্তু শ্রীমতী যে এদিকে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলেন তা কেউ জানে না। পেটে খিদে মুখে লাজ! যতসব খ্রীস্টানী ঢং—মাধু বলছিল বটে কলকাতার কলেজেপড়া মেয়েদের মধ্যে নাকি এই রোগ খুব বেশী ঢুকেছে—তা এ যে

দেখ্‌ছি তোমার মেয়েকে উপলক্ষ ক'রে আমাদের গ্রামে এসেও হানা দিলে।—"

রাসমোহনের মুখ দিয়ে কথা বের হ'ল না। তা'র উদাস সজল দৃষ্টি, দেখে মনে হয়—সে এই আকস্মিক ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না,—হঠাৎ-আসা বিপদ তা'র মগজের সব উপলব্ধিটুকুকেই যেন হটিয়ে দিয়েছে।

যদু ভট্‌চায্‌ ছাড়বার পাত্র ন'ন; রুখে এসে দাঁড়ালেন, "হেঁ হেঁ আমি বলিনি রাসু, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিও না। কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি পেলয়োংকারী। আট বছর বয়সে পাত্রস্থ করলে কোন ঝঞ্ঝাটই থাক্‌ত না—তা পোড়া ভট্‌চায্যির কথা কি আর সময় থাকতে লোকের কাণে ওঠে? উনি মনে করলেন মেয়ে ওঁর জজ বেলেস্টার হয়ে থোকা থোকা টাকা এনে দেবে। বাপ পিতামো'র কাঠামো যেদিন থেকে পাল্‌টেছে—সেদিন থেকেই আমি জানি, অঘটন একটা ঘট্‌বেই——"

মুখরোচক সমালোচনায় নিরত গ্রাম্য-প্রধানদের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে হ'ল বেলা তিনটার পর। তখন একে একে সকলেই স্বগৃহাভিমুখে পদচালনা করলেন। শুধু রাখহরির ভাই রামহরি রাসমোহনের সামনে যেয়ে বল্‌লে,—"রাসু কাকা, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে এতবড় জোয়ান ছেলেটার অপঘাত মৃত্যু ঘটালে ত?"

এতক্ষণে রাসমোহনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়্‌লো বুঝি,—সর্বহারার রিক্ততা পর্যবসিত হ'ল রুক্ষতায়—চেঁচিয়ে উঠ্‌ল ও,—"শুধু বুঝি আমার মেয়েটারই দোষ রামু? এতগুলো লোকের মুখ হ'তে সকাল থেকে হতভাগীর কুচ্ছো কেলেংকারীরই শুধু শুনে আস্‌ছি,—আবার তুইও এই অবুঝের মত......"

পরের দিন। গ্রামের হাটতলায় জটলা বসেছে, কালকের বহুদর্শী

মহাত্মারা সকলেই সমবেত হয়েছেন। সুরু হ'ল কালকের ঘটনার রোমন্থন।

এমন সময় সেখানে এলেন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মাস্টার মশায়। সকলেই অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল,—ভট্‌চায্‌ শেষ টানটা টেনেই হুঁকোটা মাস্টার মশায়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। মাস্টার মশায়ের একটা বিশেষত্ব আছে এখানে। গ্রামের ছোট বড় সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। জীবনের বেশীর ভাগই অভাবের সংগে যুদ্ধ করেছেন তিনি—গাঁয়ের মাইনর স্কুলে মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনে যৌবনের প্রারম্ভ হতে বার্ধক্যের বৃদ্ধি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছেন,—অসংখ্য অভাবের মধ্যেও দেবতা কিংবা মানুষ কারো কাছে একটি দিনের জন্য এতটুকু অভিযোগ খাড়া করেন নি। মুহূর্তের জন্যও কাউকে কোন দিন ব্যথা দিতে তাঁকে কেউ দেখেনি।

সুতরাং গ্রাম্য-মজলিসে এতক্ষণ ধরে যে সব অশ্লীল আলোচনা অশ্লীলতর অংগভংগি সহকারে অবাধে অগ্রসর হ'চ্ছিল,—তাঁর আবির্ভাবের সংগে সংগেই তাদের গতিরোধ হ'ল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাস্টার মশায় বল্‌লেন—"তাইত ভট্‌চায্‌ মশায় কী সর্বনাশটা হয়ে গেল বলুন ত? আহা,—মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ছিল,—আর রাখহরির ত কথাই নাই। একটি দিনের জন্যেও তাকে কোন অন্যায় কর্‌তে দেখিনি। এদের জীবন যে এমনভাবে এত শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে কে জানত? ভগবানের এ কেমন বিচার! কিছু বোঝা যায় না।" এই বোধ হয় অদৃশ্য দেবতার বিরুদ্ধে মাস্টার মশায়ের প্রথম অভিযোগ। অন্তরের উদ্বেল বেদনা-সমুদ্র মথিত করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এ'ল তাঁর বুক হ'তে। যদু ভট্‌চায্‌ কনুই দিয়ে সিংমশায়ের গায়ে একটু ঠেলা দিলেন,—মাস্টার মশায়ের এই অহেতুক বেদনাবোধ দৃষ্টিকটু ঠেক্‌ল বুঝি

তাঁর কাছে। আর সবাই কিন্তু নিশ্চল হ'য়ে রইল। হয়ত মাস্টার মশায়ের প্রতি যুগপৎ সম্ভ্রম আর সহানুভূতিই ছিল এই নীরবতার মূল কারণ।

"মাস্টার মশায়, আজ আপনার কাছে পার্বণী চাই কিন্তু,—বছর দশেক পরে আজ আপনার নামে একেবারে একসংগে দু'খানা চিঠি এসেছে।" বলে হাস্‌তে হাস্‌তে হাজির হ'ল রতনপুরের পিয়ন শ্যামাচরণ। তালপুকুরে পোস্ট অফিস নাই।—তাই রতনপুর পোস্ট অফিস থেকেই তালপুকুরের চিঠিপত্র বিলি হয়।

এই অপ্রত্যাশিত বার্তা শ্রবণ করে মাস্টার মশায় বিস্ময় আর আতংকে অধীর হয়ে উঠ্‌লেন। হাতের হুঁকোটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন,—"তুমি কি পাগল হ'লে শ্যামাচরণ? আমার তিনকূলে কেউ নেই,—চিঠি আবার লিখ্‌বে কে? এতদিন পরে জীবনের এই ভর সন্ধ্যায় কে আবার নিতে এলো আমার খোঁজ?"

শেষের দিকে তাঁর গলাটা ভিজে ভিজে ঠেক্‌ল,—আজীবন ব্রহ্মচারী সদানন্দময় এই মানুষটির দূরে-ফেলে-আসা কোনদিনের কোন লুকানো ব্যথার আভাস আজ আবার ফুটে উঠ্‌ল নাকি তার কণ্ঠস্বরে!——

শ্যামাচরণ তখন ক্যাম্বিসের হল্‌দে-থলিটা খুলে তার মধ্য হ'তে দু'টো খাম বের করে মাস্টার মশায়ের হাতে দিলে।

চশমাটা কাপড়ের খুঁট দিয়ে একবার মুছে নিয়েই মাস্টার মশায় পড়্‌তে সুরু করলেন,—কিন্তু চিঠি দুটো পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই কাঁপতে কাঁপতে তিনি মাটীতে পড়ে গেলেন। সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল। একটু পরেই আরম্ভ হ'ল বিচিত্রতর কলরব,—'জল নিয়ে আয়' 'পাখা আন', 'চারদিকের ভিড় বমাও', ইত্যাদি।——বেশ বোঝা গেল মাস্টার মশায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন।

এই আকস্মিক মূর্ছাটি অদূরবর্তী বটবৃক্ষবিহারী ব্রহ্মদৈত্যের প্রভাব

সংবন্ধে অসংশয় হয়ে রমেশ মুখুয্যে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন এবং ব্রহ্মদৈত্য বিতারণে ব্যস্ত হয়ে ঘন ঘন রামনাম উচ্চারণ করছেন।

কিন্তু সকলেই রমেশ মুখুয্যে নয়। সুতরাং অনেকের মনে জাগল অদম্য কৌতূহল,—কি এমন খবর চিঠিতে লেখা আছে যাতে ধৈর্যের হিমালয় এই মাস্টার মশায় অতটা বিচলিত হয়ে পড়েছেন? সকলেই জানে যে মাস্টার মশায়ের আপনার লোক বল্তে কোথাও কেউ নাই। এই গ্রামে তাঁর এতদিনের বাস, কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁকে বিন্দুমাত্র ক্লিষ্ট দেখে নি। আজ হঠাৎ——

যদু ভট্চায এগিয়ে যেয়ে চিঠি দুটো তুলে নিলেন। ততক্ষণে ভিড় দেখে কোথা হ'তে রামহরি আর রাসমোহন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। যদু ভট্চাযকে চিঠি দুটো হস্তগত কর্তে দেখে সিংমশায় স্থির থাকতে পার্লেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়,—কারণ রামায়ণ মহাভারত সুর করে পড়তে পারলেও হাতে-লেখা চিঠির পাঠোদ্ধার করা তাঁর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। অগত্যা হাত নেড়ে বল্লেন,—চেঁচিয়ে পড়ো ভট্চায—সকলে শুন্তে চায়।

সিংমশায়ের কথা অমান্য করা যায় না,—সুতরাং যদু ভট্চায প্রথম চিঠিটা খুলে পড়্লেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—

"কাকাবাবু! আজ আপনাকে চিঠি লিখ্ছি, কিন্তু কাল আপনি যখন চিঠি পড়্বেন তখন আর আমি পৃথিবীতে থাকব না। বাবার কষ্ট, আমার মত গলগ্রহ নিয়ে সমাজের কাছে তাঁর অবিরাম লাঞ্ছনা আমি আর সহ্য কর্তে পার্ছি না। একবার ভেবেছিলাম, বাবার কথামত রামহরিদা'র সংগে বিয়েতে মত দিয়ে দিই,—তাহলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। কিন্তু তার পরেই মনে পড়্ল আপনাকে, আপনার শিক্ষাকে।

মন যাকে মোটেই স্বীকার কর্‌তে চায় না, তাকে আত্মসমর্পণ করে উভয়তঃ প্রতারণা করে চল্‌তে আমার বাধল। আত্মহত্যার বাড়া পাপ নাই, আমি জানি, কিন্তু আজ এ ছাড়া আমার গতি নাই। হয়ত আমার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়ে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, কিন্তু আমি জানি শত অপবাদেও আপনার স্নেহ হ'তে আমি বঞ্চিত হ'ব না। বাবা বোধহয় আমার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়বেন, তাঁকে দেখার ভার দিলাম আপনার উপর। গোব্‌রার হাত দিয়ে এই চিঠি পোস্ট কর্‌তে দিলাম,—কালই পাবেন কি না জানি না। আজ রাত্রেই আমি তালপুকুরে———। আমার শেষ প্রণাম নেবেন। ইতি—আপনার স্নেহের, অভাগিনী স্নেহ।"

একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠ্‌ল,—একটু 'আহা' 'উহু'র টুক্‌রো, একটু ভিজে চোখ মোছার শব্দ—একটা চাপা নিঃশ্বাস। শুধু যদু ভট্‌চায অবিকৃতকণ্ঠে বল্‌লেন—"বাকীটা শোন।" আবার পাঠ আরম্ভ হল,—

"মাস্টার মশায়! আমার জীবনে যত লোক দেখেছি, তার মধ্যে আপনি আমার কাছে দেবতা। সুতরাং আমার শেষ মুহূর্তের কৈফিয়ৎ সমস্ত আত্মীয়কে বাদ দিয়ে আপনার কাছেই দিয়ে যাচ্ছি স্বেচ্ছায়। আপনি বোধ হয় শুনেছিলেন আমি স্নেহকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলাম। আমি স্নেহকে ভালবাসি, আমি জানি তা'কে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার যাবার মুহূর্তেও আমি বল্‌ছি, এতবড় সত্যকথা আমি আর কোনদিন বলিনি। কিন্তু স্নেহ আমাকে বিয়ে কর্‌তে রাজী নয়। রাসু জেঠা নিজে রাজী ছিলেন, কিন্তু পরে সত্য কথাই বল্‌লেন যে তাঁর মেয়ে রাজী নয়। আমি নিজেও জানি, আমি সবদিক দিয়ে স্নেহের অযোগ্য।

কিন্তু এই নিয়ে গ্রামে যে কাণাঘুষা সুরু হ'ল তা আপনার কানে

পৌঁছেছে কিনা জানি না—কিন্তু আমি জানি অনেক অযথা অপবাদ স্নেহকে এজন্যে সইতে হয়েছে। জীবনের কোন আকর্ষণই যখন আমার নেই, শুধু শুধু বেঁচে থেকে স্নেহের এ লাঞ্ছনা উপভোগ করার ধৈর্য আমি পাব কোথায়? সুতরাং আমাকে যেতেই হবে, অন্ততঃ আমার মৃত্যুতেও যদি স্নেহ'র যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হয়, সেই হবে আমার পরম লাভ। আর দেরী করব না। এই আত্মহত্যার জন্য বিধাতার বিচারশালায় কি শাস্তি পাব জানি না,—তবে এটুকু জানি যে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমার মাস্টার মশায়ের কাছে সস্নেহ ক্ষমা পাবই। ইতি—প্রণত রাখু"।

গুঞ্জন যেটুকু ছিল থেমে গেল একেবারে। যে সমস্যা এতক্ষণ জটিলার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল বেশী করে, উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল তার অভিনব সমাধান। কারো মুখে কথা ফুট্‌লো না,—চুপ করে বসে রইল সবাই, পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে।

রাসমোহন আর রামহরি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, মূক, অচঞ্চল, স্থাণু। যারা চলে গেছে তারাই দিয়ে গেছে তাদের কৈফিয়ৎ,—সব অনাত্মীয়কে পরমাত্মীয় মেনে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রামহরি রাসমোহনের হাতটিকে টেনে নিলে নিজের হাতের ভিতর,—এগিয়ে চল্‌ল ওরা সমস্ত ভিড় ঠেলে, কাঁচা মেঠো পথ ধরে, কতদূরে, কোথায়, কে জানে!

লুপ্ত-চেতন মাস্টার মশায়ের চেতনা ফিরে এসেছিল, বার্ধক্য-জীর্ণ শরীর নিয়ে তিনি একটু ফাঁকায় বসেছিলেন, তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে গ্রামের লোকেরা কাছে যেয়ে দেখ্‌লে, তাঁর সামনের একহাত পরিমিত জায়গা অনর্গল অশ্রু-প্রবাহে কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে!

অভাবনীয়

বিষ্ণু ভট্টাচার্য

বিষ্ণু ভট্টাচার্য : জন্ম—তেরশ' চব্বিশ সালে বরিশাল জেলার রহমতপুর গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান—বরিশাল জেলার রহমতপুর গ্রামে। ছাত্রজীবন—বরিশাল ও কলিকাতায়। 'জোনাকি' কবিতা পুস্তকের অন্যতম লেখক। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

হাতে দু'গাছি সোনার চুড়ি, পরণে একখানি সাধারণ কালোপেড়ে সাড়ি, মাথার চুলগুলি পিছনে ফিরিয়ে বাঁধা, বহুদিনের অযত্ন সেখানে সহজেই চোখে পড়ে। সুধা তার পুরনো স্যাণ্ডালটা পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শরীরের কোথাও কোন অলংকারের আড়ম্বর নেই, অন্তরে যারা দরিদ্র বাইরের চাকচিক্য তাদেরই মানায়, সুধা উচ্চশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা আধুনিক মেয়ে।

সিঁড়ির উপর পা বাড়াতেই নীচে পদশব্দ শোনা গেল। তারপরেই ত্রস্তপদে বইখাতা নিয়ে সাবিত্রীর আবির্ভাব, ক্ষমা প্রার্থনার ভংগীতে সে বললো : আমার আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল সুধাদি।

: না এমন আর কি। আমি ভেবেছিলুম তুমি আজ আসবে না। হয়ত নিজের কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে।

সাবিত্রী উপরে উঠে এলো, সুধার কাছে এসে বললো : ছাতে যাচ্ছিলেন? তবে আজ থাক, একদিনে এমন আর কী আসে যায়?

যে উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সাবিত্রী কথাটা বলেছিলো, সুধার চোখে মুখে তার কোন পরিচয়ই পাওয়া গেলো না। ঈষৎ গম্ভীর মুখে সে বললো : ভিতরে চলো, একটা দিনই-বা শুধু শুধু নষ্ট করার কী প্রয়োজন, তাছাড়া একজামিনও এসে পড়েছে।

সাবিত্রী একটু মুস্কিলে পড়লো। উপস্থিত-বুদ্ধিটা মেয়েদের প্রবল

ব'লেই শোনা যায়, তারই খানিকটা খরচ ক'রে সে বললো: তবে ছাতেই চলুন না, বেড়াতে বেড়াতে ইংরেজী কবিতার গল্পগুলি মুখে মুখে আলোচনা করবেন।

: লেখাপড়ার সময়ে আনন্দোপভোগ করাটা অন্যায়। মন বিক্ষিপ্ত হ'লে কোন জিনিষই ভালো ক'রে নিজের ক'রে নেওয়া যায় না। এই বলে সুধা এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে পা বাড়ালো, সাবিত্রী বাধ্য হ'য়ে এলো তার পিছনে পিছনে।

স্বাভাবিক গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে সুধা উপদেশ দিতে লাগলো: জীবনে দুটি কথা মনে রাখবে সাবিত্রী, সততা আর পরিশ্রম। উন্নতি করতে হ'লে এ দুটো জিনিষ অত্যাবশ্যক। যদি সৎ আর পরিশ্রমী না হ'তে পারো তবে মনের মধ্যে ভাল ইচ্ছে পোষণ ক'রেও কোন লাভ নেই।

টেব্‌লের দু'পাশে তারা দু'জনে দু'খানি চেয়ারে বস্‌লো। সাবিত্রী এই ধরণের উপদেশ কম শোনেনি। তার মনে হোলো সুধাদি উপদেশ দিতে জানে, কিন্তু জানে না পরিমাণ রক্ষা করতে। মাত্রা ছাড়িয়ে চললে ভালো কথাও যে ব্যর্থ হ'য়ে যায় এটুকু জ্ঞান তার নেই।

সুধার যত কথাই শুনেছে তার মধ্যে একটা বিষয় সব চেয়ে বড়ো হ'য়ে মনে পড়ে। আত্মোন্নতি এবং সেই আত্মোন্নতি লাভ করতে হ'লে পুরুষের সংগে নারীর সমান অধিকার। বহু যুগ ধ'রে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে নারীর শক্তিকে অসম্ভব রকমে পংগু ক'রে দেয়া হয়েছে।

: এর মধ্যে আরো কোন উদ্দেশ্য ছিল না শুধু পুরুষের স্বার্থান্ধতায় মেয়েদের দাবিয়ে রাখা ছাড়া। যুগধর্ম সে কথা মানতে রাজি নয়, য়ুরোপীয় হাওয়া এসে আমাদের যুগধর্ম তৈরী করেছে। কোনদিন টেক্‌স্‌ট্‌-বই পড়াতে পড়াতে সুধা হয়ত বলে ফেলে: বুঝলে সাবিত্রী, দেশের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা আর নারীজাতির সামাজিক স্বাতন্ত্র্য

এ দু'য়ের মূল্যই সমান। জন্ম জন্ম পুরুষের দাসত্বে বন্দী থেকে আমাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি তাকে ফের উদ্ধার করা চাই।

ব্যক্তিগতভাবে সাবিত্রীকে এ তত্ত্ব-কথা বলায় আপত্তি নেই, কিন্তু সুধাদি তার উত্তেজনার আতিশয্যে কোনদিন হয়ত ক্লাসেই নিজেকে প্রকাশ ক'রে দেয়। গণিত-শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই পুরুষের সংসর্গ এড়িয়ে চলার সার্থকতা, কিন্তু লেখা আছে সুধাদির হৃদয়ে। তাই অপ্রাসংগিক কথা বলতে তার বাঁধে না। গণিতের অধ্যাপক সে, কিন্তু নারী-জীবনের আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা করতে ক্লাস-শুদ্ধ মেয়েদের সামনে এতটুকু তার দ্বিধা নেই।

সাবিত্রীর বয়স অল্প, সবেমাত্র আই-এ ক্লাসে পড়্‌চে। যৌবনের অফুরন্ত রোম্যান্স তার মধ্যে বাসা বেঁধেছে। আর পুরুষকে না দেখাতে পারলে মেয়েদের রোম্যান্‌টিক ভাবটা যে একেবারেই নিরর্থক একথা সে ভালো ক'রেই জানে। বই প'ড়ে নয়, অল্প বয়সের যাদুকরী মায়া তাকে একথা জানিয়ে দিয়েছে পুরুষকে খুসি করতে না পারার মতো ব্যর্থতা মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই।

বই-এর পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে সাবিত্রী একটু ঢোক গিলে দু'বার কেশে নিয়ে দুর্জয় সাহস অবলম্বন ক'রে বললো ঃ যদি কিছু না মনে করেন, সুধাদি, একটা কথা—

ঃ বুঝতে পেরেছি, প্রেমে পড়েছো। তোমার মুখের চেহারা দেখেই তা বোঝা যায়। অকারণে সুধার সন্দেহ জেগে উঠ্‌লো, সেটা দুর্বলতার পরিচয়, বয়স পেরিয়ে গেলে বিয়ে করবার ইচ্ছাটা মেয়েদের শিথিল হ'য়ে আসে। যে ফুল মঞ্জুরিত হয়ে উঠ্‌লো অথচ পেলোনা তার সাদর নিমন্ত্রণ তার মধ্যে চাপা রইলো বহুকালের সৌরভ। সুযোগ পেলে সে বেরিয়ে আসে আত্মপ্রচারের আকাংখায় আপনাকে ছড়িয়ে দেবার দুর্দম

স্পৃহা নিয়ে। বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে সুধার যৌবন থেকে ঝ'রে গেছে সমারোহের পল্লব, ক্ষীণ হয়ে এসেছে চেতনার তরঙ্গ-ধ্বনি, রয়েছে শুধু তার অস্পষ্ট ইংগিত সুদূর কালের অর্ধ বিস্মৃত স্বপ্নের মতো। এ অবস্থাটা ভয়ানক, এর সংগে জড়িয়ে থাকে ঈর্ষামিশ্রিত শাসন আর সন্দেহ। তাই সে বলতে পারলো: তুমিও শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালে সাধারণের শ্রেণীতে ?

সাবিত্রী ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু সুধার কথা আর থামে না। সে ব'লে চল্‌লো: অরুণা আর তুমি,—ভেবেছিলুম এ দু'জনকে অন্তত আমার আদর্শে তৈরী ক'রে যেতে পারবো। শত নিষেধ সত্ত্বেও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না। তুমিও যে এ পথে পা' বাড়াবে তা আমি আগে থেকেই জানি।

সাবিত্রী টেব্‌লের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে ত্রস্তস্বরে বললো: না-না, সুধাদি, আমি অন্য কথা জিজ্ঞেসা করবো, সত্যি বল্‌চি, কোনও পুরুষ আমাকে ভালোবাসেনি।

: তুমি তো ভালোবাসতে পারো কোন পুরুষকে।—সুধার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। কোন সম-বয়স্কা মেয়ে এ ধরণের ঠাট্টা করলে রাগ করার কিছুই থাকে না, মিথ্যে হ'লেও তাকে হেসে উড়িয়ে দেয়া চলে। সুধা অধ্যাপক, সাবিত্রীর সংগে তার বয়সের অনৈক্য খুব কম নয়; গম্ভীর চালচলন, তার পদমর্যাদা এবং সব চেয়ে যেটা বড়ো, তার নিষ্কলংক চিরকৌমার্য। কলেজের ছাত্রীদের সুমুখে তাকে উচ্চস্থানে বসিয়েছে। সবাই তাকে সম্ভ্রম করে, রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী ব'লে তার খ্যাতি ও সম্মানের অবধি নেই। তার কথার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে সাবিত্রী কথা হারিয়ে ফেললো, লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে নীরবে ব'সে রইলো।

অভাবনীয়

সুধা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো : থাক, আজ আর পড়াশুনো হবেনা, তুমি যেতে পারো এখন।

তবু সাবিত্রী কোন কথা বলচে না, শুধু খোলা বইটার উপরে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে লাগলো। সুধার পরিপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সুমুখে বসে প্রতিবাদ করবার শক্তি সে সঞ্চয় করতে পার্‌চে না, অথচ তার কথা নীরবে সত্য ব'লে মেনে নেওয়াও অসম্ভব। সাবিত্রী অসচ্চরিত্র, সাবিত্রী সংযমের বাঁধ ডিঙিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে কোন পুরুষের কাছে—এই অত্যন্ত মিথ্যে ধারণাটা চিরকাল সুধাদির মনে বেঁচে থাকবে, আর যাই করুক, নিজের আদর্শ-চ্যুতির অপবাদে তাকে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছা সাবিত্রীর নেই।

: সুধাদি, আমায় বিশ্বাস করুন। অন্যায় আমি আজ পর্যন্তও করিনি, শুধু একটা প্রশ্ন ছিল—

সুধা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো : বেশ, বলো।

: কাগজে সেদিন পড়লুম একটা প্রবন্ধ,—সাবিত্রী একটু থেমে থেমে বলতে লাগলো, কে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, আধুনিক নারীরা জীবন-যাত্রায় যে পথ বেছে নিয়েছে সেটা অত্যন্ত মারাত্মক।

সুধা মুহূর্তেই জ্বলে উঠ্‌লো, বললো : অত্যন্ত মারাত্মক এইসব ভ্রান্ত ধারণার প্রচার করা। নারী প্রগতিকে আঘাত করবার লোকের অভাব নেই, বাংলাদেশ এখনো মোহাচ্ছন্ন ব'লে এই সব অন্তরায় আমাদের পথে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আমরা ভয় পাবো না, অপবাদ অগ্রাহ্য ক'রে চলবার মতো সবলতা আমাদের আছে।

এমন সময়ে বাইরে মিহিরের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, আর তার সংগে অরুণার আনন্দোচ্ছল মুখর হাসি। একটু পরেই তারা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সুধার মুখের দিকে চেয়ে অরুণার হাসি গেলো মিলিয়ে। মিহির

কী করবে ঠিক না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে। অরুণার মনে হোলো, সুধার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি একলক্ষে চেয়ে আছে তার দিকে, আর সেই দৃষ্টি থেকে প্রতিনিয়ত ফুটে বেরুচ্চে আগুন। উপায়ান্তর না দেখে মিহির বললো ঃ চলো আমরা এখান থেকে যাই।

দু'জনে পা বাড়াবার উপক্রম করচে, সুধা ব'লে উঠলো ঃ তুমি দিনে দিনেই বাড়াবাড়ি করছো মিহির। এই জন্যেই কোন মেয়ের সংগে তোমাদের মত ছেলেদের আলাপ করিয়ে দিতে নেই। ঐ একটা ব্যাপার ছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে আরো অনেক সংবন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে এবং তা যে দেশের পক্ষে সত্যিই কল্যাণ-জনক এ ধারণা তোমাদের মনেই আসে না।—সুধার কণ্ঠস্বর কঠোর হ'য়ে উঠ্‌লো ঃ এটা মেয়েদের বোর্ডিং, সময়-অসময়ে এখানে আসাটা যে ভালো দেখায়না সেটুকু জ্ঞানও তোমার নেই।

মিহির তার বড় বোনের ছেলে। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা এসেছে এম্-এ পড়বার জন্যে। এম্-এ পড়ার চেয়ে অরুণার সংগে ঘুরে বেড়ানোতেই তার আনন্দ। মাসিমার ভর্ৎসনায় তার রক্ত প্রথমটায় গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। তারপরে কোন রকমে নিজেকে সংযত করে একটি কথাও না ব'লে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল। মিনিট খানেক পরেই আবার সে ফিরে এলো, সুধা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকাতেই একখানি রঙীন্ কার্ড হাত বাড়িয়ে দিলো। লেখাটা পড়তে পড়তে সুধা অন্যমনস্ক হ'য়ে মিহিরকে বললো ঃ যাও।

হাতের অক্ষর চেনা দেখে প্রথমেই তার বুকটা কী জানি কেন ধক্ ক'রে উঠলো। তারপরে আস্তে আস্তে একটা বিরাট বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো দেখে মিহির অলক্ষে অরুণার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলো।

অভাবনীয়

সুধা বললোঃ আজ থাক সাবিত্রী, বাইরে কে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করচে। অরুণা ওকে নিয়ে ভিতরে যাও।

একটু চঞ্চল-পদে সুধা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। বারান্দা পার হ'তেই শোনা গেলোঃ এই যে মিস্ ব্যানার্জি, দেখা পাব ব'লে ভরসা ছিল না,—হাত তুলে তপন নমস্কার জানালো।

সুধা এগিয়ে এসে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললোঃ ভিতরে আসুন।

তপন বললোঃ আপনাদের এলাকায় যাওয়ার অধিকার কি আমাদের আছে?

ঃ খুব ঠাট্টা করতে শিখেছেন যা হোক্! তারপরে, কোথায় ছিলেন এতদিন? পরীক্ষা হ'য়ে গেলো, আর আপনার খোঁজ নেই!

তপন সুধার অনুসরণ ক'রে চলতে চলতে বললোঃ যাযাবর আমরা, তাই নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁধা পড়া আমাদের অভ্যাস নেই।

ঃ এটা আপনাদের মিথ্যা অহংকার। ঘর বেঁধে সুখে থাকতেই চান আপনারা।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে তপন বললোঃ লাভ হোলো আপনার কাছে এসে। একটা গভীর তত্ত্বকথা শুনে গেলাম, দুঃখ এই যে, আপনাদের জন্যেই আমাদের সংকীর্ণতার মাঝে আবদ্ধ হ'তে হয়। নিজেদের সংস্থান জোগাতে অসমর্থ, আত্মরক্ষার শক্তিটুকু হ'তেও বঞ্চিত! যা'দের এত দৈন্য তারা সত্যি পরাশ্রিত না হ'য়ে কী-ই বা করতে পারে।

তপন থামলো, সুধা অসহিষ্ণু হ'য়ে বললোঃ বলুন, আপনার আর কতখানি বলবার আছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, আধুনিক হ'য়েও আপনার চোখ এখন পর্যন্তও খোলেনি।

তপন হেসে বললোঃ আপনার সংগে কি [illegible] করতেই এসেছি এখানে? আচ্ছা আমি না হয় হার মানলুম। যদিও জানবেন এতে

আপনার নিজস্ব বাহাদুরী কিছুই নেই। জন্ম জন্ম ধ'রে নারী চিরকালই বিজয়িনী হ'য়ে আসছে।

তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে সুধা হেসে ফেললো, সে হাসির সংগে লাবর্ণ্য জড়ানো, আর অজানিত আত্মনির্ভরের অসীম প্রত্যাশা। বললো : বসুন চা তৈরী ক'রে দিচ্ছি।

: ওসব বালাই আর নেই আজকাল।—নির্লিপ্তের মত তপন বললো।

: কেন বৈরাগ্য নাকি? ওসব ঢঙ্ চলবেনা এখানে ব'লে দিচ্ছি। গলার আওয়াজ কোমল করে বললো : কতদিন পরে দেখা হোলো; আমার অনুরোধটা এড়িয়ে চললেই কি আপনি ধন্য হ'য়ে যাবেন?

অগত্যা সম্মতি দিতে হোলো।

বাইরে তখন সন্ধ্যার-অন্ধকার নেমে এসেছে। জানালার কাছে পর্দার উপরে যে শেষ রশ্মিটুকু খেলা করছিল. তা কখন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে! সুধা নিজেই ভিতরে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম এনে অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। নিজের হাতে চা তৈরী করে খাওয়াবে তপনকে। এর মধ্যে কী আছে? স্বাভাবিক ভদ্রতা, পুরনো সমপাঠীর প্রতি সৌজন্য না আরো কিছু অব্যক্ত আবেগ, যা গোপনে গোপনে তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে।

আলোটা সে ইচ্ছে করেই জ্বাললো না। অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্টোভের আলোয় সুধার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। তার হাতের ব্যস্ততা যেন তাকে অনেক বছর পেছিয়ে দিয়েছে। তপন নিরীক্ষণ করছে। তার ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি! সে হাসি দুর্বোধ্য।

মিনিট কয়েক পরে গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুধা চা-এর পাত্র এগিয়ে দিলো। তপন বললো : বড়ো দেরি হ'য়ে গেল সুধা দেবী, আপনার এই সযত্ন আয়োজন উপেক্ষা করতেও পারিনে!

অভাবনীয়

: কেন, এত তাড়া কিসের শুনি? আফিস্ করতেও যাচ্ছেন না বা ট্রেন ফেল করবারও ভয় নেই।—বলে সুধা একখানি চেয়ারে বসে পড়ে গা ছড়িয়ে দিলো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তপন বললো : যদি বলি, শেষের তাড়া?

সোজা হ'য়ে উঠে ডান হাতে ভর দিয়ে সুধা বললো : মানে?

: আমি আজকে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি পাটনায় চাক্‌রীর সন্ধানে। সেখানে ছোট কাকা আছে। এভাবে আর কতকাল কাটানো যায়?

সুধা একটু আধিপত্যের সুরে বললো : একদিন দেরী হ'য়ে গেলে চাকুরী আর ভেসে যাবে না।

: কিন্তু আমাকে যে ভেসে যেতে হবে!

: চুপ করুন।—সুধা ধমক দিয়ে উঠ্‌ল : চাকর সাজতে দেবনা আপনাকে আমি। বড়লোকের ছেলে হ'য়ে চাক্‌রী কর্‌তে লজ্জা হবেনা আপনার? না, ওটা আধুনিক কালের একটা ফ্যাসান; জানেন, আপনার জায়গায় একটি গরীব ছেলে ঠাঁই পেলে তার সংসার বাঁচাতে পারবে; আর আপনি তো সিগারেট ফুঁকেই উড়িয়ে দেবেন।

: কিন্তু, য়েনি হাউ, আজকে আট্‌টার গাড়ীতে আমাকে যেতেই হবে যে,—তপন দাঁড়াবার উদ্যোগ কর্‌ছিলো।

সুধা উঠে এসে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো : আপনার কাছে ভিক্ষা চাই, আপনি যাবেন না। যেতে পারবেন না আপনি। দেখি আমাকে ঠেলতে পারেন আপনার কতখানি শক্তি! তপনের হাত ধ'রে ফেলেই সুধা সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো। সে অধ্যাপক, এটা মেয়েদের বোর্ডিং এখনি হয়ত কোন মেয়ে এখানে এসে পড়তে পারে। আত্ম সংবরণ করতে গিয়ে সে আরো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো : আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ফেলে যাবেন না।

বিষ্ণু ভট্টাচার্য

তার সমস্ত অন্তর নিংড়ে যেন একটা কান্না ঠেলে উঠে গলা রুদ্ধ করেছে। তপন দাঁড়ালো, যে কথাটা এতক্ষণ বাকি ছিলো তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে বললে: বর্ধমান স্টেশনে আজ আমার স্ত্রী অপেক্ষায় থাক্‌বে, তাকে নিয়ে যেতে হ'বে।

প্রবল ঝড়ের আঘাতে নিঃসহায় পাখী যেমন আশ্রয় খোঁজে, তেম্‌নি অবসন্ন হ'য়ে সুধা টেব্‌লের উপর ভর ক'রে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ নীরবে কাট্‌লো—ভয়ংকর নীরবতা। তপন ভাবছিল, এর জন্যে তার অপরাধ কোথায় কতটুকু সঞ্চিত হয়েছে! স্বেচ্ছায় যে দুঃখ-বেদনাকে বরণ ক'রে নেবে তাকে নিবৃত্ত করার সাধ্য কী! সান্ত্বনা-বাক্য সেখানে একান্তই নিষ্ফল!

ভাঙা-স্বরে শ্রান্তকণ্ঠে সুধা বললো: আপনি যেতে পারেন, বাধা দেবোনা।

তপন শুন্‌লো, অদ্ভুত রকমে পরিবর্তিত তার আওয়াজ। ব্যথিত অন্তরে বিদায়ের কালে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

প্রথম থেকে সমস্ত জীবনটার উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে সুধা তার পথের দিকে চেয়ে রইলো।

প্রশ্ন-পত্র

ভোলানাথ ঘোষ

ভোলানাথ ঘোষ: জন্ম—উনিশ' শ আট সালে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ময়নাগ্রামে। পৈতৃক বাস-স্থান—বর্ধমান জেলার ময়নাগ্রামে। ছাত্রজীবন—বর্ধমান। এঁর প্রথম রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'বাক্যরাও' বর্তমানে ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

"দেখ, তোমারও তো গৌরীদান হয়নি—বিশেষতঃ এখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর দিকে অভিভাবকদের সুনজর পড়ায় তাদের বেশী বয়সে বিয়ে হওয়াটা সমাজসিদ্ধ হ'য়ে এসেছে। কাজেই সুশান্তার যখন গ্র্যাজুয়েট হবার এত সাধ, তখন আরও দু'টো বছর ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকতে আমাদেরও পারা উচিত।" প্রশান্তের কথার উত্তরে সুধীরা ব'লল, "কিন্তু সেও তো মনে ক'রতে পারে, বাপ মা নেই, আমরা পর—যথার্থ কর্তব্য করছিনা। বাপ-মা ওর জন্যে টাকাও যথেষ্ট রেখে গেছেন।" প্রশান্ত ব'লল, "সে টাকার একটাও তছরূপ হ'য়েছে ব'লে তো মনে হয় না, বরং ওর ভরণ-পোষণের জন্যে কোন খরচও সঞ্চিত অর্থ থেকে হাত দেওয়া হবে না।" "কিন্তু মেয়েছেলের অত লেখাপড়ায় দরকার কি? চাক্‌রী ক'রতে যাবে না তো ও।"—ব'লল সুধীরা। প্রশান্ত বলে, "আমি লেখাপড়া শিখে চাক্‌রী না ক'রে লোহালক্করের ব্যবসা ক'রতে গিয়ে কিছু অন্যায় ক'রেছি ব'লে তো বোধ হয় না।" এমন সময় কলেজ থেকে ফিরে এলো সুশান্তা।

সুশান্তাই বটে! নামটি রাখার একটা সার্থকতা পাওয়া যায়। সুশান্তার শান্ত—অতি শান্ত স্বভাবে। কলেজের বাস থেকে সে যেন গুণে গুণে পা ফেলে ধীরে হেঁটমুখে সোজা বাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

আকাশী রঙের শাড়ীর আঁচলটুকু আলতা-রাঙা টুকটুকে আঙুল পেরিয়ে স্যাণ্ডেল পর্যন্ত গিয়ে ওলট-পালট খায়। সুশান্তার গায়ের রঙ্‌টা কিন্তু মোটেই শান্ত নয়, বড় ঝাঁঝালো। বাঙালী গেরোস্তের ঘরের পক্ষে বড় তীব্র, বড় উগ্র, চোখ ঝ'ল্‌সে যায়। সচরাচর এমন দেখা যায় না। সুধীরা ব'লল, "সুশান্তা লেখাপড়া ছেড়ে দে। আমিও তো অনেকদূর অবধি প'ড়েছিলাম, কিন্তু কাজের বেলায় সেই পরের গোলামী।" সুশান্তা ক্ষুণ্ণমনে জিজ্ঞাসু চোখে প্রশান্তের মুখের দিকে চায়। প্রশান্ত বলে, "আমি ওর অন্তরের অন্তস্তলের অনন্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে গভীরতম তলদেশ তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে বুঝেছি, তুমি যা চাও সুধীরা, ও তা এখন চায় না; ভয় নেই কর্তব্যের ত্রুটি হবেনা। যাক্‌, সুশান্তা, তোমাদের কলেজের আজ পার্ট সিলেক্‌শন্‌ হ'ল? তোমায় কোন পার্ট দিলে নাকি?" সুশান্তা বলে, "দিয়েছে—দেবযানী।" "কই দেখি?" পার্ট বার ক'রে দিলে প্রশান্ত মাস্টারী সুরু করে দেয়। কচের জুরী দেয় নিজে, সুশান্তা বলে দেবযাণীর পার্ট। "এই জায়গাটা হ'ল না, মাথাটা একটু হেলাও, কচের হাতটা ধর, একটু জোর ক'রে, নাও, প্রণাম কর পায়ের ধুলো নিয়ে—যেমন ক'রে করতে হয়, আমাকে দিয়েই প্রথম সেটা রিহার্সেল দিয়ে নাও। উঁহু, অরিজিন্যাল হ'ল না।" তারপরে হো হো ক'রে হেসে ওঠে প্রশান্ত। সুশান্তা লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে পড়ে। সুধীরা বলে, "এসব আবার কী ঢঙ্‌! এ'বার কোনদিন থিয়েটার সিনেমায় নামতে দেখব; বড় বড় প্লাকার্ডে নাম বেরুবে—মিস্‌ সুশান্তা সিংহ—বি, এস্‌, সি—শিক্ষিতা অভিনেত্রী—"

প্রশান্ত ছিল এম, এস্‌, সি'র রিসার্চ স্কলার। কাজেই সুশান্তার গৃহশিক্ষকের কাজটা সে খুব আগ্রহের সাথে করতে পারে। আপাতত

সুশান্তাকে দেবযানীর পার্ট সে ভাল ক'রে শিখিয়ে দু'একটা মেডেল পাইয়ে দেবেই।

কয়দিন প্রশান্তের সংগে সুধীরার কি একটা বিষয়ের তর্ক নিয়ে একটু মন কষাকষি হ'য়ে গেছে। কয়দিন তাদের মধ্যে আর কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যায় না। প্রশান্ত সবতাতেই ডাকে, "সুশান্তা জল দাও। কাজ থেকে এলে যেন একটু সরবৎ থাকে। তুমি প'ড়তে বসার আগে আমার বিছানাটা ঠিক ক'রে রেখ, যেন সারাদিন খেটে-খুটে এসে খেয়ে দেয়ে শুতে গিয়ে অপেক্ষা করতে না হয়" ইত্যাদি।

প্রকৃতি ক'দিন গুমোট থাকার পর মেঘলা আকাশে আজ একটা বজ্রধ্বনি শোনা গেল। সুধীরা ব'লল সুশান্তাকে, "তোর দাদাবাবু কি খেতে ভালবাসে না বাসে সে খবরটা সবার চেয়ে আমার জানা আছে।" সুশান্তা বোধ হয় ঐ নিয়ে দিদিকে কিছু ব'লতে গেছ্‌ল। প্রশান্ত এলে সুশান্তা সব নালিশ ক'রে দিল। প্রশান্ত বলে, "তা তো ঠিক সুশান্তা, বড় দুঃখের বিষয়—আমি কি ভালবাসি না বাসি সে খবরটা যদি তুমি তোমার দিদির থেকে বেশী ক'রে রাখবার একটু চেষ্টা করতে, তা হ'লে আমার কি সুবিধেই না হ'ত! যাক্, ওর কথায় থেকো না, তুমি তোমার কেমিস্ট্রি বইখানা নিয়ে সদরে চল।" সুধীরা আরও চোটে যায়। সুধীরা বলে, "তোমার নিজের পকেট থেকে ওর পড়ার জন্য মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে খরচ করার উদ্দেশ্য তো বুঝিনা, অথচ আমি ব'ললাম একটা সেলাইয়ের কল কিনে আনতে, তা হ'ল না। দেড়শ' টাকা দামের হারমনিয়মটা কি সুশান্তার কলেজে পড়ানো হয়?" সুধীরার কথায় আর প্রশান্ত উত্তর দেয় না: এবং সে'টাই হয় তার সবচেয়ে রাগের ব্যাপার। হোমিওপ্যাথির মাত্রায় প্রশান্তের চেতনা ভাঙবে না ভেবে সুধীরা এলিপ্যাথির মাত্রা প্রয়োগ করতে সুরু ক'রল।

স্বর চড়িয়ে ব'লল, "মনে হয় ঐ সব লোভ দেখিয়ে ওকে হাত করে বাবার দেওয়া সব টাকাকড়ি ভাই ব্যবসায় লাগিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে।" প্রশান্ত গম্ভীর হ'য়ে ওঠে যায়। সুধীরা নিজেই কেঁদে কেটে অনর্থ করে এবং সুশান্তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুঃখের কাহিনী পাড়ে, "মা মারা যাওয়ায় বাবা কত কষ্টে আমাদের মানুষ করেছিলেন। তাঁর শেষ বয়সের একমাত্র ছেলে—ভাইটি আমার বড় হয়ে উপায়ী হয়ে চ'লে গেল বাবার বুকখানাকে চিরকালের জন্য ভেঙে খান্ খান্ করে দিয়ে। সে ধাক্কা বাবা সামলাতে না পেরে বিছানা নিলেন এক বছরের মধ্যে। মৃত্যুকালে তাঁর যথাসর্বস্ব বড় জামায়ের হাতে সঁপে দিয়ে বলে যান, যা দিয়ে গেলাম অর্ধেক তোমার, অর্ধেক—সুশা'র বিয়ের পর তার স্বামীকে দিও। ভাল ঘর, বর দেখে সকাল করে ওর বিয়ে দিয়ো, দেখো—ও যেন কষ্ট না পায়—" ব'লতে ব'লতে তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে চোখ বোঁজেন। আমার চোখের সামনে দিনরাত সে ছবি জেগেই আছে। তাই ওর কর্তব্যে উদাসীনতায় এত বেঁধে। প্রশান্ত এসে তাকে বলে, "এখানে ওর অভিভাবক তুমি নও—আমি। আমি ওর বিয়ে—" প্রশান্তর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুধীরা বলে, "না, তা হয় না! আমি ওর বিয়ে দিতে চাই, ওর আপত্তি কিসের?"

"বিশেষ আপত্তি,—ও গেলে আমার খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট হবে। তোমার দ্বারাতো আমার কোন কালে কোন উপকার হবে' সে আশা নেই, তাই আমি ওকে ছাড়তে পারি না।" ব'লে হো-হো করে হাসতে হাসতে প্রশান্ত বেড়িয়ে যায়।

দু'বৎসর গেছে। সুধীরা একেবারে অধীরা হ'য়ে উঠে তার মাসতুত ভাই নিরাপদকে ডাকিয়ে এনে একটি পাত্র দেখে সুশান্তার

বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছে। প্রশান্ত'র উপর আর বিশ্বাস করে থাকা চ'লল না। কাজেই নিরাপদকে নিয়েই দেনা-পাওনা পর্যন্ত সব কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে হয়েছে। অবশ্য প্রশান্ত'র কাছে যখন যত টাকা চাওয়া যাচ্ছে, পেতে এক মুহূর্তও দেরী হ'চ্ছে না।

বিশে বোশেখ্ বিয়ের দিন। প্রশান্ত সারাদিন খেটে খুটে এসে দেখে কোথাও নানারকমের নতুন ধুতি, শাড়ি, বডি, কোট; কোথাও দান সামগ্রী স্তূপাকার করে গোছানো। কোথাও নানান্ বাজার—মিষ্টি, তরি, তরকারি। বাড়ী ঘর দোর' সাজানো হয়েছে। নানান্ রকমের আত্মীয় কুটুম্বেরও অভ্যুদয় সুরু হ'য়ে গেছে। সে চুপি চুপি খাওয়া দাওয়া করে নিঃশব্দে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপরে সুশান্তা চুপি চুপি যায় প্রশান্ত'র বিছানার পাশে। গায়ের উপর হুমড়ে প'ড়ে সে, কেঁদে কেঁদে চোখের জলে দেয় বিছানা ভিজিয়ে। প্রশান্ত বলে, "কি ক'রব সুশান্তা, আমি যে প্রচণ্ড হ'তে পারি না। মিছে সংসারের অশান্তি টেনে এনে মনের অশান্তি বাড়াব? যা বলবার তুমি তোমার দিদিকেই বলগে।" সুশান্তা বলে, "দশটা দিন পেছিয়ে দিলে কি হ'ত না? আমি দিদিকে বলতে পারব না, আপনি ব'লে দিন দাদাবাবু। দু'বছর আপনি আমার হ'য়ে আমায় বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আসছেন। শেষের পরীক্ষার দিনটা ছাড়া কি দিদি দিন পেলেন না? পরের মাসেও তো দিন আছে। আমার যে পরীক্ষায় পাশ করার বড় ইচ্ছে। কাল বিয়ের দিন, কাল থেকেই আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ"। ইতিমধ্যে প্রশান্ত'র নাকটা বেশ নিশ্চিন্তমনে তর্জন গর্জন করে ডাকতে সুরু করে দিয়েছে দেখে সে হতাশ হ'য়ে উঠে প'ড়ল; মনে মনে ঠিক করল দিদির হাতে পায়ে ধ'রে দশটা দিন চেয়ে নেবে। সেখান থেকে উঠে পেছন ফিরতেই দিদি জ্বলন্ত চোখ নিয়ে পেছনে

দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে তার নিজের চোখের ধারা মুছতে মুছতে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল।

তারপর দিন সন্ধ্যেবেলা। বহু ঘটা ক'রে দু'শ বরযাত্রী নিয়ে বহু বাজনা-বাদ্যি করে বর এসে গেছে। প্রশান্ত আজ বড় ব্যস্ত; তারই ফাঁকে একবার এসে বলল, "আজ সুশান্তাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন বেশ ভালই হ'য়েছিল, একখানা একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। আমি যা ওকে পড়িয়েছিলাম, এই রকম প্রশ্নে ও ফার্স্ট ক্লাস পেতই। আমার এ চেষ্টা সফল হ'তে দিলে না! কি ক'রব সুশান্তা তোমার অদৃষ্ট—আমার দোষ নেই।" সুশান্তা অতি আগ্রহের সংগে প্রশ্নপত্রখানি নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখতে গেল। একটু পরে তার দিদির গলার শব্দ তার কানে গেল, "ওযে বিয়েতে আপত্তি ক'রবে তা বরাবর জানি, কাল তা বেশী ক'রে বুঝেছি।" তারপরে সমাগত আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে থেকে সকৌতুক প্রশ্ন ও নানারকমের মন্তব্য শোনা গেল। সুশান্তা লজ্জায় ঘরে খিল দিল। প্রশান্ত তখন বরপক্ষীয়দের যত্ন নেওয়ায় ব্যস্ত ছিল। লগ্ন ব'য়ে যায়; বরকে পিঁড়েয় বসান হয়েছে; কনে ঘর খোলে না। সুধীরা চেঁচামেচি করছে, তাতেও কিছুই হয় না। শেষে অনেক করে ব'লল, বিয়ের পর আসছে বছরে সে পরীক্ষা দিতে পারবে। তবু সাড়া নেই। প্রশান্ত'কে ব'লল, "দেখ না। তোমারও সমর্থন আছে দেখতে পাই।" প্রশান্ত বলল, "ভেব'না, আমি বললে ও নিশ্চয় দোর খুলবে। তুমি পুরোহিতকে তৈরী হ'তে বল। পুরোহিত মন্ত্র ব'লতে সুরু ক'রছেন—এমন সময় দরজা ভাঙার শব্দ—তারপর প্রশান্ত সুশান্তাকে কোলে করে নিয়ে পিঁড়েতে হাজির। আলুথালু বেশ, চুল ঝুলে পড়েছে মাটিতে। সুধীরা বলে, "একি ভেক, অত বড় মেয়ের লজ্জাও নেই।" পুরোহিত বল্‌লেন, "না, না, অজ্ঞান

হ'য়ে গেছে।" প্রশান্ত বলে, "না এখনও জ্ঞান আছে, তবে দেহ অসাড়। লগ্ন বয়ে যায়, পুরোহিত উচ্চারণ কর তুমি তোমার মন্ত্র। বিয়ে এই লগ্নেতেই হবে।" চারচোখের মিলনের জন্যে প্রশান্ত একবার হাতদিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো তার খুলে ধরলে। ভ্রমর কালো চোখদু'টো একবার চক্ চক্ করে নেচেই থেমে গেল। চার পাশে জ'মে গেছে তখন বহু লোক। তার মাঝে প্রশান্ত বার ক'রল একখানা দলিল, পুরোহিতের হাতে দিয়ে ব'লল, "অর্ধেক সম্পত্তি এতে লেখা আছে, এটী সুশা'র স্বামীর পাওনা।" পুরোহিত নানা সামগ্রীর সংগে সেটা বরকর্তার হাতে দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন "একি, কনের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে যে!" প্রশান্ত ব'লল, "হঁা।" সকলে আকুল হ'য়ে চীৎকার করে উঠ্ল, "সে কি, কি হ'য়েছে?" প্রশান্ত হাসতে হাসতে বলল, "ও কিছু নয়। কড়িকাঠ থেকে আমি দড়ি কেটে ওকে নিয়ে এসেছি। চার চোখের মিলনের সময় ওর জ্ঞান ছিল। প্রাণ যাক্‌গে, বিয়ে ওর ঠিক হ'য়েছে।" তারপর পিঁড়ের ওপর মৃতদেহটা এলিয়ে দিয়ে সে বলল বরকে, "ভাই তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও, সৎকারের আয়োজন করগে। মুখাগ্নিটা তোমারই করা উচিত। দেখ ভাই, দলিল-খানা যেন গোলমালে হারিয়ে না যায়।" বলতে বলতে প্রশান্ত ছুটে বেড়িয়ে গেল। সুশান্তার শিথিল দেহলতা তখন ধরণীর শান্ত বুকে নিঃশব্দে এলিয়ে পড়েছে। ব্লাউজের বুকে তখনও গোঁজা সেদিনকার পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রখানা।

দু'শ চুয়াত্ত

মরু-পথ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: জন্ম—তেরো শ' সাতাশ সালে। পৈতৃক বাসস্থান—চব্বিশ পরগণা জেলায়। ছাত্রজীবন—হাওড়া ও কলিকাতায়। বর্তমানে ইনি হাওড়ায় বসবাস করছেন।

স্কুলের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর শুধু রাত্রিটুকু ছুটি। ট্রান্স্লেসান, গ্রামার কম্পোজিসান করাইয়া মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে। হেড মিস্ট্রেস্ হওয়া যেন মহাপাপ! সমস্ত স্কুলের দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে তাহার উপর। কয়টি মেয়ে ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হইল, ছাত্রী সংখ্যা কমিতেছে কেন—সমস্ত খবরই রাখিতে হইবে। শুধু কি তাই? কোন্ টিচারের শরীর খারাপ হইয়াছে, বাংলার নূতন শিক্ষক ভাল পড়াইতেছে কিনা, তাহাকে বদলাইয়া ঐ মাহিনায় কোন শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় কিনা—ইত্যাদি সংবাদ প্রতি শনিবারে স্কুল কমিটিকে জানাইতে হইবে। তারপরে আছে লতিকা ঘোষের সহিত অংকের টিচার স্নীতি মিত্রের কলহ। এই হইয়াছে এক ব্যাপার। দুই জনে দেখা হইলেই তর্ক আর তর্ক; নিতান্ত শিক্ষিতা মহিলা বলিয়া আর বাহুযুদ্ধটা হয় না, কিন্তু বাক্য-বাণ বর্ষণে কেহ কসুর করে না।

ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর এক কাঁড়ি খাতা বাঁধা রহিয়াছে। দেখিতে হইবে। উঃ, শরীর যে আর চলে না, ডাক্তার দেখাইতে হইবে। স্নবর্ণা এক গেলাস জল খাইয়া খানকয়েক খাতা টানিয়া লইল। ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল।

মৈত্রেয়ী লেখে বেশ, ইংরাজী জানে ভাল। বিশেষত, সারার্থ যাহা লিখিয়াছে, উহার উপর একটা কলমের আঁচড়ও দেওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষিত হইলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে; কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে ত?—ম্যাট্রিক কোন রকমে পাশ করিলেই হইল, তাহার পরেই শুভ-বিবাহ! কিন্তু এই গৌরী চট্টোপাধ্যায়, ইহাকে লইয়া যে কি করা যায়! দশম শ্রেণীর ছাত্রী, এখনও অজস্র ব্যাকরণ ভুল, বানান ভুল। স্বর্ণা রাগিয়া সমস্ত পাতাটাই লাল কালিতে কাটিয়া কুটিয়া একসা করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মুখখানা মনে পড়িতেই কলম থামিয়া যায়। সত্যি, অমন চমৎকার মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। যেন কোন দক্ষ শিল্পীর মানস-প্রতিমা। আর ব্যবহার, কথাবার্তা কত সুন্দর—তাহা কল্পনা করিতেই পারা যায় না। জগতে পড়াশুনাই কি সব? বৎসর বৎসর পরীক্ষা দেওয়া, সসম্মানে ক্লাসে উঠিয়া যাওয়া, সকলের কাছে খ্যাতি লাভ করা ছাড়াও আর একটা দিক আছে। ক্লান্ত হইয়া সে খাতাগুলিকে দূরে সরাইয়া দিল।

আজ যেন কি হইয়াছে, কোন কাজেই মন লাগিতেছে না। দিনের বেলায় কাজের চাপে সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু রাত্রির এই নিসংগ মুহূর্তে কি যেন একটা কথা বার বার মনে পড়িতেছে।

সে ত অনেক দিন। প্রথম যৌবন। পৃথিবীর কঠোরতা তখনও ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই। সেদিন একজন তাহার দ্বারে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে সে ত দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, মনের দুর্বল বৃত্তিকে এক আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তবে? এই প্রশ্নই আজ যেন অচল হিমালয়ের মত পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নর-নারীর এই মানসিক ভাবাকুলতাকে কোনদিন-ই সে প্রশ্রয় দেয় নাই। তীব্র ভাষায় শ্লেষ করিয়াছে। মেয়েদের এ কি অবস্থা!

পুরুষ তাহার হাত না ধরিলে সে এক পাও চলিতে পারে না, আশ্চর্য! কমল দাশ কিনা শেষে বিবাহ করিল! স্ববর্ণা মুখ বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, প্রভুর পায়ে জীবন-যৌবন সঁপে দিয়েছিস্ ত?"

ইহাদের কোন লজ্জা নাই। কমল হাসিয়া বলিয়াছিল, "হ্যাঁ ভাই, আজ মনে হচ্ছে, আমি ধন্য। আমার জীবন তাঁর স্পর্শে এসে সার্থক হয়ে উঠুক—এই আশীর্বাদ-ই কর স্ববর্ণা দি।"

ক্রোধে স্ববর্ণা জবাব পর্যন্ত দেয় নাই।

বস্তুতঃ জিনিষটা এমন-ই অর্থ-হীন যে, ভাবিতেও পারা যায় না। কত কাব্যে, কত সাহিত্যে নর-নারীর এই একটা সময় প্রত্যেক মেয়ের-ই আসে, যখন সে কামনা করে একটা দৃঢ় বাহু-বন্ধন। তাই কি? অকাল বসন্তের মত রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়াই বিদায় লইয়াছে?

কিন্তু ইহাকে মিথ্যা বলিতেও ত পারা যায় না। তাহার-ই জীবনে সে দেখিল, কত সহপাঠিনী গৃহিণী হইল,—ছেলেমেয়েদের কলরবে এখন তাহাদের গৃহ মুখরিত। মুখ দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন বেশী সুখী। সংসারের দেওয়া-নেওয়া, লাভ-ক্ষতির মাঝখানে তাহাদের জীবনে ত ভাঁটা পড়ে নাই; বরং কলোচ্ছাসে বহিয়া চলিয়াছে। কি জানি, হয়ত উহাদের স্বভাব-ই ঐ লতার মত, বনস্পতির আশ্রয় ছাড়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার জীবন? পিছনের দিকে চাইলে মনে হয় নিস্ফল হইয়া গিয়াছে তাহার সাধনা। এ যেন সত্যের পথ নয়, এ পথে কল্যাণ আসিবে না।

না, না, এ মিথ্যা। তাহার জীবনও কি সার্থকতায় ভরিয়া উঠে নাই? এত বড় স্কুলের কর্ত্রী সে। এই তিন শত ছাত্রীর

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর ভাল-মন্দ তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই ত বাংলার শিক্ষক সলিলবাবু, কমিটি কিছুতেই লইতে রাজী হয় নাই,—একে পুরুষ, তাহাতে অল্প বয়স। কিন্তু সে তাহাকে লইয়াছে।

সলিল লোকটিকে বেশ লাগে। বয়স কতই বা, তাহার-ই সমান বোধ হয়, কি কিছু বেশী। কিন্তু বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখায়। তাহার হইয়া স্কুল কমিটির কাছে সুপারিশ করিলে লতিকা মুচকাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুবর্ণা দি, হঠাৎ এ ভদ্রলোককে কোত্থেকে জোগাড় করলে?"

সে নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল, "এম-এ পাশ, আর যে মাইনে চেয়েছেন, তাও খুব বেশী নয়। বিশেষতঃ ফিমেল টিচার্ ও-মাইনেয় পাওয়া যাবে না। কাজেই তোমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে?"

"না, না, আপত্তি আর কি—ভালই ত, ভদ্রলোক বেশ, চমৎকার। কিন্তু—না থাক।" বলিয়া লতিকা ফিক্ করিয়া হাসিল।

তাহার ভাল লাগিল না, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি?"

লতিকা কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী!" বলিয়াই হাসিয়া সরিয়া গেল।

সুবর্ণা বুঝিতে পারে। চশমাটা রুমাল দিয়া মুছিয়া আবার চোখে লাগাইয়া দিয়া কথাটা মনে মনে আবৃত্তি করিতে থাকে।

কুণ্ঠিত-পদে ঘরে ঢুকিল বাংলার নূতন শিক্ষক সলিল। ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া কি বলিবার জন্য ইতস্তত করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার এ কি হইল? বুকের ভিতরটা এত দুলিয়া উঠে কেন? মানুষকে দেখিয়া মানুষ এত উতলা হয়, সে কখনো মনেও করে নাই। প্রাণপণে চেয়ারে চাপিয়া বসিয়া রহিল, পায়ের নীচে ভূমিকম্প সুরু হইয়াছে যেন।

সলিল মৃদু স্বরে ভূমিকা আরম্ভ করিল, "অসময়ে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম।"

কিন্তু সে মুখ তুলিতেই পারিল না, একখানা খাতার পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, "বলুন।"

সলিল সবিনয়ে কহিল, "আমায় তিন দিনের ছুটি দিতে হবে মিস্ সেন।"

হঠাৎ তাহার কি যেন হইল। কঠোর মুখে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"আমার স্ত্রীর অসুখ, এই মাত্র চিঠি পেলুম।"

"কিন্তু জানেন ত, এ্যাপয়েণ্টমেণ্টের এক মাসের মধ্যে ছুটি পাওয়া যাবে না?"

তাহার কণ্ঠস্বরে সলিল চমকাইয়া উঠিল, তবু বলিল, "আজ্ঞে জানি বৈকি; কিন্তু আমার বড় দরকার। আর আমার বিশ্বাস, আপনি একবার স্কুল-কমিটিকে অনুরোধ করলে, তাঁরা আর অমত করবেন না।"

তীব্র স্বরে সুবর্ণা জবাব দিল, "আপনার জন্যে অনুরোধ করব এত সময় আমার হাতে নেই। ছুটি আপনি পাবেন না, নিয়ম নয়।"

সলিল তাহার রুক্ষ মেজাজের কোন কারণ-ই খুঁজিয়া পাইল না,—ম্লান-মুখে ঘর ছাড়িয়া গেল।

আজ রাত্রে সলিলের মলিন মুখখানি মনে পড়িতেই বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।

হঠাৎ বড় আর্শীর দিকে নজর পড়িতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। একি হইয়াছে? গালের উপরকার মাংস কুঁচকাইয়া গিয়াছে, কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিয়াছে; চামড়া আল্গা, মাথার সিঁথি চওড়া—সৌন্দর্য আজ বিদায় মাগিতেছে। সারা দেহ ঘিরিয়া ব্যর্থ যৌবন

হাহাকার করিয়া উঠে। সে আর পারে না। আলো নিভাইয়া দিয়া জোর করিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লয়।

গভীর নীল আকাশ। কোথাও এক বিন্দু মেঘ নাই। দূরে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে চাঁদ দেখা যায়। কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে তাহার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। ঘুম আসে না। এ কি সে কাঁদিতেছে! মুছিবার চেষ্টাও করে না। কান পাতিয়া শোনে, কাহার যেন বাঁশীর স্বর ভাসিয়া আসে। কাছে আসিতে স্বর স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু কত গান, কত বাঁশীই ত সে শুনিয়াছে; আজ কেন দুই চক্ষু বাহিয়া বর্ষার ধারা নামে? কেন? কে তাহার উত্তর দিবে?

ক্রমে বাঁশীর স্বর আরো কাছে আসে—আরো—আরো। হৃৎপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া বাহিরে আসিতে চায়, সারা দেহ অবশ হইয়া আসে। ক্রমে বাঁশীর স্বর দূরে মিলাইয়া যায়।

বাণী হাই স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ সুবর্ণা সেন শয্যার উপর লুটাইয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

সিগারেট

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ জন্ম—আঠারো শ' ছিয়ানব্বই সালে—দ্বারভাংগায়। পৈতৃক বাসভূমি হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় চাতরা গ্রামে। ছাত্রজীবন—দ্বারভাংগা, কলিকাতা ও পাটনায়। এর ছোটগল্প গ্রন্থ "রাণুর প্রথম ভাগ" ও "রাণুর দ্বিতীয় ভাগ"। বর্তমানে ইনি বর্ধমান রাজপ্রেস অফিসে ইন্‌চার্জের পদে আছেন।

নূতন বউ বাসরঘরে যাইবার সময় তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। কোন মতেই যাইবে না সে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়, সে শুধু বলিয়াছিল, সংগদোষে একটা ভয়ানক বদ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে, সিগারেটে গোটা কয়েক টান দিয়া সে ঢুকিবে বাসরঘরে। একটি মিনিট দেরি, ভিতরে গিয়া তো আর টানিতে পারিবে না।

বাসর সংগিণীদের একজন চিপ্‌টেন কাটিয়া বলিল—"তাতেই বা ক্ষতি কি? মেম সাহেবেদের পদাংক অনুসরণ ক'রে তো সবাই এল একে একে—বব্‌, ডান্স, ফ্রি ল্যভ, সিগারেট,—আর বেচারি সিগারেট মুখচুম্বনের অধিকার যখন পেয়েচেই, তখন বাসরঘরে ঢুকতে আর দোষ কি? দু'দিন পরে তো ঢুকবেই।"

ক্রমে উত্তেজিত বচসা, কথা কাটাকাটি। কথাটা সামান্য, কিন্তু জেদাজেদির উপর একেবারে অন্যরকম দাঁড়াইয়া গেল।

অনেকে উভয় পক্ষের রাগ ভাঙাইবার চেষ্টা করিল। পরে যাহা হইবার হইবে, আপাতত ভিতরের এ কেলেংকারীটা বাহিরে না প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু রাগ মানান গেল না। নিজের সুটকেশটা হাতে ঝুলাইয়া নূতন বধূ বাহির হইয়া পড়িল। "ঢাক-ঢাক" সত্ত্বেও খুব

একটা গোলমাল হইল। কয়েকজন সংগে সংগে খানিকটা আসিল, তাহার পর হাল ছাড়িয়া আবার ফিরিয়া গেল।

যাহাতে আবার আসিয়া কেহ উপদ্রব না করে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি কয়েকটা গলি বদলাইয়া শেষে একটা সরু গলিতে আসিয়া পড়িল এবং সেটা যেখানে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে সেই মোড়ে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের হাওয়া লাগিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক তখন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে বোধ হয়, নিজের বেশভূষার পানে চাহিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল রাগের মাথায় কাজটা ভাল হয় নাই ; এই সাজ-শয্যা, এত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে! একবার মনে হইল পুরুষের বেশ ধরিয়া লয়। কিন্তু সে তো আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হয় না, তাহা হইলে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়।—না কস্মিন কালেও নয়, আবার সেই জায়গায়?—এত ভয়ই বা কিসের? লোকে হদ্দ মনে করবে একজন অতি-আধুনিকা, ব্যস্। তা করুক গিয়া মনে মনে প্রাণ ভরিয়া, সে কেয়ার করে না।

তবে নিতান্ত নব বধূর যা আভরণ—মাথার ঝাপটা, হাতের রতনচূর, খোঁপার কাজললতা, গলার মালা, এগুলা খুলিয়া সুটকেশে রাখিয়া দিল। একটা জলের কলে মুখের চন্দন-রেখা মুছিয়া লইল।

এদিক হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য ভাবনা, অর্থাৎ কাজের ভাবনা মাথায় আসিয়া উদয় হইল। হাতে একটা পয়সা নাই, এদিকে ক্ষুধাও খুব পাইয়াছে। রাগে অভিমানে কাহারও কাহারও ক্ষুধা কমে, কিন্তু ইহার যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

সব সমস্যার সমাধান সেই বালীগঞ্জ লেক, কিন্তু সে যে বহুদূর! উপায় কি? ফিরিয়া যাইবে?—ফিরিবার নামে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ছিঃ, ধিক তাহার কলেজে পড়া আধুনিক উচ্চ শিক্ষাকে! ধিক তাহার আত্মসম্মান জ্ঞানকে? আবার সেই জায়গা?

কৌতূহলী নজর পড়িতেছে—ক্রমে বেশী বেশী—নিকট দূর দিয়া যে-ই যাইতেছে তাহারই গতি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। দুই একজনের দাঁড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ কি সব সমস্যার সমাধান করিয়া লওয়া দরকার হইয়া পড়িল। যায়গাটা হঠাৎ মাথা ঠাণ্ডা করিবার এত অনুকূল হইয়া পড়িল কি করিয়া?

নূতন বধূর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল; বুকের নিকট হইতে রঙিন সুগন্ধি রুমালটা বাহির করিয়া হাতে করিয়া ধরিল এবং বেশ "লপেটি" গোছের একজন মন্থর গমনে যেই তাহার পাশ দিয়া যাইবে, আঙুল কয়টি আলগা করিয়া দিল।

"আপনার রুমাল,—পড়ে গিয়েছিল?"

"ও, খেয়াল করিনি; ভাগ্যিস আপনি দেখলেন। ধন্যবাদ।"

"মেন্‌শ্যন করবেন না দয়া ক'রে। হঠাৎ চোখে পড়ল, তাই—"

একটু ইতস্তত করিয়া—"কোন রকম উপকার করতে পারি কি? মনে হচ্চে যেন···মানে, কারুর অপেক্ষা করচেন কি?"

একটা আঙুলের নখ কামড়াইয়া—"উপকার?—হ্যাঁ—না···"

হঠাৎ নাটকীয় ভংগিতে—যেন বলিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও—"আপনি অনুমান করেছেন ঠিক—না ব'লে আমার উপায়ও নেই... আমার এক আত্মীয়ের সংগে এইখানে সন্ধ্যার সময় দেখা হওয়ার কথা—তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি—কী তাঁর মনে ছিল জানি না, কিন্তু এখন দেখছি তিনি আর এলেন না।"

হর্ষের মাঝে দুশ্চিন্তার ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া—"তা হলে?"

ভয়-ব্যাকুল ভাবে—"কি ক'রে ফিরে যাব?—এ দিককার পথ-ঘাট কিচ্ছু জানি না, কোথায় ট্রাম কোথায় কি—ট্যাক্‌সি আর গাড়িতে একলা যেতে কখন সাহস হয় না—"

"একলাই বা যাবেন কেন? যদি আপত্তি না থাকে—"

পরম বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টিতে—"অসুবিধে হবে না আপনার? এতটা রাত হয়ে গেছে? না হলে সত্যি আমিই বা কি করব? কতক্ষণ এ অবস্থায়—"

একটা ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেছিল, "লপেটি" ডাকিলে ফুটপাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। নববধূ জড়িত চরণে উঠিয়া বসিল, যুবক উঠিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"লেক রোড।...কিন্তু আপনাকে দয়া ক'রে একটু আগেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। খানিকটা হেঁটেই যাব।"

"কেন?"

সংগিণী শুধু সংকুচিত ভাবে মুখের দিকে চাহিল।

তাহাতেই উত্তর পাইয়া যুবক বলিল—"ও!...বেশ, যেমন আপনার অভিরুচি।" একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

মোটর উড়িয়া চলিল, মনও কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে, কতদূর কোন অজানা জগতে।

নববধূ তীব্র বায়ুস্রোত হইতে যেন রস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"মাগো, বাঁচলাম! গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছল।"

গাড়ীর ঝাঁকানির সুবিধায় "লপেটি" একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল, দরদ মাখা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করিল,—তেষ্টা পেয়েছিল?"

"নাঃ।"

আবদারের স্বরে—"না, নিশ্চয় পেয়েছিল, লুকোচ্ছেন?"

একটু চুপচাপ।

"বলবেন না? আর সত্যিই তো আমার জানতে চাওয়ার অধিকারই বা কি?"

"সেই চারটের সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—সেই থেকে—"

"কি সর্বনাশ! সেই চারটে থেকে মুখে একটু জল দেন নি? তাই বলি—মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

একটু পরেই ট্যাক্সি গিয়া কর্পোরেশন স্ট্রীটের বেশ একটি ছোটখাট ভদ্র অথচ নিরিবিলি হোটেলের সামনে দাঁড়াইল।

রাসবিহারী এভেনিউতে পরস্পরের বিদায় দৃশ্যটি হইল বড় করুণ। "লপেটি" হোটেলে গোপনে একটি পেগ টানিয়া লইয়াছিল, বিদায় দিবার সময় হাতের একটি সোনারআংটি খুলিয়া সংগিণীর অনামিকায় পরাইয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কণ্ঠ আরও গদগদ হইয়া পড়ায় বলিতে পারিল না। নববধূটি দূরের একটা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া নামিয়া পড়িল, তাহার পর লেক রোড ধরিয়া চলিল।

মেসে আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড! সবার মুখে শুধু ত্রস্ত প্রশ্ন,—"এ্যাঁ! তুই এই বেশে এই এতটা পথ এলি কি করে?"

"আর ওদের প্লে শেষ হয়ে গেল?—এরই মধ্যে!"

"সে কিরে! তুই বাসরঘরের সীনের আগেই চলে এলি—ঝগড়া করে? বন্ধ হয়ে গেল তো তাদের প্লে?"

"অবশ্য চালিয়ে নেবেই তারা কোন রকম ক'রে, থিয়েটার কিছু বন্ধ হবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হলধরবাবু, এটা আপনার ভাল হ'ল না মশাই।"

হলধর পরচুলাটা আছড়াইয়া টেবিলে ফেলিয়া, নববধূর বেনারসীটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "আচ্ছা, মন্তব্য পরে হবে'খন; এখন তাড়াতাড়ি কেউ একটা সিগারেট ছাড় দিকিন, পেট ফুলছে, বাব্বা!"

চিনিবার উপায়

মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়

মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম—বাংলা তেরোশ' ষোল সালে বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামে। পৈতৃক বাসভূমি—হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে। ছাত্রজীবন—হুগলী ও কলিকাতায়। বর্তমানে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের ডেমনস্‌ট্রেটার এবং চিকিৎসা ব্যবসায় লিপ্ত আছেন।

যাত্রা সুরু……

মেল ট্রেন,—কোন্ প্রত্যূষে আলো-আঁধারের অস্বচ্ছতা, জন-কোলাহল ও মুখর কর্ম ব্যস্ততার মাঝে বিরাট এক স্‌টেশন্ হইতে দিনরাতের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া এই বিশালকায় যন্ত্রদানবের পথচলা সুরু হইয়াছে; এখনও তার শেষ হইল না। মাঝে মাঝে গতি হইয়াছে মন্থর, ছুটিয়া চলার সাময়িক বিরতি হইয়াছে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে আর পৌঁছিবে না বুঝি।

পূব দিক্ আলো করিয়া ছোট একটি পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠিল, সেই সূর্য ক্রমে আকাশের ঠিক মাঝখানটিতে গেল, আবার অস্তগমনের পথে পশ্চিম দিকে নামিতে নামিতে সম্মুখের ঐ নদীপারের বনানীর মাঝে এখন আবার অদৃশ্য হইতে চলিল; মহাকালের রথের মত মেল আমাদের ছুটিয়াই চলিয়াছে।

সুদীর্ঘ সেই ট্রেনটির বিশেষ একটি ইণ্টার ক্লাস কামড়ায় প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পনেরো যোল জন মাত্র আরোহী। ইহাদের মধ্যে জন দশেক একেবারে পথের সুরু হইতেই আছে। বাঁ-দিকের দুইখানি বেঞ্চ অধিকার করিয়া চারজন যুবক রহিয়াছে, পূর্ব পরিচিত বন্ধুই হোক্ অথবা প্রয়োজনের খাতিরে পথচলার বন্ধুই হোক্,

প্রায় দ্বি-প্রহর বেলা হইতে পরস্পরের পায়ের উপর টান করিয়া বিছানো একটি চাদরের উপর মহাসমারোহে তাহাদের তাস খেলা চলিয়াছে। মেল ট্রেনের গতির মাঝে সূর্যদেবের গতিবিধির খবরও তাহাদের অজ্ঞাত রহিয়া গেছে। একদিকের একটি কোণে বসিয়া তিনটি গৌরবর্ণ বৃদ্ধার আলাপ আলোচনার আর শেষ নাই—নানা বিষয়ের শেষে এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে পাগলের আলোচনাতে। কাহার জানাশুনার ভিতরে কে কত রকমের পাগল দেখিয়াছে—সেয়ানা পাগল, ঘর জ্বালানো পাগল, পর জ্বালানো পাগল—এমন কত কি।

উত্তর দিকের কোণের আর একখানি বেঞ্চে একটি সুদর্শন যুবক ও একটি সুশ্রী মেয়ে বসিয়া আছে। দু'জনে মিলিয়া একটি বাংলা মাসিক পত্র পড়িতেছে, অথবা ছেলেটিই পড়িয়া সস্নেহ অনুরাগে মেয়েটিকে শুনাইতেছে, মেয়েটির শুধু তাহাতে চোখ রহিয়াছে মাত্র। উভয়ের চোখে মুখে এমন একটি প্রশান্ত-আনন্দ ও তৃপ্তির আভাস রহিয়াছে যে, মনে হয় পৃথিবীতে আশা করিবার, কামনা করিবার আর তাহাদের কিছু নাই। বোধহয় বিবাহ তাহাদের বেশী দিন হয় নাই, উভয়ের সারাদেহে পরস্পরের প্রতি সানন্দ বিস্ময় লাগিয়া আছে এখনও। প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট অন্তরই মেয়েটির মাথার কাপড় হাওয়ায় দুলিয়া পড়িয়া যাইতেছে, আর প্রতিবারই সে অন্যমনস্ক অবহেলায় তাহা মাথায় তুলিয়া দিতেছে, তবু কেন যে সে তাহা তাহার মাথার খোঁপায় আঁটিয়া রাখে নাই কে জানে। আর ছেলেটি তাহাকে কি বলিতেছে, কি যে পড়িয়া শুনাইতেছে, তাহাতে মাঝে মাঝেই সুন্দরী বধূটি মৃদু হাসির কলোচ্ছাসে সেই জায়গাটুকুকে ভরাইয়া দিতেছে।

এবারে আমরা আমাদের দৃষ্টি সরাইয়া লইব কামরাটির দক্ষিণ প্রান্তে। বাম হাতের উপর মাথা রাখিয়া অলস অন্যমনে ট্রেনের

চিনিবার উপায়

বাহিরে দূর প্রসারী দৃষ্টি মেলিয়া আমাদের নায়ক বসিয়া আছে, গল্পের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাকেই আমাদের প্রয়োজন। নাম শ্রীঅনুপম রায়। বৎসর ছাব্বিশ বয়স, সুন্দর গৌরকান্তি, কবি ও ভাবপ্রবণ। ভিতরের বিচিত্র কলরব, মাঝে মাঝে সুদর্শনা বধূটির খুসির হাসি, সেয়ানা পাগলের কার্যকলাপের চিত্তহারী বর্ণনা, খেলার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেদের আনন্দ গুঞ্জন, এই সবই তাহার কানে যাইতেছে বটে কিন্তু তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। সে সমস্ত মন দিয়া বাহিরে প্রকৃতির বিচিত্র অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে।

ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নির্মেঘ নীলিমা, দূর বনানী-প্রান্তের আকাশে একটানা খণ্ড মেঘের সমুদ্র, দিগন্ত প্রসারী ধান্যক্ষেত্রের সবুজ শ্যামলিমা, লাইনের ধারের কাশফুলের শুভ্রতা, মাঝে মাঝে নিস্তরংগ এক একটি বিল, গোধূলির আকাশে উড্ডীয়মান নাম না জানা পাখীর দল, কোথাও দূর গ্রামের ছায়া-শীতল পথের উপর দু'একটি নর-নারী, সর্বোপরি মেল ট্রেনের এই ক্লান্তিহীন গতি, এই সব কিছুই তাহার মনে কেমন একটি মায়ার সৃষ্টি করিতেছে, আর মুগ্ধচিত্তে সে ভাবিতেছে; কে বলে এই পৃথিবী বৈচিত্র্যহীন, দুঃখ বিষাদে ভরা! দিকে দিকে এই যে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির মেলা, ইহারা প্রত্যেকেই কি মধুর এক এক খণ্ড কবিতা নহে, ইহারা কি মানুষের মন অবিচ্ছিন্ন আনন্দে ভরাইয়া রাখিতে পারে না!

হঠাৎ ছোট একটি স্টেশনের কাছে ট্রেন থামিয়া গেল। থামিবার সেখানে কথা নয়, চলার পথে অপ্রত্যাশিত কোন বাধা উপস্থিত হইয়া থাকিবে, তাই এই আকস্মিক বিরতি। অনেকেই জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া ট্রেনের গা ঘেঁষিয়া যতটা সম্ভব সম্মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি পাঠাইয়া দিল। অনুপমের দৃষ্টিও হঠাৎ ফিরিতে গিয়া সহসা এক

জায়গায় নিবদ্ধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল 'চমৎকার'! স্টেশন হইতে অদূরে একটি বাড়ীর ছাদের আলিসায় ভর করিয়া একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। আবেগময় দৃষ্টি মেলিয়া এই দিকেই, বুঝি বা তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বয়স তেরো চৌদ্দ'র বেশী নয়, কি অপরূপ রূপ, কি লাবণ্যময় দেহ! ইন্দুনিভ আননে ঘন পক্ষাবৃত কৃষ্ণতার দুটি চোখে কী সহজ একটি সরলতা মাখানো! অভদ্রতার কথা, অশোভনতার কথা তাহার মনে আসিল না, চিত্রিত প্রতিমার মত সেই মুখখানি হইতে অনুপম তাহার নিষ্পলক দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। মন তাহার একেবারে ভরিয়া গেল। নিম্নতল হইতে কে যেন 'অনু' বলিয়া ডাক দিতেই মেয়েটি একটু চঞ্চলা হইয়া উঠিল। অনুপম মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো প্রান্তর-লক্ষ্মি, আজিকার এই সোনার গোধূলিতে কী অভাবনীয় রূপেই না আমি তোমার দর্শন পাইলাম। এবারকার যাত্রা আমার ধন্য হইয়া গেল।

হঠাৎ ভিতরের মেয়েটির স্নিগ্ধ একটু হাসির ঝিলিক্ কানে আসিয়া বাজিতেই মন তাহার এক অকারণ বেদনার অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। সুন্দরী একটি প্রিয়তমা বধূকে লইয়া, আনন্দময়ী জননীর স্নেহপক্ষছায়ায় শান্তির নীড় বাঁধা আর তার হইয়া উঠিল না।

আহা কী সুন্দর মেয়েটি, যেন একটী স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ! 'অনু' দিয়া মেয়েটীর কি নাম কে জানে। উহারা যে কি তাই বা কে বলিবে, ব্রাহ্মণ, না মনে হয় কায়স্থ কিংবা হয়ত অন্য কিছুও হইতে পারে। আহা মেয়েটির বয়স যদি আর একটু বেশী হইত। এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সচেতন হইয়া সে হাসিয়া ফেলিল। অকারণ দুঃখের সপ্রতিভ হাসি। দুর্বল মনের একি অদ্ভুত কল্পনা তার, ছিঃ, ছিঃ! মন যে আমাদের কখন কোন অলস চিন্তাকে পাইয়া বসে।

চিনিবার উপায়

এক এক করিয়া তার অনেকগুলি মেয়ের কথা আজ মনে আসিতে লাগিল—আর সংগে সংগে তার দুষ্টামী ও খেয়ালের জন্য মা'র সেই প্রতিবারের বেদনা ও ক্ষুব্ধ অভিমান। ইচ্ছা করুক্ আর না করুক্ সকলের কথাই মনে আছে তার। পাত্রী হিসাবে যোগ্যতায় তাহারা কেহ-ই কি এই মেয়েটির চেয়ে কম ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে অরুণার কথা—মা'র কোন্ বয়সের কোন্ সখীর মেয়ে। বহু বাদ প্রতিবাদের পর মা'র ইচ্ছায় ও জেদে অরুণাকে তার দেখিতে যাইতেই হইল। চেষ্টা করিলে এখনও তার চোখ দু'টি যেন মনে আনিতে পারা যায়। আয়ত স্নিগ্ধ দু'টী চোখে বুদ্ধি ও নম্র সরলতার একটি সুমধুর ও সুস্পষ্ট আভাস ছিল। আর কিছুর দরকার নাই, সেই চোখ দুটি দিয়াই সে যে-কোন পুরুষকে মুগ্ধ করিতে পারিত। রূপ, গুণ, পড়াশুনা কোন দিক দিয়াই যখন সে তার কোন খুঁত্ ভদ্র বিবেচনায় বাহির করিতে পারে নাই তখন এক দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় যোগাইয়াছিল। মাকে আসিয়া সে বলিয়াছিল—ওমা, ও যে ডাক্তারের মেয়ে গো—সারা জীবন ওযে শুধু ওষুধ খেতে চাইবে আর ওষুধ খাওয়াতে চাইবে। অমন কাজও করে, ছিঃ, ছিঃ! মনে আছে মা রাগ করিয়া তার কথারও উত্তর দেন নাই আর দুদিন কথাও বলেন নাই তার সাথে। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে মা'র রাগ ভাঙাইয়াছিল সে। তারপর সেই মেয়েটি, মল্লিকা না মালতী কি নাম! শুধু বলিতে পারা যায় কি করিয়া, তবু—তার যেন সামান্য বেদনার সহিত আজও মনে হয় তার চোখে সে যেন একটি সকরুণ মিনতির আভাস দেখিয়াছিল। আজ আর সে কথা অবশ্য মনে আনিয়া লাভ নাই, মাকে সেবার সে বলিয়াছিল—মা ওযে উকীলের মেয়ে গো। তুমি জান্তে না বুঝি! ওযে সারাজীবন খালি মিছে কথা বল্‌বে, আর মিছে কথা বল্‌তে শেখাবে। আর বাপের

কাছেও বুঝি বক্তৃতা দিতে শেখেনি মনে করছো! মা ধমক দিয়া উঠিয়াছিলেন—হতভাগা, বিয়ে না করবি, ভদ্রলোকদের নামে যা-তা বলবি কেন?

আরও আছে—সে মেয়েটির নাম বুঝি ছিল 'লেখা' না 'রেখা'। সেবারে সে বলিয়াছিল কিনা—মা তুমি রাগ করো না, কিন্তু ওযে পুলিশ অফিসারের মেয়ে গো—পুলিশকে ভয় করতে হয় জানো না? সারা জীবন ওযে শুধু আমাকে স্পাই করবে, আমার চলা ফেরার ওপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখবে। মা সেবারে আর কখনও তাহাকে বিবাহ করিতে না অনুরোধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ভাল—ভাল, সমস্ত মেয়েই মুছিয়া যাক্ স্মৃতিপট হইতে। কিন্তু স্টেশন্ মাস্টারের মেয়ে, চমৎকার! উন্মুক্ত প্রান্তরের ধারে, উদার আকাশের নিম্নে, প্রতিবাসীর সাহচর্যের আবিলতাহীন পরিবেশে স্বচ্ছহৃদয়া কুমারী। চঞ্চলতা নাই, তরলতা নাই, আছে স্নিগ্ধতা কোমলতা। তরুণ কুসুম সদৃশ বুকটিতে আজিও হয়ত কোন উদাস ম্লানিমা ছায়াপাত করে নাই। চমৎকার!

অনুপম কবি, কল্পনাবিলাসী—এবং কলিকাতার কোন বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত স্বচ্ছল তার। কলিকাতার নিকটবর্তী একটি পল্লীতে, দাস-দাসী পরিবৃত বৃহৎ বাসস্থানে তা'র মা থাকেন একলা। মা'র ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সত্বেও সে বারমাস সেখান হইতেই যাতায়াত করে না, বা সেখানেই থাকে না। থাকে কলিকাতার এক মেসে, মাঝে মাঝে মার কাছে যায় শুধু। কারণ আর কিছুই নয়—মেসের জীবন তার বড় ভাল লাগে। মনে হয় তার তাহাতে যেন কেমন একটি মায়াময় বৈচিত্রের সুর আছে।

দ্বিতল কি ত্রিতল একটি বাড়ীতে, একটি একটি করিয়া পাশাপাশি কয়েকটি ঘর, কোন ঘরে একজন কোন ঘরে বা অধিকসংখ্যক অধিবাসী।

চিনিবার উপায়

বিচিত্র তাহাদের জীবন, বিচিত্র তাহাদের জীবনধারা ! কেহ বা স্কুল কলেজের ছাত্র, কেহ অফিসের কেরাণী, কেহ কেহ ব্যবসায়ী, কেহ বা অন্য কিছু। বিশাল পৃথিবীর বিরাট অংগনে ভ্রাম্যমান কয়েকটি মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের তাগিদে সাময়িকভাবে দূর অদূর হইতে আসিয়া মিলিয়াছে ; পরস্পরের সহিত সাময়িক সাহচর্যের পরিচয় হইয়াছে, আবার প্রয়োজন ফুরাইলেই কে কোথায় চলিয়া যাইবে ঠিক নাই। একটি রেখাও হয়ত কেহ কাহারও বুকে আঁকিয়া যাইবে না। মাঝে মাঝে কেহ মেস্ ছাড়িয়া যায়। সীট্‌টি খালি পড়িয়া থাকে হয়ত কিছুদিন, তারপর আবার আসে নূতন মানুষ নূতন প্রকৃতি লইয়া। কেহ হয়ত একলা ঘরে বসিয়া বাঁশী বাজাইতে ভালবাসে, কেহ একটু বেশী খাইতে পারে, কেহ ঠাকুর চাকরের সহিত ঝগড়া করে—আবার কেহ-বা হয়ত ছাদে উঠিয়া প্রভাতে, অপরাহ্নে চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ছড়াইতে ভালবাসে। বিভিন্ন ইহাদের প্রকৃতি, তবু তার মনে হয় ইহাদের সকলের হাসি গান কোলাহলে মুখরিত সম্মিলিত জীবনধারায় কেমন যেন একটি সুসমঞ্জস কবিতার সুর আছে। মেসের সকলেই তাহাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, এবং সেও তা'র সুকোমল নির্বিরোধ প্রকৃতির দ্বারা প্রত্যেককে সহানুভূতি ও উপকার দানে বাধিত করে। স্বচ্ছন্দ ও সহজভাবে সাজানো তা'র একলার একটি ঘর। সেই ঘরে সে কখনও মেসের জীবন হইয়া কখনও আপন মধুর প্রকৃতি লইয়া কল্পনা বিলাসের মালা গাঁথে আর মাঝে মাঝে একলা হঠাৎ দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে। কাহাকেও বিশেষ জানায় না, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট স্থানও থাকে না, এটি তা'র মনের একটি বিলাস।

হঠাৎ একদিন মেসের এক ভদ্রলোকের একজন উকিল অতিথি দিন দশেকের জরুরি কাজে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভদ্রলোকের নিজের ঘরে জায়গা মাত্রও না থাকাতে তিনি সকরুণ ও সকাতর বিনয়ে অনুপমের দ্বারে আশ্রয়প্রার্থী হইলেন, এবং অনুপমও স্মিতসৌজন্যে তার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল। দু'একদিন যায়, সহজ শিষ্টালাপ ভিন্ন অনুপম কাহারও সহিত সাধারণ অন্তরংগতায় মিশিতে পারে না, আপন ভাবের নির্জনতায় সে চিরদিন অনাত্মীয়। তবু একদিন অতিথি উকিল রাত্রে তার সহিত একরকম জোর করিয়াই আলাপ করিতে লাগিলেন, 'অনুপম বাবু'।

'আজ্ঞে বলুন।'

'আপনি বিয়ে করেছেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'করবেন ?'

'আজ্ঞে না।' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট তা'র উত্তর। কিন্তু উকিল ছাড়িবার পাত্র নহেন। 'যদি দয়া করে করেন—একটি মেয়ে আছে—অতি চমৎকার—ক'দিনেই আপনার প্রকৃতিতে বড় মুগ্ধ হয়েছি—আপনার প্রকৃতির সংগে সুন্দর মানাবে—তাকে বড় ভালবাসি তাই—।'

'আজ্ঞে, এখন অন্ততঃ করব না ঠিক করেছি।'

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে উকিলের উচ্ছ্বাসময় আলাপ ঠিক শোভন হয় না তবু ভিন্ন মানুষের ভিন্ন প্রকৃতি হইয়া থাকে। তিনি আবার সুরু করিলেন—'মেয়েটি আমার স্ত্রীরই মাস্‌তুতো বোন্—অতিশয় সুশ্রী,—বাপ স্‌টেশন মাস্টার···।' শুধু কথার ভিতর কি কবিতা থাকে কে জানে—অনুপমের নিরুৎসাহ ভংগী নিমেষেই টুটিয়া গেল—নিমেষেই তা'র কবি-হৃদয় কল্পনার পাখায় ভর করিয়া দূর অতীতের এক সোনার গোধূলিতে একটি সুন্দর পরিবেশের মাঝে চলিয়া গেল। তাহার কবি-মন আজও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, ছাদের আলিসায় ভর করিয়া

অত্যন্ত অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকা সেই প্রান্তর-লক্ষ্মীর মুখচ্ছবিটি। কিন্তু হায়! সে-দিন সে অলস কল্পনায় অবগাহন করিয়া নিমগ্ন হইয়াছিল। খেয়াল করিয়া স্টেশনের নামটিও জানিয়া রাখে নাই, আর রাখিয়াই বা কি হইত!......

কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। মা'র পুনঃ পুনঃ জিদ ও অনুরোধ, এবং ডাক্তার উকিল ও পুলিশ অফিসারের মেয়েদের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, উকিলের বক্তৃতার জন্যই হোক বা ভবিতব্য ও অন্য কোন কারণেই হোক্ তাহাই সম্ভব হইয়াছে; অনুপম বিবাহ করিয়াছে, এবং পাত্রী সেই উকিলের স্ত্রীর মাসতুতো বোন্। স্টেশন মাস্টারের মেয়ে। কবি অনুপম নূতন আনন্দের ভাব-রসধারা পানে মগ্ন হইয়াছে, তাহার কল্পনার অশরীরী আত্মা নূতন সজীব প্রেরণায় অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হইতেছে।

অনুসূয়া তা'র স্ত্রীর নাম, ছোট স্টেশনের ধারে অনেকদিন আগে দেখা সেই মেয়েটির মতই অবিকল মুখ, তেমনই আয়ত চোখ, তেমনই লীলায়িত দেহভংগী। সেই মেয়েটিরই একেবারে খুঁত্‌লেশহীন প্রতিচ্ছবি, শুধু তার চেয়ে চার পাঁচ বছর বয়স বেশী। অনুপমের কবি-প্রাণ বিস্ময়ে অবাক হইয়াছিল, ইহা সম্ভব হয় কিরূপে। কিন্তু প্রথম প্রেমের নিভৃত গুঞ্জনের দিনগুলিতে অনুসূয়া একদিন ইহার ভিতরকার মধুর রহস্য ও বিস্ময়ের বস্তুটিকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। আলিসায় দেখা সেই মেয়েটি অনুসূয়ারই আপন ছোট বোন। তাহার জন্মের বছর দুই পরে একটি ভাই হইয়া মারা গিয়াছিল, তার আরও বছর দুই-আড়াই পরে জন্মায় ও। শুধু যা ছোট তাই, নইলে অনুসূয়াকে ও ওকে একেবারে অবিকল এক রকম দেখিতে, ঠিক দু'টি যমজ বোনের মত।

এখানে অনুপম বলিয়াছিল—কিন্তু নাম, আমিও স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম

কে যেন ওকে 'অনু' বলিয়া ডাক দিয়াছিল। তুমিও ত তখন তোমার মাসীমার বাড়ীতে ছিলে বলেছ। ইহারও অনুসূয়া সুমীমাংসা করিয়াছিল, বলিয়াছিল—আমি অনুসূয়া ও অনুরূপা। বেশ, ভাল।—ইহার কিছুদিন পরে অনুপম একবার শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছে। একদিন তখন অপরাহ্ন বেলা—অস্ত সূর্যের বিলীয়মান রক্তিমা ভার উপর আসন্ন সন্ধার অস্পষ্ট ছায়া পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অনুপম ছাদের উপর একটি আরাম কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। একটু দূরে তাহার শ্যালিকা অনুরূপা ছাদের আলিসায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অমনি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা তাহার যেন অভ্যাস। হঠাৎ অনুপমের মাথায় এক সুন্দর কৌতুকাবহ কল্পনা জাগিয়া উঠিল। সে ডাকিল, 'অনুরূপে।' মিষ্ট গলায় শ্যালিকা উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হুকুম হোক।'

'সখি, শ্রবণ করো।'

'বলুন কবিরাজ।' অনুরূপা তাকে ঠাট্টা করিয়া কবিরাজ বলিয়া ডাকিত। অনুপম বলিল, 'শোন, আমি এক সমস্যায় পড়িয়াছি, ধর—'

'আচ্ছা ধরিতেছি।'

'না, না, ধরিতে হইবে না কিছু, শোন। আচ্ছা—যদি কোন ঈষদাতপ্ত চৈত্র অপরাহ্নে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয়, নির্মল আকাশের নীচে ছাদের উপর এমনি করিয়া আমি বসিয়া থাকি, যদি ওই প্রান্তর-পারের সরসী-তীরবর্তী নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী কাঁপাইয়া ও আমাদের আলিসা-সংলগ্ন কামিনীশাখা হইতে অসংখ্য ফুল ঝরাইয়া ঝুর ঝুর দক্ষিণা পবন বহিতে থাকে, আর যদি—' এমন সময় অনুরূপা বলিয়া উঠিল, 'চলুক চলুক আর যদি' অনুপম কৃত্রিম ক্রোধে তাহাকে 'আঃ, ফাজিল মেয়ে, চুপ করো', বলিয়া থামাইয়া দিয়া আবার সুরু

করিল, 'আর যদি নিকটের কোনও বৃক্ষডালে বসিয়া 'কুহু' স্বরে কোকিল ও চিরবিরহী 'বউ কথা কও' পাখী ডাকিতে থাকে; যদি তুমি অমনি করিয়া ওইখানে দাঁড়াইয়া থাক, আর যদি এই সকল মধুর পরিবেশের মাঝে সদ্য-দিবা নিদ্রোথিত আমার মনে একটি আসন্ন মাদকতা জাগিয়া ওঠে, আর তখন আমার বাহুযুগল কাহাকেও আলিংগনের লোভে ও আমার ওষ্ঠাধর কাহারও ওষ্ঠাধরের মধু-স্পর্শের লোভে ব্যাকুল হইয়া ওঠে—তবে আসন্ন সাঁঝের সেই অস্বচ্ছ আলোয় তোমাকে আমি চিনিব কি করিয়া? তোমাকে তোমার দিদি বলিয়া যাহাতে ভুল না করি তাহার উপায় কী?'

মৃদুহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অমু উত্তর দিল, 'বড়ই কঠিন প্রশ্ন কবিরাজ, তবু আমার যথাসাধ্য ইহার উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তার আগে হে কবিরাজ আমার দু'একটি প্রশ্নের সাগ্রহে উত্তর দিন। প্রথমে বলুন দিদিকে কি আপনি ভালবাসেন?'

অনুপম বলিল, 'সখি, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এখনও অহেতুক লজ্জায় আমার গাল দু'টি রাঙিয়া ওঠে, তবু, তোমার দিদিকে জানাইও না— সত্যই বলিতেছি, সত্যই আমি তাহাকে ভালবাসি, এবং অন্য কোন দুর্ঘটনা না হওয়া পর্যন্ত বোধ করি ভালই বাসিতে থাকিব।

'যাক্', আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'দিদিকে কি আপনি কোন দিন দেখিয়াছেন?'

অনুপম বলিল, 'সখি, আমি মর্তমানব, দেবতাদের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নাই—আমাদের নাসিকার দুইপার্শ্বে যে দু'টি চর্মচক্ষু আছে তাহাদেরই সাহায্যে যতদূর দেখা সম্ভব ততদূর তোমার দিদিকে আমি দেখিয়াছি। তার বেশী ত পারি নাই।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, কবিরাজ, উহাতেই হইবে—এখন দেখুন যাহা

দেখাইতেছি।" অনুপম দেখিল, স্বগৌর বাম গালের প্রায় মাঝখানটিতে একটি গভীর কালো তিল অপরূপ শোভায় চিক্ চিক্ করিতেছে।

হঠাৎ অনুর দিকে মুখ পড়িতেই অনুপম কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি হাসিতেছ পাষাণি।'

এমন সময় চা ও সন্ধ্যাকালীন খাবার লইয়া ছাদের দরজায় 'অনু'র মা আসিয়া ডাক দিলেন, 'বাবা অনু'। 'মা' বলিয়াই অনুপম সোজা হইয়া বসিল, তারপর ছোট টেবিলটির উপর হইতে চায়ের কাপটি তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুমুক দিতেই দেখিতে পাইল,—অদূরে দাঁড়াইয়া 'পাষাণী' তখনও দুষ্টামিভরা চোখে তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাসিতেছে, আর বাম হাতের একটি আঙুল দিয়া—তাহাকে চিনিবার উপায় সেই তিলটি দেখাইয়া দিতেছে।

মানুষ

সনৎকুমার নাগ

সনৎকুমার নাগঃ জন্ম—উনিশ শ' বাইশ সালে বিক্রমপুর, ভাটপাড়া গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান—বিক্রমপুর, রাজানগর গ্রামে। ছাত্রজীবন—বহরমপুর ও ময়মনসিংহ। এঁর প্রথম রচিত বই অগ্রজ সতীকুমার নাগের সহযোগিতায় 'কবি বিষ্টুদা'। বর্তমানে নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

সুজিতের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া যায়।

উঠি উঠি করিয়া আর ওঠা হয় না। কেমন যেন একটা জড়তার ভাব আসে। চাদরটা ভাল করিয়া টানিয়া দিই। ইচ্ছা করিয়াই চোখ বন্ধ করিয়া রাখি। নিদ্রার ভাব না থাকিলেও অলসতার ভাবটাই বেশী করিয়া বোধ করি।

সুজিত একটা ঝাঁকুনি দেয়ঃ "নে, নে, উঠে পড়। চা যে জুড়িয়ে গেল।"

আঃ, গরম চা। মুখে দিবার আগেই বেশ আরাম অনুভব করি।

মেসের চাকর হারু। ঝাঁটা হাতে হাজির হয়। ঝাঁটার শব্দ তুলিয়া এদিকের ধূলা ওদিকে আনে আর ওদিকের ধূলা এদিকে আনে। বাজে ছেঁড়া কাগজগুলি বাঁ হাতে করিয়া হারু লইয়া যায়। ধূলাগুলি তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকে।

সুজিত চায়ে চুমুক দিতে দিতে আরম্ভ করে—কাল রাত্রে কোন এক পার্টিতে গিয়া কি করিয়া আসিয়াছে। আভাদেবীর সুন্দর শাড়ীর আঁচলটা নাকি—।

সুজিতের কথা শুনিবার সময় কই? নাঃ, আর থাকা যায় না। উঠিয়া পড়ি। সুজিত রাগ করে। তার অমন সুন্দর গল্পটা ধামা চাপা পড়ে। একটু যদি রসবোধ থাকে আমার!

সোজা নীচে নামিয়া আসি। চৌবাচ্চার পাড়ে গঙ্গা যাত্রীর মত ভীষণ ভীড়! বাল্‌তির ঘন ঘন ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ শব্দ। কে কার আগে স্নান সারিয়া উঠিবে তাহারই পাল্লা চলে। একটু দেরী হইলেই জল আর পাওয়া যাইবে না এই ভয়।

সবার আগে ওঠেন ও-ঘরের চক্রবর্তী খুড়ো। বাল্‌তি বাল্‌তি মাথায় জল ঢালেন তবু তাঁহার স্নান শেষ হয় না। চৌবাচ্চার জল প্রায় শেষ হইয়া আসে।

মোটা বেঁটে চন্দন রাগিয়া যায়: "ও'হে চক্রবর্তী খুড়ো—এটা রাম রাজত্ব নয় যে সব—"

চক্রবর্তী গলা হইতে উপবীত খুলিয়া দুই হাতে বেশ একচোট ঘষিতে ছিলেন। সংগে সংগে কি একটা মন্ত্র গুণ গুণ করিয়া আওড়াইতে ছিলেন। বলেন: "আর দু'বাল্‌তি এই যা হাত-পা' ধুতে—"

তাহার দু'বাল্‌তি অর্থাৎ কুড়ি বাল্‌তি!

চন্দনও ছাড়িবার পাত্র নয়। কথায় কথায় কথা বাড়ে।

তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হয়। মেসের সব লোক আসিয়া জড়ো হয়। দুই একজন যাহারা তখনও ঘুমাইতেছিল তাহারাও গোলমালে উঠিয়া হাজির হয়।

চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। অভিশাপের ভয় দেখাইয়া সরিয়া পড়েন।

ছিঃ! ছিঃ! ভোরবেলা এই কেলেংকারী!

আমি কোন রকমে স্নান সারিয়া ওপরে আসি।

•

দশটা না বাজিতেই খাবার ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ হয়।

: "ঠাকুর, আর কত দেরী?"

: "এই বাবু হউচি, মাছ বাকী—।"

মানুষ

ঃ "আরে ঠাকুর, মাছ-ফাছ্ রেখে দাও। ডাল-ভাতই সই। অফিসের দেরী হ'য়ে গেল।"

ত্রিশ টাকার কেরাণীর ব্যস্ততাই বেশী। চাকরী যাইবার ভয়। চাকরী গেলে খাইবে কী? স্ত্রী-পুত্র সব উপবাস! ভাবিতেই তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া যায়। কাজ নাই তাহার মাছের। কোন রকমে ডাল-ভাত কিছু মুখে গুঁজিয়া সকলের আগে উঠিয়া পড়ে।

উপর হইতে ভোঁদা দা' মোটা গলায় হাঁকে ঃ "হারু, হারু, দোতালায় ভাত দিয়ে যা।"

এত বড় মেসের একটা চাকর। হারু কাহার কথা শুনিবে। ও-ঘর হইতে বীরুবাবু ডাকে ঃ "হারু, ডাইক্লিনিং থেকে এখ্খুনি আমার কাপড়টা আন্।"

সকলেরই ব্যস্ততা! এক মিনিট অপেক্ষা করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় আর কি! হারু কাপড় আনিতে যায়। ভোঁদা দা' হারুকে ডাকিয়া না পাইয়া রাগিয়া অস্থির হন। আজই সে এ-মেস ছাড়িবে। টাকা দিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। এ বিষয়ে ম্যানেজার হরেনবাবুর বলিবার কিছুই নাই। সে নামমাত্র ম্যানেজার। দুই বেলা খাইতে পায়। পয়সা লাগে না। তাই বাধ্য হইয়া ম্যানেজারী পদটা সে লইয়াছে। আজ কয়মাস চাকরী নাই। আগে নাকি কোন সওদাগরি অফিসে কাজ করিত। বুড়া বয়সে হরেনবাবু দ্বিতীয় বিবাহ করিতে দেশে গিয়াছিলেন অফিসের ছুটি নিয়া। দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে কাজের জবাব হয়। চাকরী গিয়াছে তাহাতে প্রথম দুই একদিন একটু যা মন খারাপ হইয়াছিল। চেষ্টা করিয়া খুঁজিলেই আরেকটা না হয় পাওয়া যাইবে। স্ত্রী গেলে ত আর পাওয়া যাইবে না। তিনি এবার নূতন স্ত্রী পাইয়াছেন এই যা সান্ত্বনা। সেই জন্যই চাকরীর

জবাবে ততটা বেশী দুঃখিত হন নাই। অবশ্য এই মেসের ম্যানেজারীটা অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিলিয়াছিল। খাইতে হইবে ত!

মেস হইতে এক পয়সা এদিক-ওদিক করিবার উপায় নাই। মেসের মালিক চন্দ্রবাবু ভয়ানক কড়া-মেজাজের লোক। অল্পতেই চটিয়া ওঠেন। হিসাবের বাইরে খরচ হইবার উপায় নাই। ইহাতে তাহার ব্যবসা থাকুক আর না-ই থাকুক।

হুম্ দাম্ করিয়া যে যাহার আগে পরে খাইয়া ওঠে। সবটাতেই একটা যে প্রতিযোগিতা লাগে তাহা বেশ বুঝা যায়।

সবার শেষে খাইতে আসিবেন আমাদের পাঁচুদা। পাঁচুদাটা যেন কি! সব বিষয়ে তার ঢিলেমি। পাঁচুদা কোন এক বীমা কোম্পানীর দালালী করেন। মেসেই তাহার কাজ। সংপ্রতি মেসের বাইরের দুই একজন লোকেরও খাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন যাহারা খাইতে আসে পাঁচুদা তাহাদের কাছে বীমা কোম্পানীর কথা আরম্ভ করে। যদিই-বা একটা হইয়া যায়।

পরেশ মেডিকেল কলেজে পড়ে। এনাটমিটা ভাল জানে। মেসের সবাই ডাক্তার বলিয়াই ডাকে। ডাক্তার পরেশ খাইতে বসিয়া খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করে: "ঠাকুর, মাছগুলো বড্ড বেশী ভেজে ফেলেছ। ওঃ, তরকারীটা কি ঝাল।"

মুখ দিয়া অদ্ভুত রকমের শব্দ বাহির করে: "এই যাঃ, ডালটায় যে হলুদের গন্ধ! ভিটামিন্ পদার্থ আজকাল বিলাতী বেগুনে আর নটে শাকে।" ডাক্তার পরেশ উপদেশ দেয়। রোজ খাইতে বসিয়া একটা না একটা বলিবেই। সবটাতেই তার খুঁত্ ধরা চাই। এ-বিষয়ে আমাদের প্রতুলদা খুবই ভাল। তাহাকে লইয়া কোনটাতেই গোলমাল নাই। সব রকমেই সে চলিতে পারে। জীবনটা

কোন রকম ভাবে চলিলেই হইল। দেখিলেই মনে হয় অতীত-জীবনে যেন কিসের একটা আঘাত পাইয়াছে সে। কথা বলে কম।

ভাল মানুষেরও কি পার আছে! নিরীহ প্রতুলদাকে বীরেনবাবু ক্যাব্‌লারাম বলিয়া ডাকেন। বীরেনবাবুর মতে প্রতুলবাবুর নাকি বুদ্ধির অভাব। বুদ্ধির জাহাজটা যেন তাহাদের কাছেই বাঁধা রাহয়াছে!

সুরেশবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বড় চাকরী করেন। তাই অহংকার। হারু, ম্যানেজার বাবু, ঠাকুর, এমন কি চন্দ্রবাবুও তাহাকে খাতির করিয়া চলেন। টাকা পয়সাটা চন্দ্রবাবু না চাহিবার আগেই পান কিনা। হারু মাসকাবারে দুই এক পয়সা যে না পায় তাহাও নহে। আর ঠাকুর? তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। সুরেশবাবু নাকি গরমের ছুটিতে ঠাকুরকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর সেইখানেই চাকরী করিবে। বড়লোকের বাড়ীর চাকরী। ভাবিতে আরাম লাগে ঠাকুরের। বরাত ভাল ঠাকুরের বলিতেই হইবে। সুরেশবাবুর খাইবার সময় ঠাকুর বাছা বাছা মাছটা, মুড়াটা ইত্যাদি পাতে দেয়। ইহাতে চন্দ্রবাবু বা ম্যানেজার প্রতিবাদ করেন না।

আমি এই হট্টমালার মাঝখানে নিঃশব্দে খাইয়া উঠিয়া পড়ি। অফিসের বেলা হইয়া যায়। রাস্তায় বাহির হইয়া লম্বা লম্বা পা ফেলি।

দুপুরবেলা মেসটা বেশ একটু নীরব থাকে। হারু মেসের অন্যান্য কাজ সারিয়া বেলা দুইটার সময় খাইতে বসে। বেচারী একা! হাড়-ভাঙা খাটুনি। ওর মুখের দিকে চাহিবার কেহই নাই। খাইবার সময় হারুর দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসে। বাড়ীতে মা হয়ত না খাইয়াই দিন কাটাইতেছে। পাঁচ টাকা মাইনে। সবই মাকে পাঠাইয়া দেয়।

ইহাতে কি মা'র চলে। হারুর খুব কষ্ট হয়। বেচারী চিন্তা করিবারও সময় পায় না। খাইবার সময় যা একটু—

: "হেই—হেই।" পাতের গোড়ায় কুকুরটা আসিয়া পড়ে আর কি! হারু কি মনে করিয়া আর খায় না। থালার ভাতগুলি কুকুরটার কাছে ঢালিয়া দেয়।

চারটা বাজিতে না বাজিতেই আবার কাজ আরম্ভ হয়।

ঠাকুর তাহার দেশওয়ালী-ভাইয়াদের কাছে দুপুরে একটু খৈনী খাইতে আর গল্প করিতে গিয়াছিল। আবার ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হয়। বেলায় বেলায় কাজ আরম্ভ না করিলে বাবুদের ঠিক সময়ে রাঁধিয়া খাওয়াইবে কি করিয়া। বিশেষত সুরেশবাবু—

অফিসের ছুটির সময়। একে একে সব আসিতে থাকে। দুই একজন অফিস হইতে খেলার মাঠে চলিয়া যায়।

অনিলবাবু কলেজের ছাত্র। সে আসে সকলের আগেই। তাহাকে লইয়া কোন গোলমাল নাই। হারুকে ডাকাডাকি করিবার প্রয়োজনও তাহার হয় না। স্টোভ ধরাইয়া চা, হালুয়া করে। কি মনে করিয়া হঠাৎ আজ হারুকে খানিকটা ভাগ দিল। হারু কল্পনা করিতে পারে না। মেসের চাকরের আবার বৈকালিক আহার! ক্ষণিকের জন্য হারু নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে।

সূর্যের আলোর রেখা ক্রমশ বিলীয়মান হইয়া যায়। বেশ একটু অন্ধকার হয়। ঘরে ঘরে বিজলী আলো জ্বলিয়া উঠে। একটু আগে জ্বালাইবার উপায় নাই। মেন স্যুইচ্ চন্দ্রবাবু নিজের হাতে বন্ধ করেন আর খোলেন।

রাত্রি দশটা না বাজিতেই খাবার-ঘরে কলরব ওঠে। আবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় কে কার আগে গিয়া খাইয়া আসিবে।

ভোঁদা দা' মেস ছাড়িবার কথা ভুলিয়া যান। উচিৎ পয়সা দিয়া মেসে থাকেন। কাহার কথায় এ-মেস ছাড়িয়া যাইবেন। সুর্ সুর্ করিয়া নীচে খাইতে নামিয়া আসেন।

রাত্রি বারটা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলে। ঠাকুর অতি গোপনে তাহার দেশওয়ালী-ভাইয়ার জন্য কাপড় ঢাকা দিয়া ভাত লইয়া যায়। এ-কাজটা সে বিশেষ সতর্কতার সহিত সারে।

হারু অধিক রাত্রি পর্যন্ত এঁটো বাসন-কোসণ পরিষ্কার করে।

সারাদিনের কর্মক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে বিছানায় এলাইয়া দিই। ঘুম আসে না। অসহ্য গরম বোধ হয়। জনকোলাহল মুখর মেসটা নীরব-নিস্তব্ধ। কি মনে করিয়া বাহিরে আসি। বাহিরে আসিয়া দেখি নীচেকার ছোট ঘরে কেরোসিনের একটা মৃদু আলো জ্বলিতেছে। নীচে নামিয়া আস্তে আস্তে ঘরের সম্মুখে আসি। হারু উবুর হইয়া একমনে একটুকুরা কাগজে কি যেন লিখিতেছে।

হয়ত অনেকদিন পর হারু মার কাছে চিঠি লিখিতেছে।

স্পাই

উমানাথ সিংহ

উমানাথ সিংহ : জন্ম—তেরশ' চব্বিশ সালে, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ। পৈতৃক বাসভূমি—রাজপুতনা। ছাত্রজীবন—জিয়াগঞ্জ। বর্তমানে চাকুরীতে লিপ্ত।

ভবতারণ কি সত্যই স্পাই? অন্ততঃ মেসের ছেলেরা তাকে তাই মনে করে। কারণ তার চাল-চলন ভাব-ভংগি সত্যিই অত্যন্ত সন্দেহজনক।

ভবতারণ সিংগেল সিটেড্ একখানা ঘর নিয়ে থাকে। সে যে কি করে কারো বোঝবার উপায় নেই—শুধু মাঝে মাঝে তা'র নামে কিছু মণিঅর্ডার আসে, এই পর্যন্ত।

সে-দিন কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি মেসের মধ্যে বেশ একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'য়েছে ভবতারণকে নিয়ে।

একটা ছেলে ভবতারণকে বলছে—নিশ্চয় আপনি স্পাই মশাই।

—না, বিশ্বাস করুন আমি স্পাই নই।

—কিন্তু আপনার চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা সব কিছুই যেন কেমন কেমন লাগে।

—তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস করাতে পারি আমি স্পাই নই, আপনারাই বলে দিন—তাই না হয় করব।

—না, না খুব হ'য়েছে; আর কিছু ক'রে আমাদের বিশ্বাস করাতে হবে না। অনুগ্রহ ক'রে এই মেস থেকে একবার—বুঝতেই তো পারছেন।

ভবতারণ বিস্ময়ের সুরে বলল—কি বললেন? এই মেস ছেড়ে চলে যাব?

—আজ্ঞে।

—আপনারা পাগল হ'লেন নাকি? এ মেস ছেড়ে কোথায় আমি পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে যাব।

ছেলেটি বলল—পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবেন কেন? অন্য মেসে উঠে আপনার কাজ সফল করবার চেষ্টা করুন গে—আমাদের আর জ্বালাবেন না!

—আচ্ছা, আপনাদের কবে কি ভাবে জ্বালিয়েছি বলতে পারেন? আমি তো চুপচাপই থাকি।

—ঐ চুপচাপ ক'রে থাকাটাই তো হ'য়েছে—

কথার মাঝখানে অন্য একটা ছেলে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—আপনার কোন কথাই আমরা শুনতে চাইনে। সুতরাং মানে-মানে সরে পড়ুন নতুবা শেষ পর্যন্ত লগুড়েন······

ভবতারণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল—মুখ সামলিয়ে কথা বলবেন—অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমিও এককালে কলেজ স্টুডেণ্ট্ ছিলাম।

—সে যে-কালে ছিলেন সেকালে, এখন তো নন্—সুতরাং বর্তমানের কথা ভাবুন—

—ভাবাভাবি আর কি আছে! আমি সরলভাবেই বলছি যে আমি স্পাইও নই, আর এ মেস ছেড়ে কোথাও যাব না।

—তা'হলে মশায় বাধ্য হ'য়ে আমাদের একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—দেখুন বেশী কিছু করবেন তো পুলিস আপনাদের রেহাই দেবে না।

ব্যস্। আর যায় কোথায়। মেসের প্রত্যেকের মনেই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল লোকটি নিশ্চয় স্পাই!

মেসে ফিরতেই আমার রুম্-মেট্ নির্মলেন্দু বলল—ওহে আজকের ব্যাপার শুনেছ?

বললাম—শুনেছি।

—আমার কিন্তু ভাই মনে হয় ভিতরে একটা কিছু আছেই। ভবতারণকে একদিন ডেকে জিগ্‌গেস করলে হয় না?

—মন্দ কি!

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে আমি আর নির্মলেন্দু ভবতারণকে সংগে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বিকেলের দিকে বেড়াতে গেলাম। এদিক-সেদিক অনেকক্ষণ বেড়ানর পর এক জায়গায় আমরা তিনজনে ব'সে গল্প করতে লাগলাম। কথা প্রসংগে আমি তাকে জিগ্‌গেস করলাম—আচ্ছা আপনি এরকম ভাবে থাকেন কেন? কারো সংগে বেশী মেলা-মেশা নেই, কথাবার্তা নেই—একা একা ঘুরে বেড়ান—

ভবতারণ বলল—আমি যে স্পাই তা জানেন না?

—ও যারা মনে করে তারা করুক, আমরা মনে করিনে।

নির্মলেন্দু বলল—কোন ছুটিতে বাড়ী যাওয়া নেই, কোন কাজকর্ম নেই অথচ এখানে চুপচাপ থাকেন। মাঝে মাঝে কোথাও দু'তিন দিনের জন্য চলে যান, কেউ তার পাত্তা পায় না, তারপর ফিরে আসেন; তা'ছাড়া এক একদিন রাতে মেসেও থাকেন না।

এমন সময় একটি যুবক ভবতারণের হাতে কি একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বিদ্যুত্বেগে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

ভবতারণ নির্মলেন্দুর কথার কোন জবাব দেয় না, মাটির দিকে মুখ নীচু ক'রে ভাবতে থাকে।

আমি বললাম—চুপচাপ ব'সে রইলেন যে?

—কি বলব বলুন?

—কেন নির্মলেন্দু কি বলল শুনলেন না।

—শুনলাম তো, কিন্তু বললে কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?

—কেন বিশ্বাস করবনা? আপনি বলুন।

—থাক আর শুনে কি করবেন, চলুন ফিরে যাই।

—কৌতূহল আর বাড়াবেন না, বলুন।

ভবতারণ কিছুক্ষণ থাকার পর বলল—যখন নেহাৎ-ই শুনতে চান তবে চলুন মেসে ফিরে যাই সেখানে আমার ঘরেই সব বলব।

নির্মলেন্দু বলল—কেন, এখানে বলতে আপনার আপত্তি কী?

—আপত্তি কিছুই না, তবে সেখানে সব কিছু দেখিয়েই না হয় বলা যাবে।

আমাদের কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল।

নির্মলেন্দুকে বললাম—চল, যখন বলছেন তখন এঁর ঘরে গিয়েই শোনা যাক।

মেসে ফিরে এলাম।

রাত তখন অনেক। ভবতারণ আমাদের ডেকে তা'র নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল—বসুন এই চৌকিতে।

আমি আর নির্মলেন্দু চৌকির উপর উঠে বসলাম। ভবতারণ তা'র একটা চামড়ার সুটকেশ চৌকির নীচ থেকে টেনে বার করল।

নির্মলেন্দু জিগ্গেস করল—ও সুটকেশটা আবার কেন?

ভবতারণ বলল—সুটকেসটার জন্যই তো আপনাদের এই ঘরে আনা নতুবা চিড়িয়াখানায় বললেই তো পারতাম।

—এবার তবে বলুন কী বলবেন?

ভবতারণ নিরুদ্ধকণ্ঠে বলল—আজ বলবার সুযোগ এসেছে, কিন্তু বলবার সময় নেই, বলে ভবতারণ সুটকেশটা হাতে তুলে নিল।

ভবতারণ বলল—আমি একজন বিপ্লবী, আমাকে এখনই পালাতে হবে, পুলিশ আমার খোঁজ পেয়েছে।

গভীর বিস্ময়ে আমরা বললাম—পুলিশ আপনার খোঁজ পেয়েছে কী করে বুঝলেন।

—জু-গার্ডেনে আমাদের দলের একজন সে খবর দিয়েছে। তাকে দেখেন নি?

হঠাৎ বাইরে তাকিয়েই ভবতারণ চম্‌কে উঠল, লাল পাগড়ী মেস ঘিরে ফেলেছে। ভবতারণ ঝড়ের মতো দুর্বার বেগে সুটকেস্ থেকে একটা রিভ্‌লবার বের করে তাদের সাম্‌না দিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। কোথায় কি করে গেল কেউ তার সন্ধান পেলে না।

পরের দিন সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বের হল, বিপ্লবী প্রলয়েন্দু নিখোঁজ; অন্যান্য বহু বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার।

মুখোমুখি

সরলা বসু

সরলা বসু: জন্ম—উনিশ' ছ'সালে, কলিকাতায়। পৈতৃক বাসভূমি—পটলডাঙার মিত্রবাটী। ৺গিরীন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা। শ্রীযুত প্রমথ বসু রায়ের পত্নী।

মুহূর্তের ঘটনা

রাজসাহী থেকে সোমেন ফিরে এলো: দেহমনে তার পরিবর্তনের ছাপ। মনে তার রুদ্ধ ঝড়ের নীরবতা—অপ্রকাশের নিবিড় বেদনা।

একটা চুরুটে টান দিয়ে সোমেন বাল্যবন্ধু হেমেনের দিকে তাকিয়ে বললে—না, কোথা দিয়ে যে কী হয়ে যায় মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না। আজ যা' আছে কাল তা' কোথায় হারিয়ে যাবে কে বলবে?

হেমেন জবাব দিলে—কেন, কিছু হারিয়েছে নাকি?

—কিছুটা তাই।

—মানে?

—মানে অনেক দিনের একটা পুরনো জিনিষ হারিয়ে গেল।

—কি হারালে হে, রাজসাহী গিয়ে নাকি?

—হঁ্যা, রাজসাহীর এক নির্জন প্রান্তরে হারিয়েছি। তবে টাকা পয়সা নয়, নিজের মনটি।

হেমেন হেসে বললে—বেশ, বেশ। মনটি হারিয়ে এসেছ ক্ষতি নেই, কিন্তু হারানোর ক্ষেতে ফসল ফলবে তো?

—হাসির কথা নয় হেমেন!

—তা' জানি, তুমি চরিত্রবান্, প্রণয়ভীরু ষোড়শীর দিকে তুমি কোনদিন ফিরেও তাকাও না, তাদের চঞ্চল কটাক্ষপাতে তুমি অচেতন

থাক—তুমি নামজাদা ডাক্তার, কিন্তু তবু পঞ্চশরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যে তোমার পক্ষেও সম্ভব নয়, আমি তা' জানি।

সোমেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—কিন্তু ভাই—

বাধা দিয়ে হেমেন উত্তর দিলে—কিন্তু পরে হবে; এখন বলো দিকি মনটি কেমন করে হারালে!

—ঘটনাটি এমন কিছু নয়; রাজসাহীতে দিন তিনেক আগে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছি—পুকুরের ধার দিয়ে যখন চলেছি, দেখলাম ও'পাশে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে; পরনে তার নীল শাড়ী, পিঠে কবরী এলানো। বিস্ময়ে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে রইলাম—তারপর অত্যন্ত দ্রুত বাড়ী চলে এলাম। তারপর সারারাত ধরে কিছুতেই রক্তের কাঁপন থামে না। মুহূর্তে মুহূর্তে মনে ভেসে উঠতে লাগলো তার লীলায়িত দেহের ভংগিমা! মুহূর্তের দেখা, অথচ মনে হলো তার সাথে আমার সংবন্ধ যেন জন্ম জন্মান্তরের। যদি তাকে পেতাম!

—কি করতে?

"বিয়ে করতাম।"

হেমেন বল্‌লে—দেখো, জীবনে অমন অনেক মেয়েকেই ভাল লাগে, কিন্তু তাদের সবাইকেই কি বিয়ে করা যায়! আর যাকে ভাল লাগে তাকেই যদি বিয়ে করতে হয়, তবে তো হাজার পঁচিশেক মেয়ে বিয়ে করেও থামা চলে না। বিয়ের কথাই এখানে বড় নয় সোমেন, বড় হচ্ছে ভালবাসার কথা, জীবনের কথা।

সোমেন বললে—তার মুহূর্তের আবির্ভাবেই আমার জীবনের সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেলো—জীবনে এলো সহসা বিরাট পরিবর্তন—আমি এতদিনে নিজের মধ্যে নিজেকে বুঝতে পারলাম—জীবনকে অনুভব করলাম।

মুখোমুখি

—সোমেন, ও' সব কি জানো, মুখস্থ করা বুলি, ও' হলো কাব্য। ও'সব ন্যাকামি ছাড়ো!

—একে তুমি ন্যাকামি বল্‌চো?

—তা' ছাড়া আবার কী!

—জানো না, তাই বল্‌চো।

হেমেন স্মিতকণ্ঠে বল্‌লে—সোমেন, নেশা ভাই! দূর থেকে দেখে অমন ভাল লেগেই থাকে। দূরের একটা মোহ আছে। কাছে এলে সে-ই মাধুর্য থাকে না। তাই ভালবাসাই বলো অথবা আর যে কথাই বলো মিলন হলেই নষ্ট হয়ে যায়।

—মিছে কথা হেমেন, মিছে কথা।

—মিছে নয়—একেবারে জলজ্যান্ত সত্য। আসল কথা, ভালবাসা কিছু নয়, ও' একটা কাব্যিক নেশা।

—নেশা! —হ্যাঁ, নেশা।

—কিন্তু নেশা তো মানুষের জীবনে এত বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে না। তার ক্ষণিকের আবির্ভাব আমার জীবনে যে চিরন্তন হয়ে গেছে। তবুও একে বলবো নেশা?

হেমেন জবাব দিলে—যদি খুসী হও, তাই মনে করো! কিন্তু ভুল একদিন তোমার ভাঙ্‌বেই।

বিয়ে সোমেন কিছুতেই করবে না, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে হ'ল; বিশেষত যখন রাজসাহীবাসী এক তরুণীর সংগে তার বিয়ের প্রস্তাব হ'ল, তখন সে কেন জানিনে রাজি হ'লো।

বিয়ের পর ললিতার সাহচর্যে সোমেন বুঝতে পারলো হেমেনের কথাই ঠিক—স্মৃতির নেশা তার কেটে যাচ্ছে।

তারপর একদিন সোমেন ললিতাকে তার নেশার ইতিহাস জানালো, বললে—আগে ভাবতুম তাকে না পেলে বাঁচবো কেমন করে, কিন্তু তোমায় পাবার পর দেখলাম, সে বিস্মৃতির কোন অতলগর্ভে তলিয়ে গেলো।

ললিতা মৃদুহাস্যে জবাব দিলে—পুরুষ জাতটাই এমনি—আজ সে যাকে ভালবাসলো কালই তাকে সে অনায়াসে ভুলে যেতে পারে, তাতে তার এতটুকু বাঁধে না। কিন্তু মেয়েরা একবার যাকে ভালবাসে তাকে সে আর ভুলতে পারে না।

একটু থেমে ললিতা বল্‌লো—জানো, বিয়ের আগে আমি একজনের ভালবাসায় পড়ি, তারপর আজ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও তো তাকে ভুলতে পারি নি।

সোমেনের সর্বশরীর ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেলো, বুকের রক্তে বেদনার ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠলো। অস্ফুটস্বরে বল্‌লে—তুমি!

ললিতা ভয়ার্ত স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বল্‌লে—ওগো, সে মানুষটি হ'লে তুমি!

সোমেশ শুধু বিস্ময় বিহ্বল চোখে ললিতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মরীচিকা

যতীন সাহা

যতীন সাহা: জন্ম—তেরশ' বারো সালে ময়মনসিংহ পোড়াবাড়ী গ্রামে। ছাত্রজীবন—সন্তোষ, আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এবং কলিকাতায়। ইনি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে বিজ্ঞাপনী-শিল্প শিক্ষালাভ করেন এবং একটি বৈদেশিক বিজ্ঞাপনী ব্যবসায়ীর সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁর প্রকাশিত শিশুগল্পপুস্তক 'যাদুকর', 'সোনার ঘড়া', 'আঁধার রাতের মুসাফির', 'চিচিং ফাঁক,' 'বহুরূপী' ইত্যাদি। বর্তমানে শিল্প ব্যবসায় লিপ্ত।

সুবোধ বাবু, চিঠি। চিঠি, চি-ঠি, ও সুবোধ বাবু? ভেতর থেকে শব্দ হ'ল খোলা আছে। দরজা ঠেলে অশোক ঘরের ভেতর গেল—ডান হাতের দু'টি আঙুলে তখন তার আল্‌তোভাবে ধরা রয়েছে একখানি 'বাফ্‌' রংএর এন্‌ভেলোপ। চিঠিখানি সুবোধ বাবুর নামে এসেছে।

বোর্ডিং এর সিংগেল্ সিটেড্ একখানি ঘর। এক পাশে তক্তপোষ আর এক পাশে জানালার ধারে ছোট্ট একখানি টেবিল। টেবিলের উপর ইতঃস্ততঃ দু'একখানি বই ছড়ানো রয়েছে। হাতে ফাউণ্টেন পেন নিয়ে সুবোধ বাবু বসে কি ভাবছেন। তাঁর মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয় একটা জটিল বিষয় তিনি ভাবছেন। সামনে তা একখানা নোট বই খোলা, কিন্তু তাতে একটি অক্ষরও লেখা হয়নি।

তেমনি চিন্তিত ভাবেই সুবোধ বাবু বসে রয়েছেন দেখে অশোক বল্‌লে—কবিতা? এই মরেছেন। এ রোগ আবার কবে থেকে ধরলো আপনাকে?

কথা নেই—উত্তর নেই। শুধু দু'কথায় অতি সংক্ষেপে সুবোধ বাবু বল্‌লেন—চিঠি! ধন্যবাদ রেখে যাও।

অশোক বললে—রেখে তো যাবোই ; কিন্তু চিঠিটা কোথাকার একবার দেখুনই না চেয়ে—সেই লেখা সেই ছাপ। আজ দেখছি আপনি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছেন ?—আফিসে কিছু হয়েছে কি ? না অন্য কিছু ? শরীরটা ভাল আছে তো ? কবিতা ? ঠিক কবিতা লিখবার 'মুডে' আছেন বলে তো মনে হয় না। বৃথা চেষ্টা—সময় নষ্ট। তার চাইতে এই নিন খুলে পড়ুন। হয়ত নতুন কিছু কিংবা বিশেষ কিছু পাবেন এতে।

—সব সময় হাসি ঠাট্টা ভাল লাগে না ? এখন তুমি আসতে পারো—কাজটা অসমাপ্ত রাখলে কালকের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হবে না—সুবোধ বাবু বল্‌লেন কবিতাই বটে ! আচ্ছা এ কথা কয়েকটা কেমন লাগে বল দিকিনি। একটা নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন যদি এই হয় তবে এ থেকে কি বোঝা যায়।

কথাটা শেষ না করতে দিয়েই অশোক বল্‌লে—দোহাই আপনার সুবোধ বাবু, দয়া করে থামুন। এই জিনিষটি মোটেই আমার মগজে ঢোকে না। আমাকে শোনানোও যা আপনার টেবিল চেয়ারকে শোনানোও তাই। ওই জিনিষের কি প্রয়োজন তা তো আমি বুঝিনে। কোন জিনিষের প্রয়োজন হলে সটান দোকানে গিয়ে কিনে নিয়ে আসি।

সুবোধ বাবু বল্‌লেন—গোড়াতেই ভুল কচ্ছ যে। বোসো, বোসো ঐখানে ; বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অধৈর্য হয়ে অশোক বল্‌লে—থাক্ আমাকে আর বোঝাতে হবে না, আপনিই বুঝুন বসে বসে, আমি ততক্ষণে সরে পড়ি। কিন্তু চিঠিটা একটু খুলে দেখলেন না ?

হেসে সুবোধ বাবু বললেন—চিঠিটা এমন কিছু নয় যে এখনই খুলে পড়তে হবে, হাতের কাজটা সেরেও ওটা পড়া যায় তো?

—তার মানে, অশোক বললে—আমার কাছে চিঠিখানা খুলে পড়তে আপনার যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। বেশ আমি আসি তবে।

—অবুঝের মতন নিজের জেদে রাগ করোনা অশোক। ইচ্ছে করলেই তুমি চিঠিখানি খুলে পড়তে পারো।

—সত্যিই কি তাই। অপরের চিঠি খুলে পড়া যে ভয়ানক অন্যায়।

—তা মানি কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়, কেননা আমি নিজেই তোমায় পড়বার জন্যে অনুরোধ করছি।

হঠাৎ অশোক উৎফুল্ল হয়ে উঠল—পড়ব? পড়ব তবে?

তেমনি ভাবে সুবোধ বাবু বললেন—অনায়াসে। এ চিঠি না পড়ে গেলে যে রাত্রে ঘুম হবে না তোমার।

ততক্ষণে অশোক চিঠিখানা খুলে ফেলেছে। এমারেল্ড গ্রিণ রংএর একখানা লেটার পেপার বের করে অশোক বল্‌লে—যা বলেছিলুম ঠিক তাই—'প্রিয় সুবোধ' নীচেও দেখছি লেখা রয়েছে 'রমা' গোটা গোটা লেখাটা ওর বেশ। সত্যি মেয়েদের লেখার ভংগিই যেন কি একটা বিশেষ রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে সুবোধ বাবু!

—অত সব বুঝিনে কি লিখেছে পড়লে তো?

—হ্যাঁ পড়লুম। ঠিক একটা হেঁয়ালীর মত। এমন হুঁসিয়ার ও যে কিছু পরিষ্কার বোঝবার উপায় নেই। এ সব 'কোড্' বোঝা আমার কাজ নয়। তবে ভাষাটা বেশ ওর। ওর লেখনীতে জোর আছে, ভাষায় আছে প্রাণ। আর দশটি মেয়ের থেকে ওর চিন্তাশক্তি প্রখরতর। ওদের লেখাগুলি অমন হয় কেন সুবোধ বাবু?

—কি রকম? সুবোধ বাবু সম্পূর্ণ উদাসীন!

—ছেলেদের লেখা থেকে স্বতন্ত্র। দেখ্‌লেই মেয়েলী লেখা বলে চেনা যায়।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে সুবোধ বাবু বল্‌লেন—যে কারণে ওদের গঠন ছেলেদের চাইতে স্বতন্ত্র, যে কারণে ওদের গলার স্বর ছেলেদের গলার স্বরের মত নয়। গলার স্বর শুনে কি একটি মেয়েকে মেয়ে বলে চেনা যায় না? একটি মেয়ের হাতের লেখা মেয়েদের হাতের লেখার মতন হবে সে আর নতুন কি?

—সুবোধ বাবু, মেয়েটি আপনার কে হয়? ও দেখ্‌ছি প্রতি সপ্তাহেই আপনাকে চিঠি লেখে।

—কে হয় বলে তোমার মনে হয়?

—যেই হোক না কেন, ও আপনাকে যে বেশ ভালবাসে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞাপনের ক্যাপশান্‌টি ততক্ষণে সুবোধ বাবুর মাথায় এসে গেছে। চট্‌ করে লিখে ফেলে তিনি বললেন—মেয়ে পুরুষকে ভালবাসবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে বলে তো আমার মনে হয় না। দুনিয়ার নিয়মই তো তাই।

—কিন্তু আপনি তার যত্ন নেন কি? চিঠিতে এত অনুযোগ কেন? হয়ত তার কোথাও একটা ব্যথা আছে। আপনি জানেন?—তার কোথাও একটা ব্যথা আছে। তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন কি?

—অশোক তুমি অতি ছেলেমানুষ। এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে তোমার বাপ মা পয়সা খরচ করে কল্‌কাতায় পাঠান নি। যাও তো এবারে গিয়ে পড়তে বসো। আর থিয়েটার বায়স্কোপে একটু কম যেয়ো। ফোর্থ ইয়ার-এর ছেলের ওসব সাজে না।

অশোক বল্‌লে,—বুঝতে পেরেছি, আরো অনেকবার আপনার মুখে ঠিক এই রকম কথাই শুনেছি। কিন্তু মেয়েটি কে বল্‌লেন না! রমা, দু'অক্ষরে নামটি বেশ! যাক্ আমি চললুম আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

সুবোধ বাবু যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে মনে তার হাসিও পেল। নিজের মনেই তিনি হেসে উঠলেন একবার। পাগল! বোর্ডিংটা যেন একটি চিড়িয়াখানা। অশোক, হীরক, রমেন এই তিনটি ছেলে যেন তাকে পাগল পেয়ে বসেছে। আর সেই বুড়ো হোমিওপ্যাথ ডাক্তার! সাত নম্বর ঘরখানা যেন সরগরম করে রাখেন তিনি।

বোর্ডিংএ কি কাজ হয়! এক এক জন একটি নিয়ে পড়ে আছেন। ওদিকে চলেছে বাঁশী, এদিকে টেবিল চাপ্‌ড়ে তবলা প্র্যাকৃটিস্, ওদিকে আবার কুঁড়ের কুঁড়েদের ক্যারামের খটাখট্ শব্দ! চায়ের পেয়ালার টুং টাং শব্দ, সিগারেটের ধোঁয়া, কবিতা পাঠ, পংকজ আর সাইগলের অনুকরণে গলা ভাজার পাল্লা। একটা হট্টগোল—একটা অশান্তি!

কিন্তু তবুও যতদিন না একটু বিশেষ সুবিধে হয় ততদিন সুবোধ বাবুকে নির্বিকারে এদের শত অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করতেই হবে। কেন না একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকবার মতন সংগতি সুবোধ বাবুর নেই। সামান্য রোজগারে তাঁকে চলতে হচ্ছে। নিজের খরচ কোন রকমে চালিয়ে মাসে মাসে মণিঅর্ডার করে দেশের পরিবার পোষণ করুছেন।

অশোক, হীরক আর রমেনের মতন তরুণ বয়সের রঙিন নেশা যে তাঁর কবে কেটে গেছে তা হয়ত তিনি ভুলেই গেছেন বিগত কয়েক বছরের অন্নসমস্যা সমাধান করতে। কিন্তু এরা, শুধু এরা কেন, বোর্ডিং এর

কেউই সে খবর রাখে না—দরকারও করে না তাদের। সুতরাং অশোক প্রমুখ সবাইকেই সুবোধ বাবু সেই দলেই ফেলে রেখেছেন। তাঁর আত্মপরিচয় আজ এদের কাছে অজ্ঞাত।

সুবোধ বাবু বিজ্ঞাপনের কপিটি শেষ করে ফেললেন। বার বার পড়ে দেখলেন। নেহাৎ মন্দ শোনাল না। কাল সকালে আবার আর্টিস্ট এর সাথে পরামর্শ করতে হবে। লে-আউটটি ভাল হলে তবেই নিশ্চিন্ত, নইলে—

—ভাত ঘরে দিয়ে যাবো কি? দরজা ঠেলে বোর্ডিংএর চাকর হরি ঘরে ঢুকল।

গত দু'দিনের বিজ্ঞাপনের কপি আর লে-আউটএ সুবোধ বাবুর বেশ নাম হয়ে পড়েছে। সওদাগরী আফিসের চাকুরী করে অবসর সময়ে কয়েকটি দেশীয় ব্যবসায়ীর পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্ট পরিচালনা করেন সুবোধ বাবু। সত্যি ভদ্রলোক খাটেন।

সেদিন বিকেল বেলা। বোর্ডিংএর প্রায় সবই তখন বাইরে, কেউ খেলার মাঠে, কেউ সিনেমায়, কেউ বা শনিবারের হাফ্ আফিস করে সেখান থেকেই সরাসরি রওনা শ্বশুরবাড়ী।

ঘরের ভেতর বসে বসে সুবোধ বাবু কাঁচি দিয়ে সব বিলিতি ম্যাগাজিন থেকে ভাল ভাল বিজ্ঞাপনের সব আইডিয়া কাটছেন। Advertising Display January 1940. বইখানাকে কেটে কেটে পাতাগুলিকে একেবারে হোমিওপ্যাথী দোকানের medicine registered book এর মত কচুকাটা করছেন আর ভাবছেন মডার্ণ লে-আউট-এর কথা। এমন সময় ঘরে এল অশোক। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বলে উঠল—নাঃ, সুবোধ বাবু এবারের লীগ্ তেমন

সুবিধে হচ্ছে না, মিছিমিছি সেই তুপুর থেকে রোদে 'ভাজা পোড়া' হয়ে এলুম! ওঃ হ্যাঁ, ভাল খবর, আপনার সেই নতুন আইডিয়ার ল্যাবেলটি ছেড়েছে মাঠে—মনে নেই, সেই যে সেই কোন এক ঘি-এর না দইয়ের দোকানের মশাই?

হঠাৎ অশোকের চোখে পড়ল টেবিলের ওপর একখানা এন্‌ভ্যালাপ্। চিঠিখানা এতক্ষণ কাগজ চাপা ছিল। সুবোধ বাবু কয়েকখানা কাগজ সরাতেই চিঠিখানা বের হয়ে পড়েছে।

উৎসুক দৃষ্টিতে চিঠিখানার দিকে চেয়ে অশোক বল্‌লে—ওটা কার চিঠি সুবোধ বাবু?

কচ্ কচ্ করে কাঁচি দিয়ে একটা ভাল ড্রয়িং কাট্‌তে কাট্‌তে সুবোধ বাবু বল্‌লেন—আমার।

বিরক্ত হয়ে অশোক বল্‌লে—আঃ! কি যে হচ্ছেন আপনি দিনে দিনে?—বল্‌ছি চিঠিটা কে লিখেছে আপনাকে।

—ও তাই? কিন্তু চিঠিটা তো খুলে দেখা হয়নি।

খামখানা উল্টে পড়েছিল। অশোক সেখানা তুলে নিয়ে পাল্টে ধরেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—রমার, রমার চিঠি সুবোধ বাবু! কখন এল?

—সেকেণ্ড ডেলিভারীতে এসেছে বোধ হয়। আফিস থেকে এসেই তো দেখছি ওটা ঐখানেই পড়ে রয়েছে।

একটু তিরস্কারের সুরে অশোক বল্‌লে—কিন্তু কি কর্‌ছেন সুবোধ বাবু? রমার চিঠি ফেলে আপনি বসে বসে যত সব 'রাবিস্' কাট্‌ছেন। এই নিন্ ফেলুন কাঁচি—খুলুন চিঠি।

খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে কাঁচি দিয়ে খামখানার ধার কেটে দিয়ে সুবোধ বাবু বল্‌লেন—তুমিই পড়ে শুনাও ভাই। এক সংগে তুটো কাজই হবে।

—এতই অবহেলা! বেশ আমি চিঠিখানা পড়ছি কিন্তু রমার

ঠিকানাটা আমায় দিতে হবে আজ—আমি তাকে একটা চিঠি দেব। সে যে ভুল করছে সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কাষ্ঠ হাসি হেসে সুবোধ বাবু উত্তর দিলেন—আর এটাও বুঝিয়ে দিও, এবার থেকে সে যেন সুবোধ সরকারকে চিঠি না লিখে লেখে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

অশোক চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল—রমা আসছে সুবোধ বাবু—কাল, আগামী কাল আসাম মেলে। এই দেখুন লিখেছে, তার মাসীমার অসুখ। বালীগঞ্জে যাওয়ার পথে আপনাকে সংগে যেতে বলেছে। পড়ে দেখুন। সুবোধ বাবু চিঠিখানা পড়ে আবার কাজ করতে লাগলেন। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল রমেন আর হীরক।

অশোক চেঁচিয়ে উঠল—আরে শোন শোন, একটা সুখবর আছে তোমাদের জন্যে। রমা, রমা আসছেন।

একই সংগে দু'জনে চেঁচিয়ে উঠল—সত্যি? রমা দেবীর সংগে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন সুবোধ বাবু! কিন্তু হঠাৎ কলকাতা যে?

অশোকই তার জবাব দিল—তাঁর মাসীমার অসুখ। বালিগঞ্জে যাবার পথে সুবোধ বাবুকে সংগে নিয়ে যাবেন। আসাম মেলে আসছেন কাল।

--অসুখটা কি খুব বেশী সুবোধ বাবু? অশোক বল্‌লে—আপনি জানেন নিশ্চয়?

—বোধ হয় অসুখটা কিছুই নয়। কেননা কালই 'বেঙ্গল ল্যাম্প ওয়ার্কসে' যাবার পথে আমি 'বালীগঞ্জ প্লেস' হয়ে গেছি। হয়ত রমাকে এখানে আনার অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে মাসীমার। যাক্ রমা তো কাল আসছেই। নিশ্চয় সে আমার সংগে দেখা করে যাবে।

—দেখা করে যাবে মানে? আপনি স্টেশনে যাবেন না? ওরা সবাই বললে—আপনি নির্দয়, নিষ্ঠুর স্থবোধ বাবু!

—আঃ, কথাটা বুঝ্ছ না খালি খালি রাগ করছ। আমি স্টেশনে যাওয়াও যা ওর স্টেশন থেকে এখানে আসাও তা। স্টেশন আর আমাদের বোর্ডিং তো মোটে দু'মিনিটের রাস্তা। হ্যারিসন রোডের মোড় আর শেয়ালদা—হেঁ! আর তা ছাড়া ও দু'তিন বার এসেছে এ বোর্ডিংএ।

—এসেছে? কবে কখন? কই আমরা দেখিনি তো?

—তা যদি তোমরা না দেখে থাকো তো আমি কি করবো বল? বেশ, তোমরা সবাই যখন বলছ তো যাওয়া যাবে গাড়ীর টাইমে।

রোববার দুপুর বেলা। সবারই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। বোর্ডিং-এর সব রুমেই তালা। নেম্ বোর্ডএ আউট এর ছড়াছড়ি। স্থবোধ বাবু বসে বসে বিজ্ঞাপনের কপি লিখছেন। সমস্ত বোর্ডিংটা চুপ্‌চাপ্। হঠাৎ অশোক, রমেন, আর হীরক এল।—বাঃ, এখনও আপনি বসে?

—বসে নয়। ভুল দেখছ তোমরা। কাজ করছি। কপি লিখ্ছি।

—থাক্, আর আমাদের ভুল বোঝাতে হবে না। নিজের ভুলই আগে বুঝ্তে শিখুন। কটা বাজে খেয়াল আছে?

—যে কটাই বাজুক না কেন এটুকু খেয়াল আছে যে আজ আফিসের তাড়া নেই।

—কিন্তু স্টেশনে যাবেন না!

স্টেশনে! কেন! আমি তো কোথাও যাচ্ছি নে।

—বেশ লোক আপনি! রমার আসবার কথা নয় আজকে—আসাম মেলে? এর মধ্যেই ভুলে বসে আছেন।

ঘড়ির দিকে চেয়ে সুবোধ বাবু বল্লেন—তাই তো, কথাটা একেবারে ভুলে গেছি। কিন্তু, একটা দশ। গাড়ী দশ মিনিট আগেই ইন্ করেছে। এখন গিয়ে আর কি হবে? ভাবনা কি? সে নিজেই আস্তে পার্বে এখানে।

অশোক বল্লে—তা হয়ত পারবে। কিন্তু সে কি মনে করবে বলুন তো?

জলের মতন সুবোধ বাবু বলে ফেললেন—সে কিছু মনে করবে না। সে ঠিক ভাববে যে কাজের তাড়ায় আমি যেতে পারিনি।

—আর এওতো সে ভাবতে পারে যে আপনি, অবহেলা করে যাননি? হয়ত সে এতক্ষণ বেলেঘাটা স্টেশন হয়ে বালিগঞ্জ পৌঁছে গেছে।

—না, না, সে যদি কোলকাতা এসেই থাকে তবে এখানে আস্বেই আস্বে। আর কোন কথা না বলে সুবোধ বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হীরক বল্লে—লোকটা কি অসভ্য দেখ্লে! ছিঃ! ছিঃ! এমন লোকের সংগে কথা বল্তেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। আচ্ছা, রমা কি পৃথিবীতে আর লোক পেলে না ভাব করবার? অশোক বল্লে—পায় কিনা দেখা যাবে একবার শুধু যদি পরিচিত হই তার সংগে!

ঠোঁট কামড়ে রমেন বললে—ছিঃ! ছিঃ! সুবোধ বাবুকে তোমরা মানুষ বল? মেয়েদের সম্মান করতে জানেনা যে সে আবার মানুষ! একটি ভদ্রঘরের বিশিষ্টা মেয়ে সে কিনা আস্বে ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে এই বোর্ডিং-এ ওর কাছে! লজ্জাও করে না বল্তে।

হঠাৎ কড়া নড়ে উঠল। চম্‌কে উঠে তিন জনই একটু শংকিত চিত্তে বল্‌লে—কে? খোলা আছে ভিতরে আসুন।

সংগে সংগে দরজা খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করলেন চুলগুলো উস্‌কো খুস্‌কো, সুস্থ সবল দেহ, দীর্ঘ নাসিকা, উন্নত কপাল সুশ্রী একটি যুবক। প্রশ্ন হল—সুবোধ বাবু আছেন কি? তার কথায় কোথাও জড়তা নেই, আছে শুধু ব্যস্ততা। সারা রাত হয়ত তার ঘুম হয়নি। মুখখানা তার একটু শুষ্ক। হয়ত দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি, তাই চেহারাটা আরও মলিন বলে মনে হচ্ছিল।

অশোক বল্‌লে—আছেন। আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন জান্‌তে পারি কি?

যুবকটি উত্তর দেবার পূর্বেই সুবোধ বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন—এই যে বোসে বোসো, অত ব্যস্ত কেন? তারপর অশোক, রমেন আর হীরকের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তবে যে তোমরা বল্‌ছিলে আস্‌বে না এখানে? এসো এবারে, তোমাদের ইন্‌ট্রডিউস্‌ করিয়ে দিচ্ছি। ইনিই হচ্ছেন রমাপ্রসাদ গাঙ্গুলী, ওরফে 'রমা' আর বুঝ্‌লে রমা, এই এরা…… কি হ'ল অশোক, হীরক, রমেন সবাই উঠ্‌ছ যে? এ ভয়ানক অন্যায়, তোমাদের…… কিন্তু ততক্ষণে রমা দেবীর সংগে পরিচিত হবার উৎসাহ ওদের কেটে গেছে। লজ্জায় তিন জনেই সরে পড়ল ঘর থেকে।

এদের কাণ্ড দেখে সুবোধ বাবু শুধু একটু মুচ্‌কি হাস্‌লেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে না পেরে শ্রীমতী স্থানে আমাদের শ্রীমান্ রমা অবাক্ হয়ে সুবোধ বাবুর দিকে চেয়ে রইল।

কম্‌পেনসেশন্‌

মণীন্দ্র বসু

মণীন্দ্র বসু : জন্ম—উনিশ শ' বার সালে কলিকাতায়। পৈতৃক বাসভূমি—হুগলী জেলায়। ছাত্রজীবন—কলিকাতা। এঁর সম্পদনায় উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালে 'এ বছরের সেরা গল্প' বের হয়। অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক 'বর্তমানে'র সম্পাদক ছিলেন। সুশীল রায়ের সহযোগিতায় কবিতার মাসিকপত্র 'জীবাণু'র সম্পাদনা করেন ও 'সুচরিতাসু' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখেন। বর্তমানে নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত।

আপনারা বোধ হয় নীরেন রায়ের নাম শুনেছেন, কারণ তার নাম কলকাতা সহরে নিতান্ত অজানা নয়। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তার পেশা কি? তাহলে বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে, তার একমাত্র কাজ হচ্ছে পিতার অন্ন সুখে ধ্বংস করা। তবে অকাজও তার অনেক ছিল। কারণ খেলার মাঠে, অভিজাত মহলে, সাহিত্যিক সভায়, এম্পায়ারের নৃত্য সভায়, কোথায় যে তার যাতায়াত ছিল না সেইটাই বলা কঠিন। নীরেন ফুটবল খেলত, গান গাইত এবং আরও এমন অনেক কাজ কোরত যে, আমাদের দলের উইট্ এণ্ড হিউমার নবীন বলত যখন এত কাজ ও এক সংগে করে তখন ও মানুষ খুনও করতে পারে। অবশ্য একাজটা নীরেন এখনও করে উঠতে পারে নি।

আপনারা যদি তাকে দেখে থাকেন বলুন ত আমি তার চেহারার ঠিক বর্ণনা দিচ্ছি কি না? বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রঙ্ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দাড়ী কামান হলেও, একটু খানি Warner Baxter প্যাটার্ণের গোঁফ আছে। সে সর্বদাই বেশ একটু ধোপদোরস্ত থাকে

সেইজন্য নবীন বলত, ওটা পুরুষ নয়, ভগবান ওকে মেয়েছেলে কোরতে কোরতে বেটাছেলে কোরেছেন। অবশ্য এটা নবীনের গায়ের জোরের কথা, কারণ নীরেন মেয়ে হলে কখনও ঘুসির জোরে একবার দু'দুটো সার্জেণ্টকে কাত্‌ করতে পারত না। তবে যা রটে তার কিছু সত্যতা থাকে। এই কথাটার একটু সত্যতা আছে, কারণ সে মেয়ে না হলেও, মেয়ে মহলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বেশ একটুখানি ছিল। তবে সে যে কোন মেয়ের সংগে বেশীদিন ভাব রেখেছে—এ দুর্ণাম তার অতি বড় শত্রুও তাকে দিতে পারে নি। বিয়ে থা সে করেনি, কারণ কোনও মেয়ের সংগে বেশীদিন থাকাটা ও দুর্বিসহ মনে করে। সে বলত, "জীবন ত দু'দিনের, এতে যত পার ভোগ করে নাও। বিয়ে করলে কি মনের সুখ থাকে?" তার এই ধারণা ছিল, "জীবন-সুরা শেষ করে নাও, আফশোষে ফের ফাটবে বুক।" নবীন তার এই ধারণার জন্য তাকে চরিত্রহীন ফ্লার্ট আখ্যা দিয়েছিল, আর নীরেনও তাকে বলত আন্‌কালচার্‌ড্‌ ব্রুট্‌। এ হেন ডন্‌ জুয়ান নীরেন রায় যে কেমন করে প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ে বিবাহ ক'রল সেটাই আপনাদের বলছি।

নীরেন সেবার দার্জিলিং যাচ্ছিল। তার অভ্যাস প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে নামতে নামতে যাওয়া। এই রকম সে রাণাঘাটে নেমেছিল। সে একটি মেয়েকে দেখে তার খোঁজ কচ্ছিল, এমন বিভোর হয়ে যে, কখন ট্রেণ চলতে আরম্ভ কোরেছে তা তার হুঁসই ছিল না। যখন খেয়াল হল, তখন সে একটা কামরার ফুট-বোর্ডে উঠে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারলো যে সে-টা সেকেণ্ড ক্লাস এবং তা ভেতর থেকেবন্ধ। কিন্তু তখন নামবারও

উপায় নেই, কারণ ট্রেণ প্রায় স্টেশন ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই সে ত্রিশংকুর মত ঝুলতে ঝুলতে চলল। কিন্তু একে শীতকাল তাতে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু হু করে! চাকায় চাকায় উঠছে ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। কড়্ কড়্ করে আর্তনাদ করে উঠছে ইস্পাতের লাইন্‌গুলো—দার্জিলিং মেল চলেছে সরীসৃপের মত তার অগ্রগতির পথে। এই মুহূর্তে, এই চরম নিঃসংগ অসহায়তার মুহূর্তে সে সচেতন হয়ে উঠল, জীবনের আকর্ষণী শক্তি সংবন্ধে। সামনে তার সূচিভেদ্য অন্ধকার, দৈত্যের মত, পিশাচের মত জমাট বাঁধা অন্ধকার। হেডিসের বিভীষিকার মত লক্ষ লক্ষ ফণা বের করে তেড়ে আস্তে লাগল অসংখ্য মৃত্যুর স্রোত হিমের সংগে তাদের ছুঁচোল স্পর্শ তার গায়ে ফুটতে লাগল। ধূসর মৃত্যু, অনেক রকম মৃত্যু—সাদা, কাল, ছোট, বড়, কত রকমের মৃত্যু!

অসহায়!—অসহায়, সে—সম্পূর্ণ অসহায়! তার পাশেই সে শুন্‌তে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করতে পাচ্ছে শত শত, সহস্র সহস্র লোকের সান্নিধ্য কিন্তু তবু যেন কেউ কোথাও নেই। জনহীন অন্ধকার পাতালের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে। বাতাস অট্টহাস্য করে কানের পাশ দিয়ে বলে যাচ্ছে—ওসব মরীচিকা, ট্যাণ্টালাস্‌এর জলপাত্র—দৃষ্টি বিভ্রম; কেউ কোথাও নেই।

না!—না!—নীরেনের আত্মা বিদ্রোহ করে উঠল; এরকম ভাবে মরতে সে পারে না। তাকে বাঁচতেই হবে। সফল করতে হবে তার জন্মকে, সঞ্চয় করে রাখতে হবে আরও, আরও অনেক রকম অভিজ্ঞতা, উপভোগ করতে হবে জীবনের প্রতি সৌন্দর্য্যটিকে।

সে সাহস করে দরজা ঠেলতে আরম্ভ করলে। দেখা গেল সেই পূর্ব-দৃষ্টা তরুণী জানালা খুলে ভয়ে চীৎকার করে বললে, "কে আপনি?" মুখখানা যেন নীরেনকে সাহারার মরুর মধ্যে বারিবর্ষণ করে দিলে! সে বললে, "আমার টিকিট আপনাকে দেখাব। গাড়ী ভুল করে এই অবস্থা। দরজা খোলেন ত প্রাণ বাঁচে আর নইলে নিশ্চিত মৃত্যু কতক্ষণ আর দাঁড়ান যায় হাত-পা'ত কোল্যাপ্স হবার যোগাড়।" আমি বা আপনি এক্ষেত্রে কি যে করতুম বলা যায় না, কিন্তু মেয়েটি কিছুক্ষণ কি ভেবে দরজা খুলে দিলে এবং নীরেন গাড়ীর ভেতর গিয়ে যেন সুদ সমেত জীবনটা ফিরে পেলে। যখন সে একটু সামলে নিলে তখন সে দেখতে পেলে যে ঘরের ভিতর একটি ছোট ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে আর একটি তরুণী চেনের কাছে দাঁড়িয়ে, মানে যেন একটু কিছু অভাবনীয় দেখতে পেলেই চেন টানবে।

নীরেন হাত জোড় করে বলল, "দেখুন অত ভয় পাবেন না। আমি অনিচ্ছাক্রমে আপনাদের অনাহুত অতিথি হয়েছি।" এই বলে সে আবার সবিস্তারে তার ইতিহাস বর্ণনা করলে। মেয়েটিও তারপর তাকে জানাল যে, তার দাদা দার্জিলিঙে লাট দপ্তরে চাকরী করেন। তার নাম কনক সান্যাল। তার বাবার নাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সান্যাল। তিনি কলকাতার কোন কলেজের অধ্যাপক। সে তার বাবার কাছে, কলকাতায় বেথুনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। ছেলেটি তার ভাই মণ্টু। তার পরের স্টেশনে নীরেন নেমে পড়ল এবং আসবার সময় অজস্র ধন্যবাদ দিতেও সে সময় ভোলেনি। তার পর দার্জিলিং পৌছে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নাকি তাদের বাড়ীতে দু'এক বার চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

আমরা—যে সব লেখকরা—যখন সব কিছুই দেখতে পাই, সব

কিছুই জানতে পারি—তখন জোর করেই বল্‌তে পারি যে—ছুটি পুরাতন, গভীর ও দুর্জ্ঞেয় চোখ তার প্রতীক্ষা কোর্‌ত আর সে যেই আসত অনুসন্ধানরত ও চোখদুটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠত আনন্দের আন্তরিকতায়।

তারপর? তারপর সেই অতি পুরাতন বিরহ মিলন কথা! রাত্রে তার ঘুম নেই—আকাশে কত তারা ওঠে, চাঁদ ওঠে…ততই নীরেনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি মুখ আর, আর দুটি আয়ত আঁখি। দিনের বেলা ওর অশান্ত মন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কনকদের বাড়ীর আনাচে কানাচে, প্রতীক্ষা করে বিকেলের জন্য যখন সে একটু তার বাঞ্ছিতার সান্নিধ্য লাভ করবে। কিন্তু বিকেল ফুরোলেই আবার সেই অশান্তি, দু'ঘণ্টার সান্নিধ্যের অনুভূতি তাকে পাগল করে তোলে আরও—আরও পাবার জন্য।

এর ফলাফল? আমরা হঠাৎ একদিন একখানা কার্ড পেলাম বিবাহ।

ফুল-শয্যার পরদিন নীরেন আমাকে একটা কথা বলেছিল। গোপনীয় হলেও সেটা এখানে না বলে পারছি না। নীরেন তার নববধূকে প্রথম চুম্বন করবার সময়, কনক বলেছিল, "যাও তুমি ভারী দুষ্টু! সে'দিন দরজা না খুললেই বেশ হত।" তার উত্তরে নীরেন বলেছিল, "বেশত! তোমাকেই কম্‌পেনসেশন্‌ দিতে হত। এমন গোবেচারী স্বামীরত্নটীকে পেতে কোথায়?"

রাশিয়ান শো

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম তেরশ' আঠার সালে। পৈতৃক বাস বীরভূম। ছাত্র জীবন—বীরভূম ও কলিকাতা। উনিশ তেত্রিশ সালে ইনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষালাভ ও ভ্রমণ করেন। এঁর রচিত 'পশ্চিম প্রবাসী' 'রাশিয়া ভ্রমণ'। 'মাটীর পুতুল,' 'কাঁটা' Russia to day,' 'দুধের ব্যবসা' প্রভৃতি। বর্তমানে 'বীরভূমের কথা' পত্রিকার সম্পাদক ও নিজ ব্যবসায় লিপ্ত আছেন।

গ্লোবে রাশিয়ান ব্যালেট নাচ দেখান হইতেছিল। প্রত্যহ দুইবার করিয়া শো চলিতেছিল, তাহাতেও নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্বে প্রায় সমস্ত টিকিটই বিক্রী হইয়া যাইতেছিল। কলিকাতার ইঙ্গ বঙ্গ সমস্ত সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্র ইহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের প্রাইমা ব্যালেরিন (প্রধানা নর্তকী) এর বিভিন্ন নৃত্যভংগির ছবিতে প্রায় সমস্ত পত্রিকাই পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার নাট্যামোদী-সম্প্রদায় রাশিয়ান ব্যালেটের সুখ্যাতিতে মুখর। সন্ধ্যায় ও রাত্রি সাড়ে নয়টায় গ্লোব সুসজ্জিতা ইংরাজ ও ভারতীয় মহিলার এবং সর্বশ্রেণীর পুরুষ দর্শকে ভরিয়া উঠিতেছিল।

সেদিন শো চলিতেছিল। 'শয়তান ও তার সহচরী' 'বিংশ শতাব্দী', 'মাড়োয়ারী নৃত্য' প্রভৃতি কয়েকটি চমকপ্রদ সুন্দর নৃত্যে দর্শকমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রতি দৃশ্যের পর ঘন ঘন করতালি দ্বারা অভিনেতৃবর্গ সংবর্ধিত হইতে লাগিল। রাশিয়ান যুবতীর শুভ্র নগ্নদেহ, অর্কেস্ট্রার অদ্ভুত ছন্দ ও তান এ দেশের দর্শকদিগকে মাতাইয়া

তুলিল। অতি অল্প লোকেই বিদেশী নৃত্যের তাল বা ছন্দ বুঝিল। তাহারা দেখিল একেবারে অপরিহার্য অংশটুকু আবৃত, শুভ্র সুন্দর সুগোল মাংসল দেহের হিন্দোল এবং পুরুষ ও নারীর কঠিনতম ব্যায়াম কৌশল অত্যন্ত সহজভাবে হাসিমুখে সম্পাদন। যে সব শারীরিক কৌশল দেখাইতে আমাদের দেশের পালোয়ানরা যতদূর সম্ভব মুখ বিকৃতি করে, সেগুলি তন্বী নারীরাও নাচগানের মধ্যে, সংগীতের তালে তালে অত্যন্ত সহজভাবে অবলীলাক্রমে হাসিমুখে করিতেছিল।

ইণ্টারভ্যালের আগের দৃশ্যটি সকলকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত করিল। এই দৃশ্যের নাম 'মৃত্যু ও সে'। অভিনয় করিতেছিল ডিমিট্রি এবং ল্যারিসা। সমস্ত স্টেজ অন্ধকার এবং কালো কাপড়ে ঘেরা। তাহার মাঝে মৃত্যুর ভয়ে ছিট্‌কাইয়া পড়িল একটি শুভ্র তন্বী; সেই গাঢ় অন্ধকারে তাহার মুখ চোখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না; শুধু একটি মৃত্যু ভয়ব্যাকুল যন্ত্রণা কাতর শ্বেত মূর্তির বেদনাবিধুর ভংগি দেখা যাইতে লাগিল, সংগে সংগে অর্কেস্ট্রার করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রুদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের চতুর্দিকে যেন মাথা ঠুকিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণপরে দেখা গেল মৃত্যু— শুধু একখানা কংকাল। তাহার প্রতি পদক্ষেপের সংগে সংগে গুরু গম্ভীর আওয়াজ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়ের রুদ্র ডম্বরু। সেই অস্পষ্ট আলোর মাঝে মৃত্যুর প্রতীক কংকালখানা যৌবনোদ্দীপ্ত শুভ্র নারীমূর্তির পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিপুল দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ নিঃশ্বাসে সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখিতেছিল। মৃত্যু আসিয়া নারীকে স্পর্শ করিল, সে আতংকে ছুটিয়া পলাইল। মৃত্যু ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে। এই দ্রুত পলায়ন ও আক্রমণের দ্বন্দের ছন্দে দর্শকমণ্ডলী উৎকণ্ঠায় আতংকে দোল খাইতে লাগিল। অবশেষে মৃত্যুর নির্মম হিমস্পর্শে যৌবন লুটাইয়া পড়িল, মৃত্যুর হইল জয়। মৃত্যু তাহাকে

অবলীলায় দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাহার প্রতি পদক্ষেপের তালে তালে বাজিতে লাগিল গুরু গম্ভীর বাদ্যযন্ত্র। পর্দা আসিয়া আড়াল করিল এবং সংগে সংগে প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলিয়া উঠিয়া বিশ্রাম ঘোষণা করিল।

সামনের দামী আসনে বসিয়া একটি যুবক নবপরিণীতা বধূকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন লাগল?"

সিল্কের দামী শাড়ীখানা খস্ খস্ করিয়া উঠিল। একটু নড়িয়া চড়িয়া যেন অভিভূতের ভাবটা কাটাইয়া যুবতী উত্তর দিল,—"বিশ্রী, আনন্দের জায়গায় এসে কে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে চায়। আগেকার সব রস শেষ দৃশ্যটা একেবারে নষ্ট করে দিলে, নয়?"

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া যুবক কহিল,—"কিন্তু মৃত্যুত আনন্দেরই অপর দিক। দুটোই ত পাশাপাশি চলেছে।"

রঞ্জিত ভ্রু দুইটী তুলিয়া তরুণী উত্তর দিল,—"সেটা মনে করবার জন্য রাশিয়ান ব্যালেটে না এসে বাড়ীতে বসে গীতা পড়লেও ত হয়।"

স্বামী হাসিয়া কহিল,—"যা বলেছ। একটা আইসক্রীম খাবে? আনিয়ে দোব?"

জুতার মধ্যে পা পুরিয়া বধূ বলিল,—"চলনা বারে (Bar) গিয়ে খেয়ে আসি।"

ইণ্টারভেলের পরেই কিন্তু দর্শকদের আক্ষেপ মিটিয়া গেল।

প্রত্যেকটি নাচ গানই উদ্দামতায়, উলংগতায় দর্শক চিত্ত মাতাইয়া তুলিল। 'হুলা', 'রম্বা', 'ট্যাঙ্গো', 'স্প্যানিশ', 'ট্যাপাটিয়া', 'এসট্রেলিটা' প্রভৃতিছন্দে, ভংগিতে, লাস্যে নবীন প্রবীণ সকলকে মুগ্ধ চঞ্চল করিয়া তুলিল। আনন্দে উত্তেজনায় করতালি দিয়া উল্লসিত দর্শকমণ্ডলী প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

সেই যুবকটি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন লাগছে ?" রুজ-ঘষা গালখানা আরও লাল করিয়া তরুণী উত্তর দিল—"ছিঃ, ওদের কি একটু লজ্জা সরম নেই ! মাগো !"

স্বামী হাসিয়া তরুণীর কোমল হাতটায় একটা মৃদু চাপ দিল।

ইহার পর আরম্ভ হইল 'দোলন-নৃত্য'। একটা প্রকাণ্ড উঁচু তেপায়ার উপর একটা কাঠের রোলার রাখা হইল; তাহার উপর আড়াআড়ি করিয়া একখানা তক্তা রাখা হইল। একটি মইয়ের সাহায্যে ডিমিট্রী তক্তার উপর উঠিল এবং অবলীলাক্রমে সেই রোলারের উপরস্থ তক্তার উপর দাঁড়াইয়া নানা কসরৎ দেখাইতে লাগিল। তাহার দেহ-ভংগির সংগে সংগে তক্তাখানা রোলারের উপর এধার ওধার করিতে লাগিল। দর্শকদল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই ভার-সমতার কৌশল দেখিতে লাগিল। অনতিপরেই মূর্তিমতী আনন্দের মত নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে মঞ্চে ঢুকিল ল্যারিসা। ল্যারিসা গান গাহিল, ডিমিট্রী গানে গানে তাহার উত্তর দিল; তাহার পর একটা ছোট মই দিয়া ল্যারিসা রোলারের উপরের তক্তায় উঠিল। দুই জনের ভারে তক্তাখানা রোলারের উপর দ্রুত এধার ওধার করিতে লাগিল। রোলারের উপর হইতে তক্তাখানা যদি সরিয়া যায় তাহা হইলে সেই দশ বার ফিট্ উঁচু হইতে উহাদের পতন অনিবার্য।

কিন্তু ডিমিট্রী অত্যাশ্চর্য ভার-সমতা দ্বারা ল্যারিসাকে লইয়া সেই দোলায়মান তক্তার উপর নানা কৌশল দেখাইতে লাগিল। ল্যারিসা ডিমিট্রীর কাঁধে উঠিল।

কাঁধের উপর একপায়ে দাঁড়াইল—মুগ্ধ জনতা ঘন ঘন করতালিতে এই দুঃসাহসিক কৌশলকে অভিনন্দিত করিল। ইহার পর ডিমিট্রী দুই হাত উঁচু করিয়া ধরিল, ল্যারিসা তাহার হাতের উপর মাটি হইতে

প্রায় বিশ ফিট উঁচুতে দাঁড়াইল, নীচের তক্তাখানা রোলারের উপর এধার ওধার দুলিতেছে। ইহার পর ল্যারিসা ডিমিট্রীর দুই হাতে নিজের দুই হাত রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া সমস্ত দেহখানা শূন্যে তুলিয়া দিল। স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দর্শকদল এই অপরিসীম সাহস দেখিতেছিল—হাততালি দিতে তাহারা ভুলিয়া গেল।

যখন খেলা শেষ করিয়া ল্যারিসা ডিমিট্রীর কাঁধে বসিল তখন দর্শকদের হাততালির কথা মনে পড়িল। ইহার পর ল্যারিসা নিজের মাথা ডিমিট্রীর মাথায় দিয়া শুধু মাথার উপর শরীরের সমস্ত ভার দিয়া দেহটাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া শূন্যে হাত ও পা মেলিয়া দিল, নীচে তক্তাখানা ভয়ানক দুলিতে লাগিল। পলকের মধ্যে তক্তাখানা রোলার হইতে ছিটকাইয়া গেল। রুদ্ধশ্বাসে দর্শকদল দেখিল ল্যারিসা স্টেজের মেঝেয় সজোরে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া গেল। সংগে সংগে স্টেজের সমস্ত আলো নিবিয়া গেল; সামনের পর্দা পড়িয়া গেল। ক্ষণপরেই প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলিয়া উঠিল। দর্শকদল কিছুক্ষণ ভয়ে বিস্ময়ে উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া রহিল। সকলেরই মুখে এক আশংকা ও প্রশ্ন,—"কি হ'ল?"

কিন্তু মিনিট দুইয়ের মধ্যেই স্টেজের পর্দা সরিয়া গেল। প্রোগ্রাম মত তখন সেখানে 'কশাক' নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্‌বেরঙের পোষাকে নৃত্য-পরায়ণ আনন্দ-উচ্ছল পুরুষ ও নারীর দল উৎকণ্ঠিত দর্শকদলকে ক্ষণিকের মধ্যেই পুনরায় আনন্দের কোলাহলে ডুবাইয়া দিল।

'শো' শেষে মোটরে উঠিয়া স্বামী জিজ্ঞাসা করিল,—"মঞ্জু, কেমন লাগল শো?"

—"চমৎকার!" সত্যিই ওরা বাঁচতে জানে, ওদের জীবনে আনন্দ যেন উছলে পড়ছে। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, শক্তিতে ওদের জীবন কানায় কানায় উজান চলেছে—"

স্বামী সেলফ্ স্টার্টারে পা দিতেই ইঞ্জিন আওয়াজ করিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে স্টেজের পিছনে আর একটি মোটারের ইঞ্জিন আওয়াজ করিয়া উঠিল। ব্যালেটের ম্যানেজার ডাক্তারের হাতে ফি-এর টাকা কয়টা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন আশা নাই ডাক্তার?"

বিষণ্ণ মুখে ডাক্তার বলিল,—"বোধ হয় না। মাথায় সাংঘাতিক চোট লেগেছে, শিরা ছিঁড়ে গেছে।"

টিকিট ঘরে আনন্দ-সন্ধানী দর্শকদল তখন ভিড় জমাইয়াছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার 'শো' আরম্ভ হইবে। দোলন-নৃত্যের পরিবর্তে 'ট্রাপেজ' দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল।

'শো' ত বন্ধ থাকিতে পারে না।

অভিনেত্রী

শচীন্দ্রনাথ সিংহ

শচীন্দ্রনাথ সিংহ: জন্ম—উনিশ শ' আঠার সালে, কলকাতায়। পৈত্রিক বাসভূমি—কলিকাতা। ছাত্র-জীবন—কলিকাতা। ইনি নৃত্যশিল্পী হিসাবে পরিচিত।

কি নির্লজ্জ—একেবারে লজ্জাহীন, সরম বলে কিছু যেন নেই!

রোজই তার সংগে দেখা হয় সামনের বাড়ীর জানালায়। কি দৃষ্টি, টানা চোখে সে যেন আমারই দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে। তার এই আকুলতা দেখে হাসি জেগে উঠত আমার ঠোঁটে। হাসতে হাসতে সিঁড়ির ধাপগুলো নিমিষে পেছনে ফেলে নিজের ঘরে এসে ঢুকতুম।

বৌদি চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে বলতেন—আজ আবার কি প্লট নিয়ে বাড়ী ঢুকলে ঠাকুর পো, তোমার জ্বালায় আর পারি নে। নাও, চা ধর, ঠাকুর বসে—খান কতক লুচি চট করে ভেজে নিয়ে আসি, পালিয়ে না ভাই—বেশী সময় লাগবে না।

হেসে বলি—দ্যাট্‌স্ অলরাইট্ বৌদি, কিন্তু দেরী না হয় যেন—সাতটায় আমার এনগেজমেণ্ট।

উত্তর না দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নীচে নেবে যায় বৌদি—। রেডিও খুলে দিয়েছি, অনর্গল সে বকে চলেছে—ডাক্তার নাগের বক্তৃতা, অণিমাদেবীর সেতার, পূর্ণিমা ঘোষের গান—

পূর্ণিমা ঘোষের গলা। রেডিও আর্টিস্টের প্রায় সকলের গলার সংগে আমার পরিচয় যথেষ্ট, কাজেই গোল ঠেকল না—। তন্ময় হয়ে গান শুনছি। খানকতক লুচি সাজান থালা হাতে ঘরে ঢুকে বৌদি বললেন—কার ধ্যান হচ্ছে ঠাকুর পো···

হেসে রেডিওর দিকে হাত বাড়িয়ে বললুম—ঐ ওর—

শচীন্দ্রনাথ সিংহ

আমার নির্দেশ অনুসরণ করতে গিয়ে রেডিওর কথাগুলো বৌদির কানে এসে পৌঁছল—কার ধ্যানে মগ্ন ওগো—কত ভাষায় সুধাই তোমায়—নীরব তুমি হায় গো হায়—

বৌদি বললেন—সত্যি হায় হায় ঠাকুর পো—কতভাষায় সুধায় তবু নীরব ওগো—বেশ প্রেমের ছন্দ তো—কোন সাহিত্যিকের—

—কেন আমার লেখা, সেদিন 'জাগ্রত'তে পড়নি—

—মনে কি থাকে ছাই, যে কাজ—তার পেছনে ছুটতে ছুটতে সব গুলিয়ে যায়...

আধুনিক সাহিত্যিক বলে বাড়ীতে আমার বেশ যশ, অবশ্য বাইরের পাঠকদের কাছে কিনা তা জানা নেই। নিজের নাম-যশ শুনি শুধু বৌদি আর পাশের বাড়ীর মীনার কাছে। কলেজের ছাত্রী মীনা, বয়সে যৌবন দেখা দিয়েছে; সারা অংগে তার বসন্তের লেপন—কি সুন্দর! টানা চোখে সুরমা দিয়ে, পাতলা ফুট্‌ফুটে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসে মীনা যখন বৌদির কাছে গল্প করতে আসে তখনই হয় আমার মুস্কিল—না পারি চোখ ফেরাতে না পারি কথা কইতে।

ছোট ভায়লেট রঙের লেডিস্‌ রুমালে কপালের কয়েক ফোঁটা ঘাম মুছে মীনা জিজ্ঞেস করে—আপনার 'ঝরাফুল' বইটা ফিল্‌ম্‌ হচ্ছে নাকি?

মীনার ঔৎসুক্যভরা দুটো কালো ভ্রমরচোখ আমায় অনুরোধ করে। আমি বলি—মডার্ণ ফিল্‌ম কোম্পানী তো নিয়েছে।

একগাদা লেখা নিয়ে সবেমাত্র চৌকাঠে পা দিয়েছি একটানা মৃদু হাসির রোল আমার কানের পর্দায় ধাক্কা দিয়ে একটু সজাগ করে দিল—পেছনে তাকাতেই সামনের বাড়ীর মেয়েটির সংগে হয়ে গেল

চোখা-চোখি। সেই নিখুঁত মূর্তি—আহা রূপই বটে—। দুধে আলতা মেশান রূপে নীলাম্বরী আবরণে চমৎকার মানিয়েছে—চোখ ফিরতে চায় না, ইচ্ছে হয় ওরদিকে তাকিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিই—ওমরের কবিতার মত—।

মীনার আসার সময় হয়েছে—মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। আমার এই একঘেঁয়ে জীবনে সেই একটু শান্তি এনে দেয়।

দিনের আলো সন্ধ্যার মুখে চুমা এঁকে ফিরে যেতে চলেছে, এমনি সময় মীনার ডাকে চমক ভেঙে গেল। তার চোখে ধূলো দেবার প্রয়াসে লেখাগুলো নাড়াচাড়া সুরু করলুম।

চেয়ার টেনে পাশে বসে মীনা বলল—আবার কাকে ছাঁচে গড়ছেন বিধাতাপুরুষ।

উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলুম।

সামনের বাড়ীর দিকে আঙুল নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলুম—ওটা কাদের বাড়ী মীনা—?

মীনার পাতলা ঠোঁটের কোণে খানিকটা হাসির জোয়ার ছল ছল করে ধাক্কা লেগে শান্ত ও নীরব হয়ে গেল। সে উত্তর দিল—এই বুঝি আপনি অতি-আধুনিক 'জাগ্রত' পত্রিকার সম্পাদক—

জোর করে মীনা হেসে উঠল—।

রাগে সারা অংগ জলে উঠল কিন্তু খবরটা আমার চাই...কাজেই কৃত্রিম হাসি টেনে প্রফুল্লতা দেখিয়ে বললুম—না জানলে জানিয়ে দেওয়া উচিত ত মীনা—

—নিশ্চয়—

আবার মূর্তি দেখা গেল—অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে—কানের

কাছে মুখ এনে মীনা বললে—ঐ যে দেখছেন, উনিই এই বাড়ীর মালিক—বয়স মোটে উনিশ। ওর নাম মিস্ স্থ—কি রূপ! ফরাসীর ঘরে জন্ম কিনা, তাই—বাপ ছিল ওর বাঙালী; আজ সবাই গত, জগতের সবরকম দুঃখ সহ্য করতে ও শুধু একাই বেঁচে আছে ওদের বংশে। সিনেমার অভিনেত্রী সবাই ওকে বলে।

অফিসে বসে লেখা পড়ছি—।

সিনেমা এডিটর এসে বললেন—ভাগ্যবান বলতে হবে আপনাকে সৌমেন বাবু—!

—কেন—?

—আপনার 'ঝরাফুল' মডার্ণ ফিল্ম শেষ করেছে। আসছে শনিবার দেখান হবে—এই দেখুন "জাগ্রত"র নিমন্ত্রণ···

আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছি, যেতে হবে 'ঝরাফুলে'র প্রথম দিনে, ডিরেক্টর মনোজ গুপ্ত বিশেষ করে জানিয়েছেন, রিংও করেছেন দু'বার।

শনিবার ছ'টায় বই আরম্ভ/। আমি গিয়েছি, লেখক বলে অভ্যর্থনা পেলুম একটু বেশী। ডিরেক্টার নিজেই অভ্যর্থনা করলেন।

বসে আছি, বই আরম্ভ হতে মিনিট খানেক বাকি।

বেল পড়ল—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। আলো নিভল, গোলমাল নিথর হয়ে এল। একদল অভিনেত্রীর সংগে মনোজ গুপ্ত এসে বসলেন আমার পাশে।

ছবি সুরু হয়েছে—অধীরার জন্ম-ইতিবৃত্ত দেখান হচ্ছে—ঘটনা-বহুল বৈচিত্রে মন আবিষ্ট হয়ে পড়ে। মনোজ বাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে?

বলল্ুম—আপনার ছবি কখনো খারাপ দেখেছি—

ছবি চলেছে এগিয়ে—দৃশ্যের পর দৃশ্য আসে, পুরোন দৃশ্য

মিলিয়ে যাচ্ছে পর্দার গায়ে। এবার এল এক সুন্দর এবং মর্মান্তিক দৃশ্য।

বড় লোকের ছেলে প্রমোদ, এমেচার অভিনেতা, তাকে ভালবাসে অভিনেত্রী অধীরা। কিন্তু প্রমোদ অধীরাকে চায় না এবং চাইবে না এই তার প্রতিজ্ঞা। মেলামেশা তাদের যথেষ্ট। একদিন অধীরা বল্‌লে—প্রমোদকে সে ভালবাসে...।

প্রমোদ হেসে বললে—তা হয়না অধীরা, প্রফেসনাল অভিনেত্রীর জন্যে আমি প্রেম বিতরণ করতে পারি না এবং কোরব না।

উত্তেজিত হয়ে অধীরা বললে—কেন প্রফেসনাল অভিনেত্রী বলে কি তারা মানুষ নয়? কিন্তু যারা অপরিচিতাকে অযাচিত প্রেম দেয়, তাদের কথা ভাবেন কি? প্রেমের জাতবিচার করলে চলেনা প্রমোদ বাবু—

প্রমোদ জবাব দেয়—প্রেম বিতরণ করা আমার ব্যবসা নয় অধীরা। স্পষ্ট কথা তোমায় বলি—তোমায় আমি ভালবাসিনা, বাসবনা কোনদিন—!

—অভিনেত্রীর হৃদয়ে কি প্রেম ভালবাসা, মানবিক বৃত্তিগুলি নেই প্রমোদবাবু?

—আছে। কিন্তু অভিনয় জিনিষটা তাদের সহজ বলেই বাস্তবকে তারা হেলা করে।

অধীরা ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে এল প্রত্যাখ্যানের বাণী নিয়ে—শুক্‌নো ফুলের মত ঝরে পড়ে অধীরা লজ্জায় এবং অভিমানে।

আলো জ্বলে উঠেছে—দৃশ্য সব শেষ হয়ে গেছে। চার পাশে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে—ছবির আলোচনা চলেছে মুখে মুখে।

মনোজ বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি মিস্ স্থ, সৌমেন বাবু আপনার 'ঝরাফুলের' নায়িকা।

হাত দুটো কপালে ঠেকাই—প্রত্যুত্তরে অভিনেত্রী মিস্ স্থ বলেন—নমস্কার সৌমেন বাবু। একথা-ওকথা, অনেক গল্প আলোচনার পর মিস্ স্থ আমাকে বল্‌লেন—জীবনটা আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন আপনার 'ঝরাফুলে'। ভাল আমি সত্যি বেসেছি একজনকে। জানি সে প্রত্যাখ্যান করবেই—অভিনেত্রীদের প্রেম করবার অধিকার নেই—একবারেই নেই, না সৌমেন বাবু—!

তার প্রগল্‌ভতায় আশ্চর্যান্বিত না হ'লেও একটু চমকিত হলুম।

হেসে বললুম—আছে মিস স্থ—ভালবাস্‌বার অধিকার সবারই আছে। কিন্তু সেই ভালবাসার সম্মান সবাই রাখতে জানে না, বা রাখে না। আসল কথা বাইরের আবরণ দেখে প্রেম করা হয় না—হয় প্রেমের মিথ্যে অভিনয়। অন্তরের মিলনই প্রকৃত প্রেম, নয় কি মিস্ স্থ—?

—সে কথা ঠিক সৌমেন বাবু, কিন্তু—

—কিন্তু কি মিস্ স্থ—?

আমার দিকে তাকিয়ে মিস্ স্থ বললেন—বল্‌তে পারেন প্রায়শ্চিত্তের পর আমাদের এতখানি জমা পাপ ক্ষয় হয় কিনা—?

—হয়। কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্তের জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না—অনুশোচনা তাকে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ করে তোলে মিস্ স্থ—আপনার ভেতরের সবখানিতো হীরের মত ঝক্ ঝক্ করছে। অভিনেত্রী হলেও আপনি পবিত্র—অতি পবিত্র মিস্ স্থ—!

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস্ স্থ বললেন—জানেন সৌমেন বাবু,

অভিনেত্রীর জীবনে বাহিরে এবং ভেতরটা হীরের মত ঝক্ ঝক্ করে সত্যি—সেটা কি জানেন—সেটা প্রলোভনের আগুন—

—সে যাই হোক মিস্ স্থ—আপনি পবিত্র, অন্যের কাছে যাই হোন না কেন, আমি জানি আপনি পবিত্র—অনুরোধ করছি দয়া করে আমার সে বিশ্বাসটুকু ভেঙে দিবেন না—

কোন কথাই বললেন না মিস স্থ, হাসলেন শুধু। চোখের কোণে অশ্রুর বেগ। সে অশ্রু দুঃখের নয়, আনন্দের। মিস্ স্থ জানেন অভিনেত্রীদের জীবন—আরো জানেন তাদের ওপর লোকের ধারণা। তাই আমার কথায় মিস্ স্থ'র চোখে জল এল।

উৎস

সুনীল ঘোষ

সুনীল ঘোষ : জন্ম—উনিশ শ' আঠারো সালে চন্দননগরের অন্তর্গত নাড়ুয়া পল্লী। পৈত্রিক বাসস্থান চন্দননগর। ছাত্রজীবন—হুগলী ও কলিকাতা। বর্তমানে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

আজকাল সাধারণ পাঠকমহলে আমাদের অমলের নামে সাহিত্যিক বলে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে—ও একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে। নানা সাহিত্য-সভা বা সম্মেলন থেকে প্রায়ই ওর নিমন্ত্রণ আসে; অভ্যর্থনার কোন ক্রুটি থাকে না সেখানে।

অমলের এই যে এত আদর-আপ্যায়ন, এত নাম-যশ, প্রসার-প্রতিপত্তি এর পেছনের ইতিহাসটা ভারী মনোরম এবং তা শোনাবার জন্যেই অর্থাৎ, ওর এই লেখক হবার গোড়ার কথাটা বলবার উদ্দেশ্যেই এই লেখার অবতারণা।

অমল তখন পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র। সবে মফঃস্বল থেকে এসে ভর্তি হয়েছে। থাকে একটা মেসে।

সাধারণত স্থায়ী বাসিন্দার চেয়ে যারা নবাগত, তাদের কাছে সহরের আকর্ষণটা হঠাৎ এত বেশী প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে তারা তাদের সদ্য পরিত্যক্ত নিজ নিজ গ্রামের কথা বলতে নাক সিঁটকায়। সোজা কথায় তারা কোনদিন তাদের পল্লীমায়ের স্নিগ্ধ-শ্যামল ক্রোড়ে ফিরে যেতে চায় না। অবশ্য এমন লোক বিরল নয়, যারা যথাশীঘ্র রাজধানীর তিক্ত আবহাওয়া ছেড়ে দূরে বাইরে গিয়ে দু-দণ্ড হাঁফ ছাড়তে পারলে বাঁচে; কেননা তাদের এ আলোর হঠাৎ ঝলকানি তেমন সহ্য হয় না। আর অমল যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত

তা বলাই বাহুল্য। ওর মন নাগরিক সভ্যতার যান্ত্রিক যাদু-স্পর্শে যে বিষাক্ত না হয়ে ক্রমশঃ রঙীন হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

যাই হোক, আধুনিকতার লক্ষণ বলতে আমরা যা যা বুঝি তার সবগুলিই আয়ত্ত করেছে অমল। অমল স্নো-পাউডার মেখে কলেজে যায়, হরদম সিগারেট খায়, প্রফেসারদের লেকচার শোনবার ভান করে মেয়েদের মানে সহপাঠিনীদের কাছে প্রমিনেণ্ট হবার চেষ্টা করে, কণ্টিনেণ্টাল লিটারেচার নিয়ে তর্ক করে, ক্লাসে দেরী করে ঢুকে অথবা চেঁচামেঁচি করে, রেস্টুরেণ্টে চা-চপ-কাটলেট খায়, আর যেদিন খুসী সাহেব পাড়ায় সিনেমা দেখতে যায়। এক কথায় ছিপছিপে গড়ন, সারা বছরই শীতগ্রীষ্ম কেয়ার না করে নিজের স্বাস্থ্যহীন দেহটি আদ্দির পাঞ্জাবী ঢাকতে তৎপর।

অমলদের মেসটার এধারে ওধারে খানকয়েক বাড়ী, ভদ্র গৃহস্থের। এখনকার দিনে রোমান্স করতে গেলে এই সব বাড়ীর প্রত্যেকটিতে অন্তত অধিকাংশতেই কলেজে-পড়া তরুণী থাকবে—রুজ পমেটম আরম্ভ করে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ ও বেঁটে হাতা, নিত্য নূতন সাড়ী থেকে আরম্ভ করে নূতনতম জ্যাকেট, হাতের ক্ষুদ্রাদপি রিস্টওয়াচ থেকে পায়ের হালফ্যাসনের হাই-হিল জুতো মাথার অবিন্যস্ত অলকগুচ্ছ থেকে ফেরতা দিয়ে পরা শাড়ীর ভাঁজ—এককথায় আধুনিকতার সব লক্ষণ যাদের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে বর্তমান। অমলের রুমের সামনেকার বাড়ীতেই রয়েছে কমলা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে সে।

কমলা কারণে-অকারণে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপরে বসে অমল কখনও বা সাইড্-ভিউ নেয়, আবার কখনও বা সোজাসুজি জানালায় দাঁড়িয়ে একেবারে দু'জনে মুখোমুখি

ফুল ভিউ। অমলের সংগে চোখাচোখিতে আহত হয়ে কমলা চট্ করে লীলায়িত ভংগিতে সরে যায় জানলা থেকে। অমলের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

বেচারা অমল। আধুনিক ও, তাই অকপট। আমাকে বললে সেদিন—ভবানী, প্রেমে পড়ে গেছি ভাই।

তার রকম দেখে আমি একটু গম্ভীর হয়ে পড়্লাম। বললাম—কিন্তু মেয়েটি কোথাকার? আমাদের ক্লাসের নীলা নয় ত?

নীলার কথা আমার মনে আসার কারণ, পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ঐ মেয়েটিই সব্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো সর্বাগ্রে।

—লীলা নয়। আমার রুমের সাম্না-সাম্নি বাড়ীর, কমলা।

—একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি অমল, আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে হঠাৎ বললাম—তুই যে প্রেমে পড়েছিস বললি, বেশ ভাল কথা। কিন্তু তুই যাকে ভালবাসিস তাকে বিয়ে করতে পারবি? ধর, যদি ঐ কমলার সংগেই তোর বিয়ের ঠিকঠাক হয়…।

—তার মানে? অমল বললে—দেখ ভবানী, তুই কলকাতায় থাকিস, শিক্ষিত, কিন্তু আমি বলব, তুই একটি নিরেট গর্দভ, একেবারে আন-রোমান্টিক, প্রোজাইক, হোপলেস!

অমল নিয়মিত কমলাদের ওখানে যায়। চায়ের নিমন্ত্রণ হয় রোজই।

সেদিন সদাপ্রফুল্ল অমলকে একটু চিন্তান্বিত দেখলাম।

—সমাচার কি হে?

—বাবার চিঠি এসেছে।

—বাড়ী যেতে লিখেছেন বুঝি! তাই এত মন ভারী? কিন্তু এখন হঠাৎ বাড়ীতে যাওয়ার মানে?

—বড়দা'র বিয়ে। না গেলে চলবে না। দাদা রাগ করবেন।

—যাবি ত?

—ভাবছি।

—তাহলেই হয়েছে। ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

—কতকটা তাই বৈকি! পরশু কমলার বোনের জন্মদিন। তারপর দিন ওরা দিনকয়েকের জন্য কোথা যাবে প্রায় মাসখানেক আসবে না। আর আমার বাড়ী যাওয়া পরশুর আগে ত হতেই পারে না। অথচ আজ স্টার্ট করতে লিখেছেন বাবা, এখনও তবু একসপ্তাহ দেরী।

—তাইত! তা বোনের জন্মদিন, কমলার নিজের নয় ত!

—তুই কিচ্ছু বুঝিস না ভবানী। জানিস, ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু লভ মি লভ মাই ডগ ফার্স্ট।

—বেশ, দেখাই যাক তোর প্রেম কতদূর গড়ায়।

পরদিন খবর নিয়ে জানলাম অমল সেই দিনই বাড়ী গেছে।

ঠিক সপ্তাহখানেক পরে অমল আবার ফিরে এল। এবার ওর মুখখানা বেশ গম্ভীর, চেহারা রুক্ষ। ব্যাপার কি? ওর হল কি?

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম—এর মানে?

—বলছি, অত ব্যস্ত কেন?

অমল বেশ স্থির হয়ে গুছিয়ে যা বললে তার সারাংশ এই, ওর বড়দার সংগে যার বিয়ে হয়েছে সে অর্থাৎ সেই নববধূ আর কেউ নয়, কমলা। চমৎকার কথাই বটেঃ ওর বৌদি কমলা আর ওর প্রেম-আরোপিতা কমলা একেবারে অভিন্ন ব্যক্তি। বিয়ের পর কমলার সংগে কথা হওয়া ত দূরে থাক, অমল লজ্জায় তার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে নি।

একটা শ্‌ক বটে! সেই শক্‌ রূপান্তরিত হল সাহিত্যের প্রেরণায়। আজ তাই সে বিখ্যাত সাহিত্যিক, নাম-করা লেখক।

প্রবোধ সরকার ঃ জন্ম—উনিশ শ' আট সালে, হাওড়ায়। পৈতৃক বাসস্থান—হাওড়া। ছাত্রজীবন—কলিকাতা। এঁর রচিত পুস্তক—'নারীপ্রগতি', 'তোমরা আর আমরা' ইত্যাদি। 'দুন্দুভি'র ভূতপূর্ব সম্পাদক। বর্তমানে কলিকাতার 'আদর্শ উচ্চ ইংরেজী স্কুলের' শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত আছেন।

ভুল

প্রবোধ সরকার

কতক্ষণ আর প্রতীক্ষায় থাকা যায়—বিশেষত অসুস্থ শরীরে। কল্পনা অতিকষ্টে খাটের উপর উঠে বসে, খোলা জানালা দিয়ে যেন কাদের আগমন প্রতীক্ষায় বার বার রাজপথের দিকে চেয়ে দেখে। এমনিভাবে কতক্ষণ কাটে কে জানে, হঠাৎ কে যেন অতি সন্তর্পণে এসে অন্যমনস্কা কল্পনার চোখদুটো পিছন থেকে চেপে ধরে।

কল্পনা বলে,—"আঃ, ছাড়ো ছাড়ো—বাসন্তীদি কি মনে করবে?"

অন্যপক্ষ নীরবে চোখদুটো টিপে ধরে থাকে। কৃত্রিম বিরক্তিভরা স্বরে কল্পনা বলে,—"আঃ, কি যে ইয়ার্কি কর!"

চোখদুটো ছেড়ে দিয়ে নবাগতা মৃদু হাস্যে বলে,—"বিবাহিত জীবনের এই কি অভিজ্ঞতা না কি? তা যাক্—কিন্তু তুই কি হয়েছিস? তোকে যে আর চেনা যায় না কল্পনা! জামাইবাবু কোথায়?"

কল্পনা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে,—"হাওড়া স্টেশনে তোমাকে যে আনতে গেছেন!"

"আমি ত শেয়ালদা দিয়ে এলাম।" কল্পনা তার ক্ষীণ হাত দুটি দিয়ে বাসন্তীর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে,—"ভারী মজা হয়েছে

বাসন্তীদি। উনি ফিরে এলে, বেশ খানিকটা রগড় করা যাবে। উনি ত আর তোমায় জানেন না! বামুন দি—!"

বাসন্তী বলে,—"বামুনদি'কে এখন ডাকবার কিছুমাত্র দরকার নেই। জামাইবাবু ফিরে এলে এক সংগেই চা খাব।—খোকা হবার পর থেকে কিছুতেই আর সেরে উঠতে পারলি না, দেখছি!"

হতাশার হাসি হেসে কল্পনা বলে,—"চেষ্টার ত ত্রুটী হচ্ছে না, কিন্তু কৈ আর পার্‌লাম!"

বাসন্তী বলে,—"খোকা কোথায়?"

কল্পনা বলে,—"চাকরটা কোলে করে নিয়ে ওঁর সংগে মোটারে বেরিয়েছে। তা বাসন্তীদি, তোমার খবর কি?"

"সুদূর রেঙ্গুনে নিঃসহায় অবস্থায় পড়ে থাকি—তোরা আর ভুলেও খোঁজ খবর নিন্‌ নে।"

"তোমার স্বামীকে অবশ্য আমি দেখিনি, কিন্তু স্বামী হয়ে তোমার মতো মেয়েকে কেমন করে তিনি ত্যাগ কর্‌লেন বাসন্তীদি!"

বাসন্তী কপালে হাতটা ঠেকিয়ে বলে,—"বরাত, ভাই—বরাত! তা নইলে বাংলার মাটি ছেড়ে জীবিকার্জনের জন্য আমায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সেই রেঙ্গুনে আশ্রয় নিতে হয়! তা ছাড়া বিয়ে করা—বড় লোকের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়! আমার স্বামী আমায় বিয়ে করেছিলেন ঐ খেয়ালের বশে, স্ত্রীর মর্যাদা আমি কেমন করে দাবী কর্‌বো ভাই!"

বাসন্তীর চোখের কোণে জমে-ওঠা জল মুছিয়ে দিয়ে কল্পনা বলে,—"এখন তিনি কোথায় আছেন?"

বাসন্তী শুষ্ক হাসি হেসে বলে,—"স্বেচ্ছায় যে তার স্ত্রীকে ত্যাগ

করে কল্পনা, সে স্ত্রীর পক্ষে তার খোঁজখবর রাখাটা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় কি ?"

কিছুক্ষণ কারুরই মুখে কথা নেই। গোধূলির আলোয় ঘরখানা যেন বিবর্ণ—মুমূর্ষু মৃত্যুপথযাত্রীর মতোই স্তব্ধ, ম্রিয়মান। স্তব্ধতা ভংগ করে বাসন্তী বলে,—"কৈ, জামাইবাবু এখনও এলেন না কেন ভাই ?"

"তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় কি জানি কেন উনিও এই দুদিন কি উৎকণ্ঠাতেই না কাটিয়েছেন! তোমার সংবন্ধে কত অবান্তর প্রশ্নই না করেছেন। তোমায় দেখলে বাসন্তীদি, সত্যি উনি বড্ড খুসী হবেন।"

একগাল হেসে বাসন্তী বলে,—"আর আমি ?"

"উনি এমন মজাদার লোক যে, তুমিও খুসী না হয়ে কিছুতেই পারবে না—একথা আমি জোর গলায় বলে রাখছি বাসন্তীদি !"

"আমরা দুজনে খুসী হলে তুই নিজেও খুসী হতে পারবি তো ?"

চোখের তলায় বিদ্যুৎ এনে কল্পনা টানা সুরে বলে,—"যদি বলি—হ্যাঁ।"

কোন উত্তর না দিয়ে বাসন্তী ওর শীর্ণ গণ্ডদুটি টিপে দেয়।

বাসন্তীর কলেজের বন্ধু কল্পনা। অভাবের তাড়নায় গরীবের ঘরের মেয়ে বাসন্তীর কলেজ-জীবন বেশীদূর অগ্রসর হবার পূর্বেই ওর পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই বাসন্তীর আর তার মা'র গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গিয়ে পড়ে কন্যার উপর। জনৈক কাউন্‌সিলার-পুত্রের সহানুভূতিতে বাসন্তী কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পায়।

হিন্দুর পুরানোক্ত মদন তাঁর সুতীক্ষ্ণ পুষ্পশর কখন যে

কার উপর নিক্ষেপ করেন—তার সঠিক খবর আজ বৈজ্ঞানিক সভ্যজগতেও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। মোট কথা—ঐ নিক্ষিপ্ত ফুলশরের হাত থেকে বাসন্তীও অব্যাহতি পায় নি। সহানুভূতি-পরায়ণ কাউন্সিলার-পুত্র শ্রীমান মিহিরকুমারের প্রেম-সায়রে দিশাহারা-তরীতে কর্ণধারের পদে অভিসিক্ত হয়।

বাসন্তীর আইবুড়ো নাম অবশ্য খণ্ডন হয়; কিন্তু প্রেম আর চোখের নেশা এক জিনিষ নয়। মিহিরকুমার বাসন্তীর প্রেমে পড়েন না,—পড়েছিলেন চোখের নেশায়। নেশা মানুষের না কেটে পারে না, তা সে যত সময়সাপেক্ষই হোক।

আফিমের নেশা, গাঁজার নেশা, মদের নেশার মতো ধনীনন্দন শ্রীমান মিহিরকুমারের চোখের নেশাও কাটে। তার ওপর রাস্তায় ফেরা অবগুণ্ঠনহীনা মাষ্টারণী পুত্রবধূকে মিহির-জননী গৃহে স্থান দিতে একান্ত নারাজ।

মাতৃভক্তির অপূর্ব পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কলিযুগে শ্রীমান মিহির-কুমার নিজ বিবাহিত পত্নী বাসন্তীকে চিরতরে ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না।

নেশা যখন কাটে তখন সেই নেশার পাত্র বা পাত্রীকে জগতের সেরা অধম শত্রু বলেই মনে হয়। শত্রুর অনিষ্ট করাই নাকি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মোট কথা বাসন্তীর চাকরীটি হারাতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। তারপরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বাসন্তী রেঙ্গুনে একটা চাকরী জোগাড় করে, বৃদ্ধা মাতার হাত ধরে বাঙলার মাটির মায়া কাটিয়ে রেঙ্গুন যাত্রা করে। সে আজ প্রায় পাঁচ বৎসর আগের কথা।

মাতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশের জন্য বাসন্তীর প্রাণ যেন কেমন

ছটফট করে। কল্পনার সংগে পূর্ব হতেই তার পত্র ব্যবহার চলতো। কল্পনা তাকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতে লেখে।

"তোমাদের বন্ধু আসেনি কল্পনা ?"

হতাশার স্বরে বলতে বলতে দ্বারের পর্দা সরিয়ে যিনি কক্ষে প্রবিষ্ট হলেন—তিনিই পত্নীত্যাগী মিহিরকুমার।

স্বামীর চোখে চোখ মিলিয়ে কল্পনা ওর শীর্ণ হাতদুখানি দিয়ে বাসন্তীর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে,—"এই নবাগতাই আমার প্রবাসীবন্ধু বাসন্তীদি।"

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে মিহির ও বাসন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ে। ওদের পায়ের তলা থেকে পৃথিবী যেন শত-সহস্র যোজন দূরে সরে যায়।

শীর্ণ মুখে স্বচ্ছ হাসি হেসে কল্পনা বলে,—"কি কারুর মুখে যে কথাটী নেই! কেমন বাসন্তীদি, তোমার জামাইবাবুকে সত্যি সত্যি তাক লাগিয়ে দিয়েছি কিনা বল ?"

তারপর কল্পনা স্বামীর দিকে ফিরে বলে,—"কি মনে হচ্ছে, ভানুমতির খেল, না ?"

মিহিরকুমার প্রত্যুত্তরে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসে মাত্র, আর বাসন্তী পাষাণেরই মত নতমুখে নিশ্চল।

হঠাৎ কল্পনা কাঁপতে কাঁপতে খাট থেকে মেঝের বুকে ঢলে পড়েই হাত পা ছুঁড়তে থাকে। ওর গোঁ-গোঁয়ানীর শব্দে যেন বাসন্তীর বুকখানা কেঁপে উঠে।

কম্পিত কণ্ঠে বাসন্তী বলে,—"কেন এমন হোল ?" মিহির বলে,—"অত্যধিক আনন্দ বা দুঃখের কল্পনায় মাঝে মাঝে ফিট্ হয়। তেমন ভয়ের কোন কারণ নাই। দু পাঁচ মিনিট পরেই ছেড়ে যাবে।"

বাসন্তী মিহিরের বিপরীত দিকে বসে কল্পনার মাথাটা কোলে তুলে

নেয়। কারুর মুখেই কথা নেই। গভীর মর্মব্যথা ও তীব্র অনুশোচনা যেন লজ্জার অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢেকে আলো-আঁধার ভরা ঘরখানির বুকে বিরাজমান। স্তব্ধতা ভংগ করে মিহির বলে,—"দেখো দেখি, এবার বোধহয় কল্পনা ঘুমিয়েছে।"

দুজনে ধরাধরি করে কল্পনাকে খাটের উপর শুইয়ে দেয়। পাখাটার স্পীড্ বাড়িয়ে দিতে দিতে মিহির বাসন্তীর দিকে চেয়ে বলে—"বাথরুম থেকে এসে এবার একটু চা-টা খাও। তোমাকে বড্ড পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।"

কোন উত্তর না দিয়ে বাসন্তী গলায় আঁচল দিয়ে মিহিরকে প্রণাম করে সুটকেশটা হাতে নিয়ে একহাতে দ্বারের পর্দাটা তুলে ধরে কল্পনার দিকে চেয়ে দেখে।

এগিয়ে এসে মিহির বলে,—"তুমি চলে যাচ্ছ?"

মুখ নীচু করে বাসন্তী বলে,—"হ্যাঁ"

মিনতির স্বরে মিহির বলে,—"কেন—কেন বাসন্তী?"

মিহিরের চোখের দিকে চেয়ে বাসন্তী বলে—"এখানে থাকবার অধিকার তো আমার নেই।"

"কল্পনার স্বামী আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হোত, তাহলেও কি তুমি—তুমি আজ চলে যেতে?"

বাসন্তী নীরব।

মিহির বাসন্তীর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলে,—"ভুল মানুষেরই হয় বাসন্তী! আমি আমার গতদিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো, তুমি আমাকে সে সুযোগটুকু দেবে না বাসন্তী! বল—বল—কথা বল! সমস্ত কথা খুলে বললে কল্পনা নিশ্চয় আমাকে তোমারি মত ক্ষমার চক্ষে দেখে তোমার যোগ্য ও প্রাপ্য আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তুমি—শুধু তুমি সম্মত হও বাসন্তী।"

সর্বহারার হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বাসন্তী বলে,—"ভুল—সম্পূর্ণ ভুল! যে ভুলের বশে একটা জীবন ব্যর্থতার হাহাকারে ভরে দিয়েছো, আজ আবার সেই ভুলের বশেই আর একটা জীবন ব্যর্থ কর্‌তে চাও!"

অবাক বিস্ময়নেত্রে মিহির বলে,—"তার মানে কি বাসন্তী?"

"স্বামীর জন্য হিন্দুনারী পারে সব—শুধু পারে না তার অখণ্ড প্রেমকে বিভক্ত কর্‌তে। প্রেমের আর ভগ্নাংশ চলে না। আসি—রাত্রি হয়ে এলো।"

মিহির তার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে অধীর স্বরে বলে,—"সত্যি তুমি চলে যাবে?"

হাতখানা মুক্ত করে সজল চোখে বাসন্তী বলে,—"আমি থাকলে কল্পনা আবার মূচ্ছিত হবে—আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে, কিন্তু সে তন্দ্রা আর ভাঙ্‌বে না।"

গলায় আঁচল দিয়ে আর একবার মিহিরকে প্রণাম করে যেমনি নিঃশব্দে এসেছিল ঠিক তেমনি নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাসন্তী ঘন আঁধারে মিশে যায় বিশ্বের অনন্ত প্রবাহে।

অবনীনাথ রায় : জন্ম—তেরশ' দুই সালে হুগলী জেলার কামরা গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান—যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগাঁ মহকুমায় মহেশপুর গ্রামে। ছাত্রজীবন—শান্তিনিকেতন, দৌলতপুর ও কলিকাতা। এঁর রচিত কয়েকখানা বই—'পাঁচ মিশেলি', 'অনুচ্চারিত', 'প্রবাসী বাঙ্গালী', 'বঙ্গ-প্রতিভা', 'অতীশ দি গ্রেট', 'অপৌরুষেয়'। ইনি 'গল্পিকা' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। বর্তমানে এলাহাবাদে মিলিটারি একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত আছেন।

রক্তমেরু

অবনীনাথ রায়

নরেশ বিলাত থেকে পি-এইচ, ডি, ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এল।

একদিন মা বল্লেন, বাবা নরু, এইবার বিয়ে-থা করে সংসারী হ, দেখে আমার চোখ জুড়োক।

নরেশ ছেলেবেলা থেকেই একটু ভাবুক প্রকৃতির। এই বিয়ে ব্যাপারটা সংবন্ধে তার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের খেয়াল ছিল। সে ভাবত, যে-মেয়েরা একটা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে বিপথে পা বাড়ায়, তাদের উপর বড় অবিচার করি; সমস্ত জীবন ধরে তাদের সে ভুলটা আমরা আর শোধরাবার অবকাশ দিইনে। ঐ জায়গায় তার মনে একটা ব্যথা ছিল। সে ভাবত, ঐ সব মেয়েদের যদি কেউ একটা চান্স দেয়, তবে হয়ত তাদের জীবনের গতি বদলে যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্যদেশ ভ্রমণের ফলে তার এই ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছিল।

সে বললে, মা, বিয়ে সংবন্ধে কিন্তু আমার একটা বিশেষ মত আছে। সেই মত অনুসারে বিয়ে দিতে যদি তোমার আপত্তি না

থাকে তবে আমি রাজী আছি। এই বলে সে সব কথা খুলে বল্‌ল— তার চোখের সামনে বিগত পাঁচ বছরের ছবি ফুটে উঠল। সে একটা মেয়েকে বড় ভালবাসত। কতদিন নিজেদের মনের গোপন কোণে তারা পরস্পরকে কামনা করেছে। তারপর নরেশ বিলেত চলে গেল। নরেশের অনুপস্থিতিতে কর্ণধারবিহীন নৌকার মত মেয়েটি একদিন পথ ভুল করেছিল। বহু অনুসন্ধানে নরেশ ফিরে এসে তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছে।

চোখের জলের ভিতর দিয়ে সমস্ত কাহিনী সমাপ্ত করে নরেশ বল্‌লে, তোমার কাছেই ত চিরকাল শিক্ষা পেয়েছি, মা, যে মন্দ কাজকে ঘৃণা করতে হয়—যে করে তাকে নয়। তবে আজকের দিন আমাকে এই আদেশ দাও, মা, যে সেই পথভ্রান্ত পথিককে যেন তোমারই পায়ের তলায় টেনে এনে তাকে মুক্তি দিতে পারি।

নরেশের মা লেখাপড়া জানতেন। তাঁর মতও অসামান্য রকমের উদার ছিল। নরেশের বর্ণিত মেয়েটি তাদের বাড়ীর পাশেই থাকত। ছেলের মুখে তার কথা শুনে সহানুভূতিতে তাঁর বুকের ভিতর মোচড় দিচ্ছিল। অন্যান্য সব দিক দিয়ে বিচার করে, এই মেয়েটীকে খুব খারাপ লোক বলতেও তাঁর সত্যনিষ্ঠ মন সায় দিচ্ছিল না। অথচ জন্মার্জিত সংস্কারও যে তাঁর ছিল না, এমন নয়। এই নিতান্ত অপরিচিত পথের যাত্রীরূপে নিজের ছেলেকে কল্পনা করতে তাঁর মাতৃহৃদয় ক্ষুব্ধ হচ্ছিল।

অবশেষে নিশ্বাস ফেলে মা বল্লেন—তোর কথাটা আমি বুঝেছি নরু, কিন্তু বাবা, ওপথ বড় কঠিন। শুধু সহানুভূতি দিয়েই ওর সমাধান হয় না। আর তা হয় না বলেই সমাজ ওপথে যেতে আমাদের প্রবৃত্তি দেয় না। বারণ আমি তোমাকে করিনে, করলেও

তুমি শুনবে না, কিন্তু একটা কথা আমার মনে পড়ছে। দাম্পত্য সুখের একটা মস্ত উপাদান হচ্ছে পবিত্রতা, সেটা যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেখানে পরস্পরের বিবাহিত জীবনের সুখের সংবন্ধে আমার মনে একটা খটকা আসছে। এটা তুমি ভাল করে ভেবে দেখো, নরু।

নরেশ বল্লে—তোমার ওকথাটাও যে আমি ভাবিনি, মা, তা নয়। আমার মনে হয়েছে ওটাও আমাদের মনের একটা সংস্কার। পবিত্রতা বস্তুটি চিরকাল সমাজে দেখে আসছি, ওর গুণগান শুনে আসছি, তাই ধারণা হয়ে গেছে যে জীবনের যত সার্থকতা বুঝি ঐ নিয়েই দানা বেঁধেছে। অপরিণত বয়সে হঠাৎ ভুল করার মধ্যে যে একটা স্বভাবজাত সুচিন্তিত বদমায়েসি প্রবৃত্তি নেই, সেইটিই আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে চাই।

নীরজা গৃহস্থঘরের মেয়ে ছিল। পাড়ার একটি দুষ্ট ছেলের প্ররোচনায় একদিন সে পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন সে সবে কৈশোর পেরিয়েছে। ছেলেটি দুদিন পরেই যখন চলে গেল তখন নীরজার ভুল ভাঙ্‌লো। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না—বহু কষ্টেসৃষ্টে গান শিখেছিল, সেই আয়েই কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ কর্‌ত। গানের সম্পর্কেই নরেশ তার সন্ধান পেয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নরেশ ঘরে ঢুকে বল্লে—নীরু, আজ একটা সুসংবাদ আছে। মায়ের মত পেয়েছি।

বেদনায় নীরজার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। নরেশের বুকের কাছে সরে এসে চুপি চুপি বল্লে—কিন্তু আমি কি তা'ত তুমি জান।

—হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি কোন সতী সাবিত্রীর চেয়ে কম নও।

ভুল মানুষে করে, কিন্তু সেই মানুষেই আবার ভুল শোধবার শক্তি রাখে। আমাদের সমাজ কোন দিনই এই শক্তি যাচাই করলে না। করলে যে ফল পেত, সেটা তুচ্ছ নয় বলেই আমার ধারণা।

—কিন্তু আমার জন্যে তোমার উঁচু মাথা হেঁট হবে, এত আমি সহ্য করতে পারব না। আমাকে ভালবেসে তোমার শেষে এই লাভ হল? বলে নীরজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নরেশ তাড়াতাড়ি তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লে—ছিঃ নীরু, তুমি এখনো সেই আগেকার মত ছেলেমানুষ আছ? এতে কাঁদবার কি হোল? বিনা প্রমাণেই যে মাথা উঁচু হয়ে আছে, তার জন্যে গৌরব আর যেই অনুভব করে করুক, আমি ত করিনে। বরঞ্চ এর পরেও যদি মাথা উঁচু রাখতে পারি তবেই গৌরব বোধ করব।

নীরজা আর একবার শেষ চেষ্টা করে বল্লে, কিন্তু আমি তোমাকে সুখী করতে পারব'ত? মনে কর কবে থেকে আমি হীন সংসর্গে রয়েছি। গৃহস্থ ঘরের আদবকায়দা ভুলেই গেছি। আমার দুই দিদিও এই দোষে দোষী। একেবারে ঘরে তোলার আগে এ সব কথাও একবার ভাব।

নরেশ বল্লে—রীতিনীতি কোন সমাজেরই আলাদা নয়, নীরু। মনই ওসব বলে দেয়। যদি তুমি আমাকে প্রকৃতই ভালবাস, তোমার আচার-ব্যবহার আপনা-আপনিই সহজ ও সরল হয়ে যাবে, কোনখানেই বাধা পাবে না।

এর মাসদুয়ের মধ্যেই নরেশের সংগে নীরজার বিয়ে হয়ে গেল। খবরের কাগজওয়ালারা 'ছি ছি' করলে। মা হাসিমুখে বরণ করে বৌ ঘরে তুল্লেন বটে, কিন্তু অলক্ষে তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি বাঁ হাত দিয়ে সেটা মুছে

ফেলে দুর্গা নাম স্মরণ করলেন। নীরজা ভূমিষ্ট হয়ে মাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। মা চিবুকে হাত দিয়ে তাকে আদর করলেন। মনে মনে বল্লেন—আশীর্বাদ করি তোমরা যেন সুখী হতে পার, বাছা।

বিয়ের পর দুবছর কেটে গেছে।

নরেশ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতার উপর প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীতে সে আর নীরজা বাস করে। মা দেশের বাড়ীতে থাকেন।

সেদিন একটু সকাল সকাল কলেজ থেকে নরেশ ফিরে এসে বল্লে, নীরু, চন্দননগরে আমাদের আজ একটা বড় সভা আছে। সেখানে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে। আমি আড়াইটের গাড়ীতে চল্লুম, ফিরতে রাত হবে।

হাওড়া স্টেশনে চন্দননগরের রোমক সমিতির সম্পাদক মহীধর বাবুর সংগে নরেশের দেখা হ'ল। তিনি তাড়াতাড়ি নরেশের কাছে এসে নমস্কার করে বল্লেন, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, নরেশ বাবু। আজ সকালে হঠাৎ গঙ্গেশ বাবুর বাবা মারা গেলেন। আজকে আমাদের ও-সভা আর হতে পারবে না। সভার তারিখ পরে যা স্থির হয় আপনাকে সংবাদ দেব। কিছু মনে করবেন না।

গঙ্গেশ বাবু ঐ সমিতির সভাপতি এবং তাঁর বাড়ীতেই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল।

নরেশ বল্লে—মনে আবার কি করব, মহীধর বাবু। গঙ্গেশ বাবুর বাবাকে আমিও জানতুম। তাঁর হঠাৎ মারা যাওয়ার সংবাদে আমিও একটু আশ্চর্য হয়ে গেছি। সে যা হোক্, গঙ্গেশ বাবুকে আমার কণ্ডোলেন্স জানাবেন। নমস্কার--আসি।

নরেশ বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে একেবারে থমকে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে এক সুপুরুষ যুবা পালংকের উপর উপবিষ্ট—তার কোলে মাথা রেখে নীরজা শুয়ে আছে। নরেশকে দেখে তারা দুজনেই চমকে উঠলো।

একটু পরে নরেশ পাশের ঘরে চলে গেল। যুবা পুরুষটী তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে সেই ঘরে নীরজা এসে ঢুকল। আস্তে আস্তে নরেশের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে,—দেখ, তুমি যেন ভুল বুঝো না। ও হচ্ছে জীবন—ভাল বংশের ছেলে। আমার দুঃখের সময় আমাকে ও অনেক সাহায্য করেছিল। তখন থেকেই জানাশোনা। দেখা করতে এলে ত তাড়িয়ে দিতে পারি না।

নরেশ বল্লে—আমি ছাতের উপরের ঘরটায় একবার যাচ্ছি। আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমাকে বিরক্ত করো না।

নীরজা আর কিছু বলতে সাহস পেলে না। নরেশ উপরের ঘরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে গুড়ুম করে একটী শব্দ হ'ল। নীরজা ছুটে ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজানই ছিল। ঘর ধোঁয়ায় ভরা, মেঝের উপর নরেশের অসাড় নিস্পন্দ দেহ পড়ে আছে।

খুঁজে টীপয়ের উপর নরেশের একখানি চিঠি পাওয়া গেল। নীরুকে লেখা—চিঠিখানা এইরূপ :—

নীরু, তোমাকে আমি কি না দিয়েছিলাম? আমার শরীর, মন, স্বাস্থ্য, বংশ-গৌরব, সুনাম—আমার মধ্যে যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ,

কিছুই ত তোমার পায়ে ঢেলে দিতে কুণ্ঠিত হইনি? আমার একমাত্র কাম্য ছিল, তোমাকে আমার উপযুক্ত সংগিনী করে গড়ে তোলা। তোমাকে বিয়ে করে আমি মায়ের মনে কষ্ট দিয়েছি; হিতাকাংখী বন্ধুদের সাবধানতার বাণী শুনিনি! কিন্তু সে সমস্ত ত্যাগের বদলে তুমি আমাকে এ কি দিলে? এ যে গরল—এর জ্বালায় যে আমি একেবারে জ্বলে পুড়ে মরলুম। আমি এখন বুঝতে পারছি, তোমাকে দোষ দেওয়া বৃথা। তোমার রক্তে যে বিষের বীজ মিশে আছে তার উপরে উঠার সাধ্য তোমার নেই। আমি ভুল করেছি—তোমার যা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। তুমি মরলে এর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি—তোমার জীবন সুখের হোক, যদি ঐ পথে সুখ থাকে। যাওয়ার আগে আমার দুঃখিনী মাকে প্রণাম জানাই। নরেশ।

এর কিছুদিন পরে পাগলী নীরজাকে পায়ে বেড়ী দিয়ে পাগলা-গারদে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শোয়ার ঘর থেকে কিছুতেই সে বেরুতে চায় না, টেনে হেঁচড়ে তবে বার করতে হ'ল—যাওয়ার সময় সে চেঁচাতে লাগল, আমার কাছে কেউ পুরুষ মানুষ এস না—আমি সকলকে কামড়াব।

নিশীথযাত্রা

প্রভাসচন্দ্র দাশ

প্রভাসচন্দ্র দাশঃ জন্ম—তেরশ' একুশ সালে কলিকাতায়। পৈতৃক বাসস্থান—কলিকাতায়। ছাত্রজীবন—বর্ধমান ও কলিকাতা। বর্তমানে কোন প্রসিদ্ধ কোম্পানীর ব্রাঞ্চ সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত আছেন।

ছোট একটুখানি চিঠি। কেবলমাত্র খোকার ভাত, তার আর তার স্বামীর নিমন্ত্রণ, তাদের যেতে হ'বে। তবু এচিঠিতে কত আনন্দ-মাখা, হেঁঃ খোকন—তার দিদির খোকা, তার ভাত। সে যাবে তার স্বামীর সঙ্গে তার দিদির বাড়ী। কত লোকজন আসবে, কত আমোদ-আহ্লাদ হ'বে, কদিন বেশ হৈ হৈ করে কাটবে। সংসারের একটানা এক সুরের জীবন থেকে তবু একটু রেহাই পাওয়া যাবে! মিনতি ভাবে, খোকন এখন কেমনটী রয়েছে! তারও ত এম্নি একদিন একটি খোকা হ'বে। সে তার দিদিকে নিমন্ত্রণ করবে খোকার ভাতের সময়। দিদি আসবে আর জামাইবাবুর সংগে, যেমন সে যাবে তার স্বামীর সংগে।

সন্ধ্যার সময় পরিতোষ আফিস থেকে ফিরতেই, মিনতি একগাল হেসে তাকে বললে, আজ জামাইবাবুর চিঠি এসেছে, জান? খোকার ভাত। আমাদের নেমন্তন্নে যেতে হবে।—মিনতি পরিতোষের বাহু দুটী ধরে আনন্দে লুটিয়ে পড়ে তার বুকে। পরিতোষ মিনতিকে রাগাবার জন্যে বলে, হ্যাঁ, ছুটি অম্নি পড়ে রয়েছে কিনা! বৌ'র সাথে বেড়াতে যাব বল্লেই সাহেব অম্নি খুসী হয়ে ছুটি দিয়ে দেবে, না?

লজ্জায় আর রাগে মিনতি কেমন মুষ্‌ড়ে পড়ে—আহা, তাই বুঝি

আবার সাহেবকে বলে? এম্নি বলবে একটু দরকার আছে বাইরে যেতে হ'বে।

পরিতোষ 'তাই হবে' বলে খেতে চলে যায়। মিনতি সমস্ত খাবার একটির পর একটি করে যত্নে তুলে দেয় পরিতোষের পাতে। সারাদিনের খাটুনির পর পরিতোষ তাই খায় পরম পরিতৃপ্তির সংগে।

যাবার আয়োজন সব ঠিক। মিনতি কখন থেকে সাজগোজ করে বসে আছে পরিতোষের আফিস থেকে ফেরবার পথ চেয়ে। সে অফিস থেকে ফিরলেই তারা বেরিয়ে পড়বে। পাঁচটায় ট্রেণ, সাড়ে চারটে বেজে গেল তবু পরিতোষের দেখা নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিনতি চোখ ঝাপসা দেখলে, তার শরীর অবশ হ'য়ে গেছে, সে নিরাশ হ'য়ে ব'সে পড়েছে। পাঁচটা বেজে গেল, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। মিনতি রেগে তার সমস্ত আভরণ খুলতে আরম্ভ করেছে এমন সময় কার পায়ের শব্দ! মিনতি উৎসুক হ'য়ে চেয়ে দেখল—হ্যাঁ, সত্যি পরিতোষই ত' বটে!

মিনতি রেগে আগুন। বলে, আচ্ছা মানুষ বাপু। এরকম করে একজনকে আশা দিয়ে নিরাশ করলে কত পাপ হয় জান? পরিতোষ অপরাধীর মত রাগের ভাণ করে বলে, তাত জানি কিন্তু উপায় কি! সাহেবকে বল্লুম, বউয়ের সাথে বেড়াতে যাব দুদিন ছুটি চাই। ফলে এত সব জরুরী কাজ আজ ঘাড়ে এসে পড়ল যে, সে-সমস্ত না সেরে আসতে পারলুম না।

মিনতির মন নরম হল—যাও, কি যে বল। সাহেবকে কেন ওকথা বলতে গেলে! আচ্ছা বেশ, বলেছ না হয় বেশ করেচ। এখন, আজ যাওয়া হবে, না সব খুলে ফেলে রোজগার অভিনয় সুরু করব তাই বল দিকিন?

পরিতোষ সোৎসাহে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই যাওয়া হবে। সাড়ে ছ'টায় গাড়ী, এখুনি বেরুব।

অজানা এক স্ফূর্ত্তিতে মিনতির বুকটা কেমন যেন করতে থাকে। সে যা খুলেছিল তা সব আবার একটি একটি করে প'রে বেরিয়ে পড়ে।

আকাশে বড় দুর্যোগ। গুড়্ গুড়্ করে মেঘ ডাকছে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি সুরু হল। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে, ঐ বুঝি একটা বাজ পড়ল, তার এক ঝলক আলো দরজার ফাঁক দিয়ে এসে তাদের মুখ সাদা করে দিলে। মিনতি পরিতোষকে ভয়ে জড়িয়ে ধরল, বাজ বুঝি পড়ল তারই মাথায়! পরিতোষ সুবিধা পেলে মিনতিকে দু'কথা কখনও বলতে ছাড়ে না, তাই সে বলে, আচ্ছা ভিতু মেয়ে বাবা!

মিনতি কথার উত্তর দেয় না, যেন সে শোনেইনি। সে পরিতোষের বুকে মাথা রেখেই বলে, দেখ, দেখ, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়িয়েছে! আমাদের গাড়ীর চাকা ঠায় ডুবল বলে। হ্যাঁগো, গাড়ী যেতে পারবে ত? গোলদীঘির মাছগুলো সব উঠে রাস্তাময় ছুটোছুটি করে বেড়াবে, ভারি মজা হবে, না?

ট্রেণ ছুটে চলেছে। পরিতোষ গাড়ীর কাঁচগুলো সব তুলে দিয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা জল তাই দিয়ে চুইয়ে পড়চে। বাইরে অজস্র ধারায় অবিরাম ঝর ঝর করে বৃষ্টি ঝরে চলেছে, মনে ভ্রম হয় যেন কাছেই কোন জল-প্রপাত আছে তারই জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। বাইরে তাকালে যেন মনে হয় পৃথিবী কুয়াশায় ঢাকা পড়েচে, তাল, নারিকেল আর আম গাছের অস্পষ্ট কায়া দেখা যায় তারই ভেতর দিয়ে। মাঠগুলো কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে। ধানের ডগাগুলো যেন একটু একটু বেরিয়ে আছে। কোথাও দুটো-একটা সাদা সাদা বক এক ঠ্যাঙ্ তুলে ঘাড়ে মাথা গুঁজে বসে জলে ঝিমুচ্চে, কোথাও বা আবার শামুক

খুঁজছে। যেই একটি দেখতে পাচ্ছে অমনি খপ্ করে ধরে উদরসাৎ করচে। কোথাও বা পাড়ার মেয়েরা টোকা মাথায় দিয়ে আড়ায় মাছ দেখতে এসে জলে বসে বসে ভিজছে আর গল্প করছে—কার স্বামী কখন বাড়ী ফিরবে, ফিরে জলে ভেজার জন্যে কাকে কত বকবে ইত্যাদি। পরিতোষ আর মিনতি এই সব দেখতে দেখতে চলেচে। কারও মুখে একটিও কথা নেই। প্রকৃতির লীলাখেলাতেই তারা মগ্ন। গাড়ী যখন দক্ষিণ স্টেশনে পৌছল তখন রাত ন'টা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে! চারিধারে আঁধারের রাজত্ব। ছোট্ট স্টেশন। টিম্ টিম্ করে একটা আলো জ্বলছে, জন-মানবের সাড়া নেই। মিনতি ট্রেণ থেকে নেমে পরিতোষের হাত ধরে দাঁড়াল। গাড়ী আসবার কথা ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল—গাড়ী নেই।

এই দুর্যোগে পরিতোষের আর জ্ঞান থাকে না। সে রেগে বলে, আচ্ছা লোক বটে, একটা গাড়ীও কি পাঠাতে নেই! সাধে কি আর দক্ষিণে লোক বলে। ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে, এই রকম বিপদে ফেলা। তাও সহর হ'লে হ'ত—এই গেঁয়ো জায়গায়!

মিনতির মনে আঘাত লাগে কারণ তার দিদির নিন্দা তার স্বামীর নিন্দা! সে বলে, তা তিনি কি আর হাত গুণবেন। তুমি কেন ট্রেণ ফেল করলে—হয়ত গাড়ী এসে ফিরে গেছে।

পরিতোষ বলে, ফিরে গেছে বেশ হয়েচে, এখন বাড়ী ফিরে চল। যে পথে এসেছি সেই পথেই ট্রেণ ধরা যাক।

মিনতি এতদূর এসে ফিরে যেতে রাজী নয়।

তখন স্টেশন মাস্টার তাঁর লণ্ঠন হাতে করে বাড়ী ফিরছিলেন। পরিতোষ জিজ্ঞাসা করে, হাঁ মশায়, ফেরবার ট্রেণ কটায় বলতে পারেন?

—হ্যাঁ, সেত' আসবে ৩-৩০ মিনিটে। তা আপনারা নোতুন আসচেন বুঝি? সংগে আবার মেয়েছেলে, গাড়ী আসেনি? ওরে রাম সিং বাতিটা নিভিয়ে দে, কি দুর্যোগই না পড়েছে মশাই।

স্টেশন মাস্টার প্রস্থান করেন। মিনতি আর পরিতোষ অগ্রসর হয় মাঠের দিকে। স্টেশনের পাশেই মাঠে কানায় কানায় জল টল্ টল্ করচে। একটু আগেই বোধ হয় ধানের চারা বসান হয়েচে, তাদের ঘাড়গুলো লুটিয়ে গেছে। একটু পরেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। জল কাদায় মিশে রাস্তা পেচ্ পেচ্ করচে। পরিতোষ মিনতিকে জুতো খুলতে বলে। নিজের আর তার জুতো হাতে করে সে চলেছে আগে। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। পথটি চলেছে একে বেঁকে। দু' ধারে তাল, নারিকেল আর হোগলার বন। পাতা থেকে তখনও টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে, ঘন অন্ধকার দু' হাত দূরের লোক দেখা যায় না। এইবার শিয়াকুল আর অ্যাশ শ্যাওড়ার ঝোঁপ, পথের পাশে, মাঠে গেঙ্ গেঙ্ করে ব্যাঙ ডাকছে, ঝি ঝিঁ পোকাগুলো একদমে চেঁচিয়ে চলেছে। দূরে মাঠে জোনাকীর সারি উড়ছে।

—ওগো, ঐ বুঝি আলেয়া—মিনতি পরিতোষের আরও গা ঘেঁসে চলতে থাকে।

—না, না ও কিছু নয়, জোনাকী দেখতে পাচ্ছনা?—

—জান না, সত্যি বলছি এই রকম বাদল রাতে ঐ রকম মাঠে আলেয়া জ্বলে।

—পথে নারী বিবর্জিতা। আচ্ছা মুস্কিলে ফেল্লেরে বাবা। আলেয়া ত তোমার কি, নাও চল। তারা দু'জনে আবার চলতে থাকে। হঠাৎ দূরে বনের মধ্যে একটা আলো দেখে পরিতোষকে মিনতি একবারে জাপটে ধরে—ঐ দেখগো কে আসচে। মিনতি আস্তে আস্তে বলে।

আচ্ছা ভীতু মেয়েরে বাবা! তোমায় নিয়ে রাস্তায় বেরুলেই হয়েচে আর কি! ও লোকটা হয়ত মাঠে মাছ দেখতে যাচ্চে না হয় কিছু করতে যাচ্চে আর তুমি ভয়ে মরে গেলে?

মিনতি বলে, ওগো দাঁড়াও একটু পায়ের ধূলো নিই—সত্য সত্যই মিনতি নুয়ে পড়ে।

পরিতোষ তাকে দু'হাত দিয়ে তুলে ধ'রে বলে, কেন, পায়ে পা ঠেকে গেল বলে নাকি? বাসায় গিয়ে যত পার নিও।

মিনতির কিন্তু কথাটা মনঃপুত হয়না, সে বেঁকে ব'সে বলে, যাও তবে আর আমি যাব না।

পরিতোষ তাকে একা মাঠের মাঝে ফেলে রেখে চলে যাবার ভয় দেখায়। অগত্যা আবার মিনতিকে পরিতোষের সংগে চল্‌তে হয়। এইবার কাল কাল মেঘের ফাঁকে একটু একটু চাঁদ দেখা যাচ্ছে। মিনতি আর চলতে পারে না। সামনে একটা সাঁকোর উপর তারা বসে পড়ে। মিনতি বলে, আচ্ছা কষ্টটাই তুমি পেলে, না?

—তা পাব না যেমন দক্ষিণে লোকের কাণ্ড।

—যাও, আর তুমি দক্ষিণে দক্ষিণে কোর না, নিজে ভারি পশ্চিমে? নিজের দোষটি দেখলে না, দিলে তার দোষ, তার কি অপরাধ বলত? তুমিই না ট্রেণ ফেল ক'রে যত অনর্থ ঘটালে।

—বেশ বেশ, আর ঝগড়া করতে হ'বে না। এইবার কেমন মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠছে দেখ মিনু। আমি সব কষ্ট ভুলে গেছি। আজ এই নির্জন মাঠের ধারে দু'জনে বসে থাকতে বড় ভাল লাগছে আমার। আচ্ছা মিনু, তোমাকে এত কষ্ট করে যে তোমার দিদির বাড়ী নিয়ে যাচ্চি, এমন কি তোমার জুতো পর্যন্ত বইছি তার ত একটা পারিশ্রমিক আছে?

মিনতি কৃত্রিম রাগের ভান ক'রে বলে, কে তোমায় আমার জুতো নিতে বলেছিল, সত্যিই তো আমার জুতো তোমার নেওয়া ভাল দেখায় না, কত পাপ হবে জান? দাও আমার জুতো। মিনতি হাত বাড়ায়। পরিতোষ হাত সরিয়ে নিয়ে হেসে বলে, আরে তা না হয় হলো। তুমি একটু পাপ কর আমি না হয় একটু পুণ্য করি! এখন আমার শেষের কথাটার উত্তর দাও দিকিন?

—কি চাই বল?

—কি চাই? আচ্ছা সরে এস, এস, এই এখানে।

দুজনে আবার চল্‌তে থাকে। হঠাৎ কিসের গন্ধে তাদের মন মেতে ওঠে। দূরে চেয়ে দেখে সামনেই একটা কেয়া বন। পরিতোষ মিনতিকে বলে, জান মিনু, এতে যত সব সাপ থাকে। সাপের আড্ডা মিনতি যেন একটু আঁতকে উঠে। বলে, অ্যাঁ! কি, কি বল্লে?

পরিতোষ ব্যাপার বুঝতে পেরে বলে, না, না, লতা লতা যত সব লতা থাকে।

লতা নয় গো, লতা নয়। রাত্রে মা মন্‌সা—মিনতি কপালে দু'হাত ঠেকায়।

এইবার বাঁদিকে বেঁকতে হ'বে। তার পর পুকুর, পুকুরের পর হাট, তার পর বারোয়ারীতলা, পাঠশালা, জোড়া শিবমন্দির। তারপরেই তাদের বাড়ী।

পরিতোষ মিনতিকে বলে, দেখ একটু মজা করি।

পরিতোষ বাড়ীর কড়া নাড়তে থাকে। ভিতর থেকে কে রুক্ষ গলায় বলে উঠে, কে, এত রাত্রে?

—একবার নীচে নেমে আস্‌বেন?

—কে তুমি?—

—মানুষই বটে, একবার নেমে আসুন না।

লোকটি তবুও নামতে নারাজ. ওরে শিবু, এই শিবু দরজাটা খুলে দেখত এত রাত্রে কে আবার ডাকাডাকি করে ?

—ও, এ যে দিদিমণি আর জামাই বাবুগো। তা এত রাত্রে আসা হ'ল। গাড়ী ফিরে আসতে আমরা ভাবলুম বুঝি আজ আর আপনারা এলেন না, বড় কষ্ট হ'ল নয় ? যে জল কাদা রাস্তায় তায় কলকাতার লোক, আসুন আসুন, ভিতরে চলুন।

মিনতি পরিতোষকে একটু ধাক্কা মেরে চোখ টিপে ইসারায় বলে জুতোটা যে হাতে করে রয়েচ, ওরা দেখে ফেলবে আমারটা আমায় দাও।

পরিতোষ শশব্যস্ত হয়ে তার জুতো তার হাতে তুলে দিল। মিনতি দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলে, দুষ্টু, তখন তুমি ভারি একলা পেয়ে মাঠের মাঝখানে ভুলিয়ে ভয় দেখিয়ে পুরস্কার আদায় করেছিলে এবার আমি আমার পুরস্কার চাই। যাও খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি।

পরিতোষ মিনতির পিঠে হাতের একটা ঠেলা মেরে কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, এখন নয় অন্য সময় কেমন, কি বল, অ্যাঁ ? রাগ কোর না লক্ষ্মীটি !

তখন আকাশে কাল মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ উঠেছে, সারা আকাশে তারা জল্ জল্ করছে। জোৎস্নায় পৃথিবী সাদা হ'য়ে গেছে।

এইবারে মিনতির দিদি আর তার সাধের জামাইবাবু তাদের কর্দমাক্ত কলেবরে সাদরে অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে গেলেন।

রবাহূত*

ধরণী ভট্টাচার্য

ধরণী ভট্টাচার্য : জন্ম—তেরশ' তেইশ সালে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত বহিরগাছি গ্রামে। পৈত্রিক বাসভূমি—নদীয়া, বহিরগাছি গ্রামে। ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন—বহিরগাছি, মুড়াগাছা ও হাওড়ায়।

সকালবেলায় দাওয়ার উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া মন্নু মুড়ি চিবাইতেছে ও আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে। পিণ্টুর অসুখ—মা বলে, 'ম্যালোয়ারী' জ্বর, মুড়ি খাইতে নাই। তাই এক দৃষ্টে একবার ক্রমশূন্যায়মান বাটীটার দিকে এবং একবার দাদার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল আর মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলিতেছিল।

মন্নু বকিয়া চলিয়াছে—"জানিস পিণ্টু, আমি যখন খুব বড় হব, তখন ঐ ওদের বাড়ীর ভুবন কাকার মতো চাকরি করতে যাব,—মা বলেছে, তখন রোজ রোজ মা আমাদের ভাত রেঁধে দেবে···আর কতো ভাল ভাল···"বলিয়া হঠাৎ কি মনে পড়িয়া যায়, বলে—"জানিস্ আজকে ভাত রান্না হবে না আমাদের, চাল নেই কি না,—রোজ রোজ আমাদের চাল থাকতে নেই, তাকাচ্ছিস যে?......আমার মুড়িতে চোখ দিচ্ছিস?······আমার অসুখ করবে না বুঝি......" বলিয়া মুড়ির বাটীটা পিছন-দিকে সরাইয়া লয়।

পিণ্টু অপ্রস্তুত হইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে— "ঐ দেখ দাদা—নেড়া আর ভোঁদা---" বলিয়া রাস্তার দিকে আঙুল দেখায়।

মন্নু গলাটা উঁচু করিয়া ডাকে—"ঐ ভোঁদা, কোথায় যাচ্ছিস রে?"

নেড়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া মন্নুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিছনে ভোঁদাও আসিল।

মুড়ির বাটীটার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই ভোঁদা বলিয়া উঠিল—"দেখ ভাই—দুপুর বেলায় মুড়ি খাচ্ছে মন্নু, এখন তো ভাত খায়! আমরা তো এখনি গিয়ে ভাত খাব, নারে নেড়া?"

মন্নু প্রতিবাদ করিয়া উঠে—"হ্যাঁ, তাই বইকি, কাল তো আমরা ভাত খেয়েছি......রোজ রোজ বুঝি ভাত খায়? জানিস······মা বলেছে হুঁ......" বলিয়া ঘাড়টা নাড়িতে থাকে।

ভুবন কাকার ছেলে নেড়া ভোঁদার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে---"জানিস ভাই······ওরা না, খেতে পায় না, মা বলেছে ওদের সংগে না, মিশিস না······জানিস ভাই ওর মা না, খিড়কির পুকুর থেকে না, মাছ চুরি করে······"

শেষের কথাগুলো মন্নু শুনিতে পায় নাই। বলে---"হুঁ···কচু জানিস্, পায় না বইকি, ইল্লি---" বলিয়া অদ্ভুত ভংগিতে জিভটা বাহির করে।

--"ভেংচি কেটোনি বলছি......খেতে পায় না আবার ইয়ে। দেখ ভাই দেখ·····পিন্টুটা ছেঁড়া দোলাই গায়ে দিয়েছে......ওদের জামা নেই......হি হি হি হি···"

—"বেশ তো, বেশ—নেই তো নেই, তোমাদের তো আছে—"

—"আছেই তো,—দেখেছিস কেমন কোট, তোদের আছে? পূজোর সময় আমার মতো পোষাক পেয়েছিস তুই? জানিস ভাই—" বলিয়া ভোঁদার দিকে চাহিয়া বলে—"পূজোর সময় না, আমার পোষাকটা পরে না, চাম্নি বাড়ীতে না, পুজো দেখতে গিয়েছিলাম—মন্নু না, আমার পোষাকটা না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। হ্যাংলা কোথাকার—"

দিন কয়েক আগে বিজয়া দশমী গিয়াছে—তখনও বিসর্জনের করুণ সুরটুকু মন্নুর কানে লাগিয়া রহিয়াছে।

ধরণী ভট্টাচার্য

পূজার সময় মনুরা এবার নূতন পোষাক পরিতে পায় নাই। আগের বছর ভুবন কাকাই মনু ও পিণ্টুকে একটি করিয়া জামা দিয়াছিলেন। সরমা জামা দুটি তুলিয়া রাখিয়াছিল। বিজয়ার দিন সেই জামা দুটি বাহির করিয়া পরাইয়া ছেলেদের ঠাকুর দেখিতে পাঠাইয়াছিল।

ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া মনু চণ্ডীমণ্ডপের একধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিতে ছিল।

পিছন হইতে নূতন জামা কাপড় পরিয়া নেড়া আসিয়া বলিল—"কি রে মনু, বাজি পোড়াবি না? এই দেখ আমার কেমন—" বলিয়া ফস্ করিয়া লাল নীল দেশলাইটা জ্বালিয়া হাতে করিয়া ঘুরাইতে লাগিল।

অমনি পিণ্টু বলিয়া উঠিল—"আমি একটা জ্বালবো দাদা—"

মনুর আজ কাল একটু বুদ্ধি হইয়াছে, আগের মতো আর তত আব্দার করে না। আজন্ম দারিদ্রের সংগে পালিত হইয়া মনের সহজাত সুকুমার বৃত্তিটা তাহার অকালেই বুড়া হইয়া গিয়াছে। মায়ের কাছে কিছু চাহিলে, মা ছল ছল চোখে এমন ভাবে তাহার দিকে তাকায় যে সে মায়ের কাছেও আর কোন কিছুর জন্য বায়না করে না। সে এখন বুঝিতে শিখিয়াছে কোনটা তাহার পাইতে আছে এবং কোনটা তাহার পাইতে নাই।

পিণ্টুকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল—"না ও জ্বালতে নেই হাত পুড়ে যাবে। আয় আমরা আরতি দেখি।

পিণ্টু—"না আমি জ্বালবো—" বলিয়া পিছন হইতে মনুর পাঞ্জাবীর একটা কোণ ধরিয়া টান দিতেই ফস্ করিয়া পাঞ্জাবীর খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল।

দূর হইতে নেড়া দেখিতে পাইয়া বলিল—"তুই বুঝি ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে এসেছিস ?—নোতুন জামা নেই বুঝি তোর ? এই দেখ আমার কেমন নোতুন……"

সে দিন মনু সদ্য ছিন্ন জামাটার পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। জামাটা ছিঁড়িয়া গেল—কি পরিয়া সে বিজয়ার দিন ভাসান দেখিতে যাইবে ? তাহার তো আর একটাও জামা নেই।

আজ কি জানি সেদিনের সেই কথাগুলো মনে পড়িয়াই, কিংবা নেড়ার কথায় নিজেদের দারিদ্রের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, সেদিনের মতই মনু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কার্তিকের শেষাশেষি মনু একদিন জ্বরে পড়িল। সামান্য জ্বর, হয়তো ম্যালেরিয়াই হইবে—তবু সরমা যেন একটু শংকিত হইয়া উঠিল। গ্রামে এবার ভীষণ মড়ক লাগিয়াছে। এই তো সেদিন পদির অমন দস্যির মতো ছেলেটা মাত্র তিন দিনের জ্বরে ধরফড় করিয়া মরিয়া গেল। এখনও মাঝ রাত্রে কোন কোন দিন সরমা পদির ইনাইয়া বিনাইয়া কান্নার করুণ স্বরে চমকাইয়া উঠিয়া বসে—"ওরে-ও নেপুরে-এ-বাবা আমার……" সরমা তাড়াতাড়ি পীড়িত পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলের অমংগল আশংকায় 'ষাট ষাট' করিয়া উঠে। মনুর নাকের কাছে বারবার হাতটা লইয়া গিয়া নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা পরীক্ষা করে।

কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকে—"মনু বাবা !" মনু কি জানি ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে—সরমা তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া লয়।

মনুর অসুখটা শেষের দিকে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সরমা কি যে করিবে—একা মেয়ে মানুষ, তায় কপর্দকহীন, চারিদিক অন্ধকার

দেখিল। গ্রামের কাহারও কাছে হাত পাতিতে ইচ্ছা করে না,—আর করিলেই বা দিবে কে? মেঝের উপর বসিয়া সরমা আকাশ পাতাল ভাবিয়া চলিয়াছে। পিণ্টু বোধ হয় রায়েদের উঠানে খেলা করিতেছে—এখনি হয়ত আসিয়া খাইতে চাহিবে।

আজ সকাল হইতে মনু ভুল বকিতেছে।

"এই দেখ মা—আমার জামাটা ছিঁড়ে গেল......পিণ্টুকে মেরো না—ও ছেলে মানুষ কিনা তাই······বেশ তো বেশ...আমরা খেতে পাই না তা ওদের কি?···" সরমা নিষ্পলক নেত্রে মনুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

পুরা একটি মাস ভুগিয়া, এক রকম বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে মনু সারিয়া উঠিল। না খাইতে পাইয়া লোভ তাহার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এই সে দিন—হেঁসেল হইতে চুরি করিয়া থোড়-চচ্চড়ি খাইয়াছে। দুর্বল শরীর, নিজের শক্তিতে কুলায় নাই—পিণ্টুই অবশ্য রান্নাঘরের শিকলটা খুলিয়া দিয়াছিল। এর মধ্যেই পিণ্টুটা ভীষণ ডানপিটে হইয়া উঠিয়াছে। দুয়ারের দুপাশের দেওয়ালে পা লাগাইয়া টকাটক উঠিয়া গিয়া শিকলটা খুলিয়া দিয়া একলাফে নামিয়া পড়িল। মনু অমন পারে না—সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখে—পিণ্টুটা যেন ঠিক কাঠবেড়ালী!

কড়ার উপর ও-বেলার রান্না খানিকটা থোড়-চচ্চড়ি আর গোটা দুই কলাইয়ের দালের বড়া। থোড় চচ্চড়ির উপর পিণ্টুর লোভ নেই, তাড়াতাড়ি বড়া দুইটা তুলিয়া লয়। মনু রাগিয়া পিণ্টুর মাথায় একটা গাঁট্টা মারিয়া বড়া দুইটা কাড়িয়া লয়। পিণ্টু নিঃশব্দে প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। বিপদ বুঝিয়া মনু অতি কষ্টে হাতের অবশিষ্ট বড়াটির

এক চতুর্থাংশ ভাংগিয়া পিণ্টুর সংপ্রসারিত মুখ বিবরে গুঁজিয়া দেয়।

পিণ্টুর কান্না অমনি থামিয়া যায়।

পিণ্ট অবশ্য ইচ্ছা করিয়া কথাটা মাকে বলিয়া দেয় নাই। সরমা যখন বলিল—"পিণ্টু বড়া চুরি করে খেয়েছিস?" পিণ্ট কিন্তু চুরি করা ও খাওয়া এই দুইটাই অপকর্মের কথা স্বীকার করিতে রাজি হইল না। সরমা উগ্র মূর্তি ধরিয়া হাতের খুন্তিটা উঁঠাইয়া বলিল—"বল খেয়েছিস কিনা"—পিণ্টু ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া খোনা করিয়া বলিল—"আঁমি তোঁ এঁই এঁত্তো টুঁকুন খেঁয়েছি দাঁদাঁই তোঁ—" কাজেই পিণ্টুর চুরিটা সাব্যস্ত হইল না, উপরন্তু মনুর কংকাল সার দেহের উপর সরমা খুন্তি দিয়া এলোপাথারি ভাবে ঘা কতক কসাইয়া দিল।

মনুর মার দেখিয়া পিণ্টু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাকে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া খারাপ হইয়াছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনু এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। ছেলেকে মারিয়া সরমার মনটা ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল। (ছেলে দুটোকে দুবেলা দুমুঠো পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে না—দোষ তো তাহারই। অভিশপ্ত জীবনের উপর তাহার ধিক্কার আসে। জোড় হাতে উপর দিকে চাহিয়া কাহার উদ্দেশে প্রণতি জানায়। গালের পাশ বাহিয়া হয়ত সেই সর্বনিয়ন্তার পাষাণ পদতল অভিষিক্ত করিতেই বুঝি ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।)

রাণুর বিয়ে। পাড়ার সকলকারই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। শুধু সরমাদেরই নিমন্ত্রণ হয় নাই। হয়ত ভুল হইয়া গিয়াছে। সরমারা রাণুদের জ্ঞাতি, হয়ত ইহাও ভাবিতে পারে বাড়ীর লোককে আবার নিমন্ত্রণ করিব কি? সরমা মনের মধ্যে নানারূপ জল্পনা করে।

ধরণী ভট্টাচার্য

রাণুদের বাড়ীটা একেবারে আলোয় আলো হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে মনু ও পিণ্টু নিমন্ত্রণের গন্ধে নাচিয়া উঠিয়াছে। কতদিন ধরিয়া তাহারা আশা করিয়া আছে।

কোন এক ফাঁকে মায়ের চোখে ধূলি দিয়া দু'ভায়ে বিবাহ মণ্ডপের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ওদিকে পাশাপাশি দুইটা ঘর। একটায় ভাঁড়ার হইয়াছে, অপরটায় ভিয়ান হইতেছিল। ঘুড়িতে ঘুড়িতে মনু ও পিণ্টু ভিয়ান ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। উঃ—উই অত পান্তুয়া! আর সন্দেশ এত কি হইবে! বারকোশে ওগুলো আবার কি? আবার একটা করিয়া লবংগ দেওয়া!

মিষ্টান্নের প্রাচুর্যে মনু ও পিণ্টুর চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। একটা মধুর অনুভূতি লইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসে।

কে কটা সন্দেশ খাইতে পারে, পিণ্টু সব চাইতে কোন জিনিষটা বেশী খাইতে ভালবাসে তাহারই একটা মৌখিক খসড়া করিয়া রাখে।

বরযাত্রীরা আসিলেই হয়—গ্লাস ও পাতা পড়িয়া গিয়াছে। মনুদের ছাদে উঠিলে সব স্পষ্ট দেখা যায়। এদের হইলেই মেয়েছেলেদের ডাক পড়িবে। সরমা ময়লা কাপড়খানা বাদলাইয়া লইল।

বিধবাদের আলাদা জায়গা করা হইয়াছে। মনু ও পিণ্টুকে লইয়া সরমা একধারে বসিয়া পড়িল। পাতা ও গ্লাস পড়িয়া গিয়াছে এইবার··· মনু ও পিণ্টু পরস্পর চোখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। এদিকের ম্যানেজমেণ্ট নাকি পদি ঠাকুরঝিই করিতেছেন, সংপর্কে রাণুর কি রকম পিসি হন।

—"এই যে দিদি এসেছ বেশ বেশ···আর ভাই বাতের ব্যথায় আর মাজা সোজা করতে পারি না...এই যে অনু এসেছিস তোর সংগে এটি কে নাতনি বুঝি?"

সহসা সরমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, অদ্ভুত মুখভংগি করিয়া পাশের সংগিনীটিকে কি যেন বলিলেন তিনি "ও হ্যাঁ, তাইতো বলনা"—"বলিয়া চোখ টিপিলেন। পদি ঠাকুরঝি আগাইয়া আসিয়া সরমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমার তো বাপু এখানে জায়গা হয়নি, এখানে সব এই এঁরা বসেছেন—তুমি বাপু এখন ঐখানে গিয়ে বস—" বলিয়া যেখানে বসিয়া ঝিয়েরা জটলা পাকাইতেছিল সেই খানটা দেখাইয়া দিলেন। সরমাকে আর কিছু বলিতে হইল না। মুখের শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত তাহার কে যেন নিষ্ঠুর হাতে নিংড়াইয়া লইয়াছে।

ছেলে দুটোর হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে খিড়কির দোর দিয়া সরমা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পদি ঠাকুরঝি মুখভংগি করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠেকার দেখেছ? নেমন্তন্ন করা হয়নি তবুও মাগী ছোঁড়া দুটোর হাত ধরে নিয়ে এসে বসেছে—আস্পদ্দা দেখ!"

ওদিকে রাস্তায় পড়িয়া মনু ও পিণ্টু ক্রমাগত সরমার আঁচল ধরিয়া টানিতেছে। পাছে এই লজ্জাকর ব্যাপারটা কাহারও নজরে পড়িয়া যায় এই ভয়ে সরমা একরকম টানিতে টানিতে মনু ও পিণ্টকে লইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিতে লাগল। তখন সে অপমানে ও উত্তেজনায় রীতিমত হাঁফাইতেছে। বাড়ীতে ঢুকিবার মুখে খিড়কির দোরে রাজু গয়লানীর সংগে দেখা। পিছন হইতে রাজু বলিয়া উঠিল,—"কোয়ানে গিয়েলে গো বউ ঠাউরেণ—"

সরমা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া একরকম রাজুর মুখের সামনেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

বিচিত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়: জন্ম—উনিশ শ' উনিশ সালে বালুরহাটে। পৈতৃক বাসস্থান—কলিকাতা। ছাত্র-জীবন—কলিকাতা। এঁর প্রথম রচিত ছোট গল্প-বই 'সূর্যোদয়'। বর্তমানে 'স্কটিশ চার্চ' কলেজের ছাত্র।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কত ব্রত, কত পূজা, কত মাদুলী ধারণ—সব আয়োজন ব্যর্থ হইল। সান্ত্বনার কপালে বুঝি ছেলের মুখ দেখা নাই।

বংশের একমাত্র ছেলে সুপ্রিয়, তাহারই স্ত্রী সান্ত্বনা। আত্মীয়-স্বজন খুব ঘটা করিয়া একটু অল্প বয়সেই সুপ্রিয়র বিবাহ দিয়াছিল—বংশ পাছে লোপ হইয়া যায় এই ভয়ে। কিন্তু বিবাহ দেওয়াই সার, বংশ রক্ষা পাইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। শুধু বংশ রক্ষার জন্য নয়, একটি পরিপূর্ণ সংসারের প্রয়োজন সুপ্রিয়র ছিল। ছেলেবেলা হইতেই সে স্বপ্ন দেখিত পিতা হইবার। 'বাবা বাবা' বলিয়া ছেলেরা তাহার কাছে আব্দার করিতেছে—এমনি অনেক মধুর কল্পনা মাঝে মাঝে তাহার মনে উঁকি মারিত।

ওদিকে সান্ত্বনার মনেও দিনরাত্রি আগুন জ্বলিত। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল সকলে তাহার চেহারা দেখিয়া বলিয়াছিল, 'সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!' কিন্তু সে নাম তাহার শীঘ্রই ঘুচিয়া গেল। সান্ত্বনার বুঝিতে দেরী হইল না যে, অপূর্ব সুন্দরী হইয়াও স্বামীকে সে সুখী করিতে পারিতেছে না। প্রথম বিবাহের পর ছেলের কি নাম হইবে এই লইয়া সুপ্রিয় ও সান্ত্বনা কত তর্ক করিয়াছে, কত কল্পনা করিয়াছে।

সুপ্রিয় বলিত, 'প্রথম ছেলের নাম আমি দেব—অতিথি।'

'কি বিশ্রী নাম'! সান্ত্বনা বলিত, 'ওনাম কখনো আমি দিতে দেব না, আমার ছেলের নাম হবে তন্ময়।'

'ওসব কবিদের মত নাম আমি মোটেই পছন্দ করি না বরং তার নাম হবে সংগ্রাম।'

'ও বাবা', সান্ত্বনা হাসিয়া ফেলিত, 'বেশ হাসির নাম দিতে পার তো তুমি!'

'হাসির মানে?' সুপ্রিয় রাগিয়া যাইত, 'বোঝ না কিছু তাই বল।'

'না মশাই বুঝি না কিছু, তবে ছেলের ওনাম শুনলে যে সকলে হাসবে সেটুকু বুঝি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই নাম দিও, তাহলে আমি আর কিছু বল্‌ছি না।'

'অমনি রাগ হল, সব সময় যেন সপ্তমে চড়েই আছেন!'

এমনি কত কথা তাহারা বলিত এতদিন, কত কলহ করিত! কিন্তু আজ সান্ত্বনার চোখে জল নামিয়া আসে দুঃসহ দারুণ দুঃখে মুহূর্তে মুহূর্তে সে গুমরিয়া গুমরিয়া মরে।

শূন্য সংসারের চারধারে সুপ্রিয় চাহিয়া দেখে—কোথায় তাহার অতিথি, ঘরগুলি যেমন ঝি-চাকর সাজাইয়া রাখে ঠিক তেমনি থাকে, নড়চড় করিবার কেহ নাই। সুপ্রিয়র বুকে ফুলিয়া উঠে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

'দেখ', পথের দিকে চাহিয়া সুপ্রিয় সান্ত্বনাকে বলে, 'ওই ভিখিরীদের কত ছেলে দেখেছ, ওরা পথের কাঙাল কিন্তু আমাদের চেয়ে সুখী।'

সান্ত্বনা নীরবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। একটি কথাও বলিতে পারে না। হয়তো টুপ করিয়া একফোঁটা চোখের জল সুপ্রিয়র পায়ের উপর পড়ে।

'সান্ত্বনা', সুপ্রিয় বলিতে থাকে, 'তুমি জান আমি ছেলেমেয়ে কত ভালবাসি, কত সখ আমার ছেলের মুখ দেখার—কিন্তু কই, এসাধ কি আমার পূর্ণ হবে না ?'

সান্ত্বনা আর স্বামীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, নিজেকে মনে হয় অপরাধীর মত। সেখান হইতে আস্তে আস্তে সে সরিয়া যায়।

ছোট ছেলের ছবিতে সুপ্রিয় ঘর সাজাইয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে কোথা হইতে সে লইয়া আসে বন্ধুদের ছেলেদের। তাহাদের আদর করে, যত্ন করে, খাওয়ায়। আবোল তাবোল কত কি বকে তাহাদের সংগে। তারপর আবার লইয়া যায়। সান্ত্বনা কিছুই বলিতে পারে না। মাঝে মাঝে কেবল কাঁদে—সমস্ত অন্তর দিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলে, 'একটি সন্তান আমায় দাও।'

বাড়ীতে থাকে শুধু তাহারা দুইজন—সান্ত্বনা আর সুপ্রিয়। তাই সংসারের শূন্যতা আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করা যায়। আত্মীয়েরা মাঝে মাঝে আসে কিন্তু সান্ত্বনার সহিত ভাল করিয়া কথাও বলে না তাহারা—সেই যেন অপরাধী। সুপ্রিয়র কানে তাহারা অনেক কথাই দেয়। তবে কি, সুপ্রিয় মাঝে মাঝে না ভাবিয়া পারে না, বংশ সত্যই লোপ পাইবে ? সে পাগলের মত হইয়া উঠে। ঘরে থাকিতে ইচ্ছা করে না তাহার। কেন সে চাকরী করিতেছে ? কে ভোগ করিবে তাহার পয়সা ? কেন এ পরিশ্রম ? সুপ্রিয়র মাথা গরম হইয়া উঠে। সংসার ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে তাহার। পাশের বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা 'বাবা বাবা' করিয়া চীৎকার করে আর সুপ্রিয়র বুক চিরিয়া বাহির হয় দীর্ঘনিঃশ্বাস। তাহাকে কি কেহ কোন দিন অমন করিয়া ডাকিবে না ? কোন কোন দিন সান্ত্বনার উপর রাগিয়া তাহাকেই

সে দু'কথা শুনাইয়া দেয়। সান্ত্বনা সমস্তই সহ্য করে কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলে না।

'আচ্ছা', একদিন সান্ত্বনা স্বামীকে বলিল, 'আমার ওপর তোমার রাগ হয় না?'

'কেন বল তো?'

মাথা নীচু করিয়া সান্ত্বনা বলে, 'আমি তোমার যোগ্য নই বলে।'

'কেন একথা বলছ সান্ত্বনা?'

'সে কি তুমি জান না?'

'থাক সান্ত্বনা ওকথা ব'ল না, ঈশ্বর না দিলে কি করবে বল!'

'কিন্তু কেন আমাদের একটি দেন না তিনি?'

'কি করে বলব বল?'

'তোমায় আমি সুখী করতে পারলাম না', সান্ত্বনা খুব আস্তে আস্তে বলে, 'এই আমার দুঃখ।'

সুপ্রিয় কিছু বলে না। কি-ই বা বলিবে সে? এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া যায়। 'সমস্ত পরিবারটির উপর যেন কাহার অভিশাপ পড়িয়াছে। নিরানন্দের একটি ছায়া ক্রমেই বড় হইতে লাগিল।

সেদিন সুপ্রিয়র এক মাসীমা বেড়াইতে আসিলেন। সুপ্রিয় বাড়ী ছিল না।

'আসুন মাসীমা', সান্ত্বনা বলিল।

'তোমারই কাছে এলাম মা, কেমন আছ?' মাসীমা একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

'ভাল আছি মাসীমা।'

'বেশ, সুপ্রিয় কোথায়?'

'একটু বাইরে গেছে, আসবে এখুনি!'

'সে ভাল আছে তো ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখ মা', মাসীমা বলিতে লাগিলেন, 'তোমার সংগে একটা কথা আছে আমার।'

'কি কথা বলুন', সান্ত্বনা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাসীমা বলিলেন, 'স্ত্রীর কাজ স্বামীকে সুখী করা, নয় কি ?'

'তা তো ঠিক', সান্ত্বনার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

'তবে ? তুমি তো পারছ না তোমার স্বামীকে সুখী করতে।'

সান্ত্বনার বুকে কে যেন পাথর বসাইয়া দিল।

'কিন্তু মা, তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার স্বামীকে সুখী করতে পার', মাসীমা বেশ মিষ্ট করিয়া কথা কয়টি বলিলেন।

সান্ত্বনার চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'বলুন মাসীমা দয়া করে, আমি তাকে কেমন করে সুখী করতে পারি ?'

'কাজটা', একটু থামিয়া মাসীমা বলিলেন, 'কিন্তু শক্ত।'

'যত শক্তই হোক', সান্ত্বনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে বলিল, 'আমি করতে পারব।'

'ঠিক বলছ তো ?'

'ঠিক।'

'তা না পারবে কেন ? স্বামীর জন্য সব কিছুই করা উচিত।'

অধীর আগ্রহে সান্ত্বনা বলিল, 'বলুন মাসীমা কি করতে হবে আমাকে ?'

'মানে', চিবাইয়া চিবাইয়া মাসীমা বলিলেন, 'সুপ্রিয়কে তুমি বল আর একটা বিয়ে করতে।'

সান্ত্বনার বুকে কে যেন গুলি চালাইল। এ কি বলিতেছ মাসীমা? এ কি সম্ভব? স্ত্রী হইয়া কেমন করিয়া স্বামীকে অনুরোধ করিবে আর একটি বিবাহ করিতে?

'কি মা, অমন মুখ কালো করে রইলে যে?'

সান্ত্বনা উত্তর দিল না।

'ভাল করে ভেবে দেখো মা,—আমি জানি ছেলেবেলা থেকে সুপ্রিয় সন্তানের স্বপ্ন দেখে, আর বংশের একমাত্র ছেলে বুঝলে কি না, বিয়ে ওর আর একবার করাই উচিত।'

সান্ত্বনার বুকে আগুন জ্বলিতে লাগিল।

সেই রাত্রের কথা।

সান্ত্বনা সুপ্রিয়কে বলিল, 'ওগো একটা কথা রাখবে।'

'কেন রাখব না? তোমার কোন কথা কবে আমি রাখিনি শান্তা?'

সান্ত্বনার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। এ কথাটাও যদি সত্যই সুপ্রিয় রাখে? কিন্তু না, বলিতেই হইবে সুপ্রিয়কে, বুকের ভিতর কাঁপিলে তো চলিবে না। একটি ছেলে পাইলে সুপ্রিয় কত খুসী হইবে সে-কথা তো সান্ত্বনা জানে! আর স্বামীকে সুখী করিতে পারার মত সুখের আর কি আছে মেয়েমানুষের!

'দেখ', সান্ত্বনা বলিয়া ফেলিল, 'তুমি আর একটা বিয়ে কর।'

হাসিয়া সুপ্রিয় বলিল, 'কেন বল তো?'

'না, না, তুমি বিয়ে কর, তোমাকে অসুখী হতে আমি দেব না'. সান্ত্বনা কাঁদিয়া ফেলিল, 'এ বংশ আমি লোপ হয়ে যেতে দেব না কোনমতেই, ওগো তুমি বিয়ে কর—'

'কেঁদনা শান্তা', সুপ্রিয় সান্ত্বনা দিল, 'ছেলে আমাদের হবার সময় আছে এখনও।'

'না, আমার কিছু হবে না। কিন্তু তোমায় অসুখী হতে দেব না।'

'ছেলেমানুষ', সুপ্রিয় হাসিয়া বলিল, 'সান্ত্বনা তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।'

দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু আজ এই সকালে সান্ত্বনার নিজকে মনে হইতেছে রাণীর মত। প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে সে-ডাক যে ঈশ্বরের কানে যায় সে-কথার প্রমাণ সান্ত্বনা হাতে হাতে পাইল। কী ভাল লাগিতেছে আজ তাহার! এতদিন পর তাহার সমস্ত দুঃখ যেন ঘুচিয়া গেল। সান্ত্বনা সুপ্রিয়কে খবরটি দিল। সে সন্তানবতী।

'হ্যাঁ, বল কি?' সুপ্রিয় লাফাইয়া উঠিল, 'সত্যি তোমার ছেলে হবে?

'হ্যাঁ গো', মাথা নীচু করিয়া সান্ত্বনা বলিল।

সুপ্রিয়র চোখ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এতদিন পর তাহার স্বপ্ন সফল হইতে চলিল। কী আনন্দের! খুসীতে সে অস্থির হইয়া পড়িল।

'সান্ত্বনা, আমি যে আর ঘরে থাকতে পারছি না, চল বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'কাকীমার ওখানে যাই চল।'

'আমি কিন্তু কাউকে এখন কিছু বলতে পারব না', হাসিয়া সান্ত্বনা বলিল।

'তোমায় কিছু বলতে হবে না', আরও জোরে হাসিয়া সুপ্রিয় বলিল, 'আমি কালকেই সব জায়গায় জাহির করব।'

'কি ছেলেমানুষী কর!'

'ছেলেমানুষী মানে? কত বড় খবর এটা জান? আমাদের ঘরে অতিথি আসছে—'

'তাই নাকি? কিন্তু অতিথির নাম আমি রাখতে দেব না বলে রাখলাম।'

'বেশ, বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই নাম দিও, কিন্তু চল তাড়াতাড়ি এখন কাকীমার ওখানে।'

'তুমি যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠলে দেখছি,' সান্ত্বনা হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও কাপড় বদলে আসি,' সে অন্য কক্ষে গেল।

স্থপ্রিয় আশার প্রাসাদ গড়িয়া তুলিল। সান্ত্বনার খুসী যেন আর ধরে না। এতদিন পর স্বামীকে সে খুসী করিতে পারিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের কাহারও আর সংবাদটি জানিতে বাকী রহিল না। স্থপ্রিয় সে-কাজ এর মধ্যে বেশ ভাল করিয়া সারিয়া রাখিয়াছে। অনেকে আসিয়া নানা পরামর্শ দিয়া যায়—সান্ত্বনাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলে।

'তুমি সংসারের কাজকর্ম কমিয়ে দাও,' স্থপ্রিয় বলে, 'বেশী কাজ করা ভাল নয় এই অবস্থায়।'

'তাই নাকি?' সান্ত্বনা হাসিয়া ফেলে।

'সব সময় ও-রকম হাস কেন বোকার মত?' স্থপ্রিয় রাগিয়া যায়, 'ভালর জন্যে বললাম একটা কথা।'

'আচ্ছা গো আচ্ছা, কাজকর্ম কিছু করব না, চুপ করে তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব।'

স্থপ্রিয় সেখান হইতে সরিয়া যায়।

সান্ত্বনার উপর এখন আর কাহারও কোন রাগ নাই। আত্মীয়রা আসে, তাহার সংগে নানা রাজ্যের গল্প করে। স্থপ্রিয় মহা ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছে। সান্ত্বনার জন্য নানাপ্রকার খাবার লইয়া আসে প্রত্যহ।

'আচ্ছা সান্ত্বনা,' সুপ্রিয় বলে, 'আর কত দেরী?'

'কিসের গো?' সান্ত্বনা কিছু বুঝিতে পারে না।

'যার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি তার আসতে?'

'তোমার যে ঘুম হয় না দেখি,' সান্ত্বনা হাসিয়া ফেলে, 'কি হল তোমার, য়্যা?'

'ঘুম হবে কেমন করে? প্রথম ছেলের মুখ কবে দেখতে পাব তার দিন গুণছি।'

'এইতো হয়ে এল, তোমায় আর বেশী দিন গুণতে হবে না'

দেখিতে দেখিতে সত্যই তাহাদের ইপ্সিত দিন আসিয়া পড়িল। আজ রাত্রেই সান্ত্বনার একটা কিছু হইবে। সুপ্রিয় ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছে। আত্মীয়-আত্মীয়ায় বাড়ী একেবারে পরিপূর্ণ। সকলে ভীষণ ব্যস্ত।

বসিবার ঘরে চুপ করিয়া সুপ্রিয় একা বসিয়াছিল। সান্ত্বনার কক্ষে এখন তাহার প্রবেশ ডাক্তারের নিষেধ। সুপ্রিয় অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। এতদিন পর তাহার স্বপ্ন সফল হইবে, তাহার চিরদিনের আকাংখা আজ পূর্ণ হইবে। একটা শিশু সুলভ আনন্দে বারকয়েক সুপ্রিয়ার অংগে অংগে শিহরণ খেলিয়া গেল।

তাহার ছেলে নিশ্চয়ই দেখিতে সুন্দর হইবে, সুপ্রিয় ভাবিতেছিল, তা যেমনই হউক সান্ত্বনাকে কিন্তু কখনও সে ছেলের গায়ে হাত তুলিতে দিবে না। হয়তো কোন দিন যখন সুপ্রিয় অফিস হইতে ফিরিয়া আসিবে, অমনি 'বাবা' বলিয়া খোকন তাহার

কোলের উপর উঠিয়া পড়িবে। অমনি অনেক কথাই সুপ্রিয় ভাবিতেছিল, অনেক কল্পনাই করিতেছিল সে।

ওদিকে সান্ত্বনা ভয়ানক চীৎকার করিতেছে—করুক, সে-চীৎকার সুপ্রিয়ার কানে শুনাইতেছে জয়োল্লাসের মত। আর বোধ হয় বেশী দেরী নাই, এখনি ছেলের কান্না শুনা যাইবে, সুপ্রিয় কান পাতিয়া রহিল। কি দিবে সে ছেলের মুখ দেখিয়া? তাই তো বড় ভুল হইয়া গিয়াছে—এখনও তো উপহার ঠিক করা হয় নাই। যাহা হউক, সুপ্রিয় ভাবিল, মুখ দেখিবে এখন, উপহার পরে সান্ত্বনার সহিত পরামর্শ করিয়া দিলেই চলিবে। ছেলে তো আর পলাইয়া যাইতেছে না।

'সুপ্রিয়বাবু,' ডাক্তার রায় প্রবেশ করিল সে-কক্ষে।

এক লাফে সুপ্রিয় উঠিয়া দাঁড়াইল, 'কি খবর ডাক্তারবাবু?'

'বসুন, বসুন,' চেয়ারে বসিয়া ডাক্তার বলিল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

'বলুন, কিন্তু আর দেরী কত?'

'দেরী আর বেশী নেই, তবে বড় বিপদ—'

'বিপদ!' সুপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, 'কি বিপদ ডাক্তারবাবু?'

'মানে,' বেশ আস্তে আস্তে ডাক্তার রায় বলিতে লাগিল, 'এ-রকম অনেকের হয়, আপনি ঘাবড়াবেন না সুপ্রিয়বাবু।'

'শীগ্‌গির বলুন ডাক্তার রায়।'

কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিল, 'দু'জনকে বাঁচান যাবে না, কাকে বাঁচাব বলুন, ছেলেকে, না তার মাকে?'

'একি বলছেন ডাক্তারবাবু! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন আপনি? শক্ত কিছু নয় বোঝা, এমন

অবস্থা হয়েছে যে, দু'জনকে বাঁচান যাবে না, কাকে বাঁচাব তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

সুপ্রিয়র মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ কি বলিতেছে ডাক্তার! তাহার সমস্ত আশা এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এত কল্পনা, এত ভবিষ্যতের ভাবনা সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল।

সুপ্রিয়র বুকে প্রবলবেগে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল। হা ঈশ্বর, এখন উপায়!

'বলুন সুপ্রিয়বাবু।'

সুপ্রিয় কোন উত্তর দিতে পারিল না। সত্যই তাহাদের বংশের উপর যেন কাহার অভিশাপ লাগিয়াছে। কি বলিবে সুপ্রিয় ডাক্তারকে? কত বর্ষ ধরিয়া কত আশা করিয়া আছে সে একটি ছেলের মুখ দেখিবার জন্য, বংশ রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এ কি হইল আজ তাহার!

'সুপ্রিয়বাবু, সময় বেশী নেই, একটু তাড়াতাড়ি বলুন—'

'ডাক্তারবাবু,' সুপ্রিয়র চোখে মিনতির ছাপ, 'দু'জনকে কি কোন রকমে বাঁচান যায় না?'

হাসিয়া ডাক্তার বলিল, 'অসম্ভব সুপ্রিয়বাবু, সে যদি যেতো তাহ'লে কি আর আপনাকে জিজ্ঞেস করতে আসতাম?'

'যত টাকা লাগে,' সুপ্রিয় ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল, 'আপনি যা' চান আমি তাই দেব, দয়া করে দু'জনকেই বাঁচান।'

'তা হয় না, উপায় থাকলে আমি নিশ্চয়ই বাঁচাতাম।'

আবার সুপ্রিয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথায় যেন আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি বলিবে সে ডাক্তারকে?

রিস্টওয়াচ্ দেখিয়া ডাক্তার বলিল, 'আর সময় নেই সুপ্রিয়বাবু, দেরী হলে কাউকেই বাঁচাতে পারব না—'

সুপ্রিয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এইবার সান্ত্বনার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সুপ্রিয় চমকিয়া উঠিল। কী কষ্ট হইতেছে বেচারার! এখন তাহার চীৎকার আর জয়োল্লাসের মত মনে হইতেছে না।

'সুপ্রিয়বাবু, তাড়াতাড়ি, আর সময় নেই,' ডাক্তার রায় উঠিয়া দাঁড়াইল। সান্ত্বনার আর্তনাদে সমস্ত গৃহ যেন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

'সুপ্রিয়বাবু—'

'ডাক্তার রায়,' সুপ্রিয় খুব আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনি ছেলের মাকেই বাঁচান।'

তারা দু'জন

নবগোপাল দাস

নবগোপাল দাস : জন্ম—উনিশ শ' দশ সালে ঢাকা সহরে। পৈতৃক বাসস্থান—ঢাকা। ছাত্রজীবন—ঢাকা ও কলিকাতায়। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন, আই·এস্·সি এবং বি·এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। অর্থনীতি শাস্ত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি·এইচ্·ডি উপাধি পান। এর রচিত কয়েটী বই—'ছিন্ন পাপড়ী,' 'চল্‌তি পথের বাঁশী,' 'সাগর দোলায় ঢেউ' ও 'অসমাপ্ত'।

সুশান্ত আর শিপ্রা।

বিধাতাপুরুষের অলক্ষিত হাতের স্পর্শকে তাহারা কেহই প্রথম জীবনে মানিতে চায় নাই, কিন্তু তাঁহার বিধান যে সাধারণ মানুষের অনধিগম্য তাহা তাহাদের জীবনে যতখানি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল বোধ হয় আর কাহারও জীবনে কখনও ততখানি হয় নাই।

তাহাদের প্রথম পরিচয় হয় অনেকটা গতানুগতিকভাবে, অর্থাৎ—কুড়ি বছর আগে। যদিও এইভাবে পরিচয় হওয়াটা গতানুগতিক ছিল না, আজকালকার রোম্যান্সের বাজারে ইহাকে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কোন পর্যায়ভুক্ত করা বোধ হয় চলে না!

সুশান্ত মামার বাড়ীতে মানুষ। তাহার মামীমা এবং শিপ্রার মা ছিলেন অন্তরংগ সখী। তাই উভয়ের বাড়ীতেই ছেলেমেয়েদের আনাগোনা ছিল অব্যাহত।

সুশান্ত অধিকাংশ সময়ই তাহার কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিত। সেখানকার তর্কসভায় সে ছিল মস্ত বড় একজন পাণ্ডা। তাহার অবসর মিলিত রবিবারে, আর ছুটকোছাটকা ছুটির দিনে।

এমন একটা ছুটির দিনে সে শিপ্রাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার মামীমার সন্ধানে।

চাকরের নির্দেশমত ঘরের পুরানো মলিন পর্দাটা সরাইয়া দিয়া ঢুকিতে যাইবে এমন সময় সে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। কোলের কাছে একটা মাসিক কাগজ নিয়া উদাসভাবে বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিল শিপ্রা। প্রশান্ত দেখিতে পাইয়াছিল শুধু তাহার গ্রীবা-ভংগী, আর সেই গ্রীবাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল যে অলকগুচ্ছ তাহারই যেন একটা ছায়া।

ঘরে অপরিচিতা একটি মেয়ে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মামীমা সেখানে নাই দেখিয়া সুশান্ত ফিরিয়া যাইতেছিল।

এইখানেই হয়ত আমাদের গল্পের যবনিকাপাত হইত, কিন্তু সুশান্ত এবং শিপ্রার জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী সকলকে শুনিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় সেই সময় সুশান্তর মামীমা পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

—সুশান্ত নাকি? আমার খোঁজে এসেছিলি বুঝি? তা চলে যাচ্ছিস্ কেন?

সুশান্ত থতমত খাইয়া বলিতে যাইতেছিল সে চলিয়া যায় নাই, কিন্তু মামীমা তাহার জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিয়া চলিলেন—বিনির সাথে দেখা কর্‌তে এসেছিলাম, শিপ্রা বল্‌লে পাশের বাড়ীতে আছে, তাই সেখানেই চলে গিয়েছিলাম। ওদের ছেলেটির বড্ড অসুখ, বিনিকে আবার ছোটমা বলে ডাকে, কিছুতেই চলে আস্‌তে দিচ্ছে না।

বিনি অর্থাৎ বিনোদিনী শিপ্রার মা, সুশান্তর মামীমার সখী।

—তা শিপ্রা কোথায় গেল? একটা পান অন্তত মুখে দিতে পার্‌লে বড্ড ভালো লাগ্‌ত!

বলিতে বলিতে তিনি শিপ্রা যে ঘরে ছিল সেখানে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই সুশান্তকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভেতরে আয় না?

বলা বাহুল্য, সুশান্তকে শান্ত সুবিনীত ছেলের মত শিপ্রার ঘরে ঢুকিতে হইল।

এই প্রথম সে শিপ্রাকে মুখোমুখি দেখিল।

শিপ্রার চেহারার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই, কিন্তু মুখখানি অত্যন্ত কোমল। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, হাত দু'খানি নিটোল, বেশভূষা আড়ম্বরহীন।

শিপ্রা ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে।

সুশান্তর শিপ্রাকে ভালো লাগিল।

সুশান্তর মামীমা উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন,— এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে সুশান্ত, সব সময় কলেজ আর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত; আর এ হচ্ছে শিপ্রা, যে ক্লাশের বই-এর ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষ্‌তে চায় না, তবে অত্যন্ত লক্ষী মেয়ে, তা' স্বীকার কর্‌তেই হবে।

সুশান্ত ছোট্ট একটি নমস্কার করিল। শিপ্রা যে প্রতিসম্ভাষণ করিল তাহাকে নমস্কার বলিলে ভুল করা হইবে। সে যেন সুশান্তকে আহ্বান করিয়া বলিল,—ওঃ, আপনি সুশান্তবাবু, যার কথা মাসীমার মুখে রাতদিন লেগেই আছে?

সুশান্তই প্রথমে কথা বলিল,—আপনি অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, তাই আপনাকে বিরক্ত না ক'রেই চলে যাচ্ছিলাম।

শিপ্রা জবাব দিল,—পড়ায় আমার মন বসে না কিছুতেই, এসব নীরস জিওমেট্রি, ধাতুরূপ শব্দরূপের যেন শেষ নাই। আদিহীন,

অন্তহীন স্রোতে চলেছে এরা, আমরাও ভেসে চলি এদের সাথে।...আনন্দ পাই নে।

—আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। পরীক্ষার বিভীষিকা যে কি জিনিষ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই বুঝ্‌তে পারে না। আমার এখনও একটা পরীক্ষা বাকী—তবে এটাই শেষ, অন্তত আমার দৃঢ় সংকল্প, এর পর আর কোন পরীক্ষার দুয়ার মাড়াব না!

আপনারা আশা করি বুঝিয়াছেন সুশান্ত এম্‌-এ ক্লাশে পড়ে।

এই ভাবে তাহাদের প্রথম পরিচয়। ইহার পর প্রতি ছুটির দিনেই সুশান্ত আসিতে সুরু করিল শিপ্রার পড়া বলিয়া দিতে। তাহাদের পরস্পরের সংবোধন সহজ হইয়া দাঁড়াইল সুশান্তদা ও শিপ্রাতে।

যতদিন শিপ্রার পরীক্ষার তাড়া ছিল ততদিন সময়টা একরকম ভালই কাটিয়াছিল। শিপ্রা মেধাবী ছাত্রী নয়, তবু তাহাকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করাইতেই হইবে, সুশান্তর এই সংকল্প ছিল। তাহার অধ্যবসায়ে এবং শিপ্রার চেষ্টায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিপ্রার নামও দেখা গেল।

কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইবার পর অখণ্ড অবসর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখনই জটিলতার সৃষ্টি হইতে সুরু করিল। যে সুশান্ত এতদিন কর্তব্যজ্ঞানসংপন্ন শিক্ষকের মত শিপ্রাকে জ্যামিতির দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল সে শিপ্রার সাথে আরম্ভ করিল কাব্য চর্চা। আর শিপ্রাও পরীক্ষার প্রহেলিকা হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি পাইয়া গভীর উৎসাহে কাব্যালোচনায় যোগ দিল।

কাব্য সংপর্কে আমার জ্ঞান খুব সংকীর্ণ; সত্য কথা বলিতে কি, কাব্যরসের মধুর আস্বাদ আমি কোন দিনই উপভোগ করিতে পারি নাই,

কিন্তু কবিতার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটী তীব্র অভিযোগ আছে, যাহা আমি সুশান্ত-শিপ্রার জীবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। আমার মনে হয় ইতিহাস বা দর্শনের মধ্যে যে একটা আভিজাতিক ছন্দ আছে, কাব্যের মধ্যে তাহা নাই ঃ কাব্য হইতেছে স্ফটিক স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর মত, ইহার স্পর্শে তরুণ তরুণীর অংগে লাগে মাতলামি, ইহার আবর্ত তাহাদিগকে পরিণত করে অতি তুচ্ছ ক্রীড়াবস্তুতে।

সুশান্ত-শিপ্রার অবসর জীবনেও কাব্য এই অনর্থের সৃষ্টি করিল। ব্রাউনিং-এর সনেট্ আর শেলীর লিরিক্-এর মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পরকে পরস্পরের কাছে ধরা দিয়া বসিল। সুশান্তর কোলে মাথা রাখিয়া শিপ্রা বলিল,— আমি সুন্দর হব শুধু তোমার জন্য, আমার অন্তর-নিংড়ানো সুখদুঃখের গরিমা বাড়্‌বে তোমারি পায়ের ধূলোর আশ্রয়ে। আর সুশান্তও শিপ্রাকে আদর করিয়া জবাব দিল—তুমি আমায় দেখিয়েছ নূতন জীবনের আলো, আনন্দিত তোমার মাধুরী, তোমাকে সাথী পেয়ে আমি জীবনের পটভূমির সব কিছু সংশয় জয় ক'রে নিতে পার্‌ব এই আমার বিশ্বাস।

আমরা আশা করিয়াছিলাম সুশান্ত শিপ্রার জীবননাট্যের রোমাণ্টিক অংশটার সমাপ্তি হইবে এইখানেই—প্রজাপতির অনুগ্রহে।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বাদ সাধিলেন।

শিপ্রার মা এবং সুশান্তর মামীমার মধ্যে এতদিন যে নিবিড় সখীত্ব-বন্ধন ছিল তাহা ছিঁড়িয়া গেল সুশান্ত-শিপ্রার অনর্থ সৃষ্টিকারী কাব্য-চর্চার ফলে।

সুশান্তর মামীমা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই সুশান্তর সাথে শিপ্রার বিবাহে তাহার মা'র কোন আপত্তি থাকিতে পারে। সুশান্তর মত জামাই যে-কোন মেয়ের মা'র কাম্য —এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

শিপ্রার মা'র লক্ষ ছিল অন্যদিকে। সুশান্তকে যে তাঁহার ভাল লাগে নাই এমন নয়, কিন্তু জামাই হিসাবে তাহাকে পাইবার জন্য তিনি আদৌ উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। তাঁহার লক্ষ ছিল আর একটি ছেলের দিকে, সে সবেমাত্র দুইটা বিলাতি ডিগ্রী এবং ব্যারিস্টারীর ছাপ লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। শিপ্রাদের রক্তে ছিল কৌলিন্যের ধারা তাহার উপর তাহাদের ছিল অর্থ, যাহা পৃথিবীর সব পিপাসা মিটাইবার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে। শিপ্রার মা বিনোদিনী সংক্ষেপে তাঁহার সখীকে জানাইয়া দিলেন যে, শিপ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াই আছে ব্যারিস্টার এবং কেম্ব্রিজ গ্র্যাজুয়েট সমীর রায়ের সহিত, কাজেই সুশান্তর সংগে তাহার বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

সমীর রায়ের সহিত শিপ্রার বিবাহ যদিও বা একেবারে ঠিক ছিল না, সুশান্তর মামীমার প্রস্তাবের পর বিনোদিনী সে বিষয়ে একটু অবহিত হইলেন। সমীরকে জামাইরূপে পাইবার জন্য তিনি স্বামীর ব্যাঙ্কের খাতা তুলিয়া ধরিলেন সমীরের বাবা-মার চোখের সম্মুখে। কয়েক হাজারে রফা হইল। সমীরও কোন আপত্তি করিল না, কারণ সে বুদ্ধিমান্; দেখিল কৃতকার্য ব্যারিস্টার-রূপে বসিতে হইলে প্রথম কয়েকটা বছর অন্যের দেওয়া অর্থের প্রয়োজন অনেকখানি বেশী। তাহা ছাড়া, যে দুই-একবার সে শিপ্রাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহাতে সে বুঝিয়াছিল শ্রী এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়াও শিপ্রা তাহার সহধর্মিণী রূপে নিতান্ত বেমানান হইবে না।

আপনারা মনে করিবেন না সমীর-শিপ্রার বিবাহের এই সমস্ত আয়োজন চলিয়াছিল সুশান্ত বা শিপ্রার অজ্ঞাতে। মামীমার কাছে সুশান্ত যথাসময়ে জানিতে পারিল শিপ্রাকে চিরকালের প্রিয়ারূপে

পাইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ওদিকে মা'র কাছে তীব্র এক ধমক খাইয়া শিপ্রা বুঝিল যে, সুশান্তর পায়ের ধূলায় আশ্রয়ে তাহার নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করার সুযোগ সে পাইবে না।

সুশান্ত এবং শিপ্রা সংসারের কুটিল আবর্তের সম্মুখীন হইল এই প্রথম। পরস্পরের দৈন্য, আলস্য এবং অসাহয়তা বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কি দেখিতে পাইল জানি না, তবে তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমি তাহাদের জীবনের চিত্রকর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলাম।

সুশান্ত শিপ্রার কাছে আসিয়া বলিল,—শিপ্রা, বোধ হয় শুনেছ মাসীমা তোমাকে আমার সংগে বিয়ে দিতে চান্ না।

শিপ্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনিয়াছে।

সুশান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—বল ত কি করা যায়?

—কি করবে? শিপ্রা সুশান্তর প্রশ্নের উত্তর দিল আর একটি প্রশ্নে।

সুশান্ত বুঝিতে পারিল না ইহার পর কি বলা উচিত। সে শুধু শিপ্রার হাত দুটি ধরিয়া বলিল,—আশা করি সমীর রায়ের সংগে বিয়েতে তুমি খুব অসুখী হবে না।...আর আমাদের এই খেলা, এটা খেলার স্মৃতিরূপেই আমাদের বুকে বেঁচে থাক, একে সত্যিকারের মর্যাদা কখনো দিয়ো না, নইলে জীবনের প্রারম্ভে মস্ত বড় একটা ভুল করা হবে।

শিপ্রা কাঁদিল না, হাসিল না, খুব শান্ত সহজ সুরে বলিল, চেষ্টা করব, সুশান্তদা।

আমি তাহাদের জীবনের চিত্রকর আশা করিয়াছিলাম বিবাহের রাত্রে বা তাহার আগের দিন শিপ্রা যাইবে সুশান্তর কাছে, সকলের

অগোচরে, দেবদাসের পার্বতীর মত। আমি আশা করিয়াছিলাম শিপ্রা সুশান্তর বুকে মাথা রাখিয়া বলিবে—এ জীবনে যদিও তোমাকে পেলাম না তবু আমি তপস্যা করতে থাকব, আসছে জীবনে আমাদের মিলন যেন অব্যাহত হয়। আমি এমনও আশা করিয়াছিলাম, সুশান্ত হয়ত দেবদাসের মত শিপ্রার অংগে এমন একটা চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইবে যাহা তাহাকে চিরকাল মনে করাইয়া দিবে সুশান্তর প্রতি তাহার শান্ত সংযত ঔদাসীন্যের কথা। যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার কিছুই ঘটিল না।

গোধূলি লগ্নে হাসি আনন্দের কলরোলের মধ্যে সমীর-শিপ্রার বিবাহ হইয়া গেল। সুশান্ত শিপ্রার বিবাহে যোগদান করিল না, তাহাকে স্নেহ বা আশীর্বাদসূচক কোন উপহারও পাঠাইল না।

ইহার পর আমি বৎসর তিনেক শিপ্রার কোন খবর রাখিতে পারি নাই। শিপ্রা চলিয়া গেল স্বামীগৃহে, আর আমি আসিলাম সুশান্তর সংগে বোম্বাই-এ। সত্য কথা বলিতে কি, সমীর-শিপ্রা কি করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল নিঃস্ব সুশান্তর প্রতি আমার সহানুভূতি।

আমি জীবনের ঘটনাবৈচিত্রের চিত্রকর। জীবনের চিত্রশালায় কাহারা কি ভাবে চলিতেছে, কখন তাহারা হাসিতেছে, কখন তাহারা কাঁদিতেছে, আমি যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে আঁকিতে চেষ্টা করি। মানুষের অন্তরের নিবিড়তম বেদনা, তাহার দিশাহারা ব্যাকুলতা, এ সমস্ত আমার ছবির মধ্যে সাধারণত ফুটিয়া ওঠে না যতক্ষণ না তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ হয়। শিপ্রার বিবাহের পর যে তিন বৎসর আমি সুশান্তর সংগে সংগে ছিলাম তখন কোন দিন এমন

একটা মুহূর্তও দেখি নাই যেদিন সুশান্ত শিপ্রার কথা ক্ষণিকের জন্যও স্মরণ করিয়াছে। সুশান্ত'র অজ্ঞাতে আমি তাহার ডায়েরীর পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি শিপ্রা সংপর্কে তাহার শেষ উক্তি তাহার বিবাহের তারিখে—সংক্ষেপে লেখা: আজ শিপ্রার বিয়ে হয়ে গেল।—কিন্তু তাহার পর কোন দিন সে পরোক্ষেও শিপ্রার নাম বা তাহাদের যৌবনোচ্ছল খেলার উল্লেখ করে নাই। সুশান্তর লিখিবার টেবিল, তাহার সুটকেশ, তাহার মনিব্যাগে কোথাও শিপ্রার ছোট্ট একটি ফটোও আমি দেখিতে পাই নাই।

সুশান্তর জীবনের এই তিন বৎসরের কথা বলিতে সুরু করিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছি তাহাও যেন আমার কাছে কেমন রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হয়। আমি দেখিলাম, সুশান্ত অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসিতে পারিল না, অন্তত এই তিনটি বৎসর সে যেন জোর করিয়া নারী-সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিল। অথচ জীবনটাকে কেন এমনই করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও আমি তাহার কথাবার্তা বাহিরের ভাবভংগি হইতে বুঝিতে পারি নাই। সে কিছুদিন কাজ করিল একটা সংবাদপত্রের প্রেসে। রাত্রির পর রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে সে কম্পোজিং, প্রিন্টিং ও প্রুফ রিডিং-এর কাজ তত্বাবধান করিত, ভোর পাঁচটার সময় স্থানীয় এজেন্টদের হাতে কাজগুলি দিয়া সে ছুটি লইত। এইভাবে একবৎসর কাটিয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রেসের স্বত্বাধিকারীর সহিত দুই-একটা কথা কাটাকাটি হওয়ায় চাকুরী ছাড়িয়া দিল। মাস তিনেক সে আর কোন কাজের সন্ধানে বাহির হইল না—এতদিন প্রেসে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে তিনমাস কাটাইল—অবাধিল আলস্যে, নিবিড় ঔদাসীন্যে। তিনমাস পর সে সুপ্তোত্থিতের

মত ভাবিতে সুরু করিল। কি ভাবিয়াছিল তাহা জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ সুশান্ত স্বভাবতই স্বল্পভাষী, কিন্তু দেখিলাম সে লেখায় মন দিল। গল্প বা কবিতা লেখা নয়—গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ। কলেজে তর্কসভায় বুদ্ধিমান বক্তা বলিয়া সুশান্তর খ্যাতি ছিল, প্ল্যাটফর্ম্ হইতে নামিয়া আসিয়া লেখনী ধারণ করিয়াও তাহার সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিল। আমাদের দেশে গল্প লেখকরাই গল্প লেখাকে জীবিকারূপে অবলংবন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করিতে পারে না, প্রবন্ধ লেখক ত কোন্ ছার। কিন্তু সুশান্তর অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি কোন স্পৃহা ছিল না। সে সামান্য যাহা কিছু উপার্জন করিত তাহাতেই তাহার স্বল্প ও সাধারণ অভাবগুলি মিটিয়া যাইত।

এইভাবে আরও এক বৎসর নয় মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই সুশান্তর জীবনে আমি ঘটিতে দেখি নাই। তাহার আড়ম্বরহীন বৈচিত্র্যবিরল জীবন পাতার পর পাতা খুলিয়া চলিল, সেখানে একটি কালির আঁচড়, এতটুকু তুলির চিহ্নও আমি দেখিতে পাইলাম না।

বিবাহের পরই শিপ্রা স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছিল। সমীরের শিপ্রাকে ভালো লাগিয়াছিল, যদিও শিপ্রার চেয়েও তাহার বেশী ভালো লাগিয়াছিল তাহাকে পাইবার পাথেয় টুকু। বেশ সৌখীনভাবে অফিস্ ও ড্রয়িং রুম সাজাইয়া সমীর রায় বার-য়্যাট্-ল প্র্যাক্টিস্ সুরু করিল।

শিপ্রা সমীরকে ভালোবাসিতে চেষ্টা করিল। সুশান্তর সংগে তাহার কয়েক দিনের সাহচর্যটাকে সে বিগত জীবনের স্মৃতি বলিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু যখন আকাশে বাতাসে আলোর স্রোতে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিত, নিজের

অপরিপূর্ণ জীবনের ফাঁকের মধ্য দিয়া অননুভূতপূর্ব একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিতে চাহিত, তখন তাহার সব এলোমেলো হইয়া যাইত। স্বামী সমীর, তাহার নূতন সাজানো সংসার, সমস্ত সে ভুলিয়া যাইত; তাহার মনে পড়িত তাহার ছিন্ন জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটি, যাহার বেদনার মধ্যে সে অনুভব করিত বিচিত্র একটা পুলক, যাহা শারদাকাশের মেঘের উপর ক্ষীণ রৌদ্রের রেখার মত তাহার অন্তরাকাশের শুভ্রতাকে করিয়া তুলিত আরও গৌরবোজ্জ্বল, আরও ঐশ্বর্যসংপন্ন।

সমীর শিপ্রার মনের বিচিত্র লীলা বিশেষ বুঝিতে পারিত না, সেদিকে তাহার নজরও ছিল না। স্বামীর যাহা কিছু দাবী শিপ্রা সমস্তই মিটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত, তাহা ছাড়া সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ যাহা দরকার তাহাও সমীর পূরামাত্রায় পাইত। কাজেই মাসের মধ্যে একটি দিন যদি শিপ্রা অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিত, স্বামীর চায়ের টেবিলে আসিয়া বসার দৈনন্দিন কর্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, সমীর তাহাতে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ হইত না। এরকম ত্রুটি জীবনযাত্রার অপরিহার্য একটা অংগ, একটা বৈচিত্র্যদায়ক পরিবর্তন মনে করিয়া সে বরং খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত।

এইভাবে শিপ্রা-সমীরের জীবন একটানা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছিল। সচরাচর যেমন দেখা যায়, তার চেয়ে বেশী একটু নিবিড়তা, পরস্পরের জন্য বেশী একটু ঔৎসুক্যই বাহিরের লোকে তাহাদের মধ্যে লক্ষ করিত এবং আদর্শ দম্পতি হিসাবে তাহাদের দৃষ্টান্তের উল্লেখও করা হইত। কিন্তু যাহারাই শিপ্রার অন্তরের আবরণটি খুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহারাই বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, তাহা বেদনায় লাল এবং সেখানে রহিয়াছে সুতীব্র

একটা কঠিনতা যাহার সংস্পর্শে কোমল এবং সুলভ সব কিছুই প্রতিহত হইয়া আসে।

শিপ্রার অন্তরের ক্ষত কোন দিন সারিত কি-না জানি না, কিন্তু আমাদের বিধাতাপুরুষ আসিয়া আবার এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন। দুই বৎসর সমীরের গৃহলক্ষ্মীভাবে থাকার পর নিঃসন্তনা শিপ্রা বিধবা হইল।

সমীরের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহে শিপ্রা বিহ্বল হয় নাই, কিন্তু তাহার মৃত্যুতে সে সত্যই বিহ্বল হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে শিপ্রার বাবা-মা দুইজনেই মারা গিয়াছিলেন, কাজেই সংসারে দাঁড়াইবার মত কোন আশ্রয়ই তাহার ছিল না। সমীর অবশ্য কোন ঋণ রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার সঞ্চয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। শিপ্রা দেখিল তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহাকে বাঁচিতে হইবে এবং ভালোভাবে বাঁচিতে হইবে।

সুশান্তর কথা তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু সুশান্ত কোথায়, কি ভাবে আছে তাহা যে সে কিছুই জানে না। কাজেই সে সাময়িকভাবে সুশান্তর চিন্তা মন হইতে বিসর্জন দিল।

একটি বৎসর কাটিল নানা বিশৃংখলায়। জীবনের ভবিষ্যৎ পথ স্থির করিয়া লইতে গিয়া সে অনেকবার ভুল করিল, স্পর্ধা করিয়া সে অনেক কিছুতে হাত দিল, আবার কিছুদিন পরেই সে মলিন মুখে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। অবশেষে একটি মেয়ে-প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সে একটি বৃত্তি পাইল—বিলাতে গিয়া শিক্ষা-সংপর্কীয় একটা ডিপ্লোমা লইয়া আসিবার জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ জীবনটা কাটাইয়া দিবে সে স্থির করিয়া ফেলিল।

আমাদের গল্পের শেষাংষে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শিপ্রা বোম্বাই-এ আসিল, পরের দিন তাহার ইউরোপগামী জাহাজ ছাড়িবে। বোম্বাই শহরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল।

সুশান্তও কি যেন একটা কাজে সেখান দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার নজর পড়িল শিপ্রার দিকে। ঠিক সেই তিন বছর আগেকার শিপ্রার মত, তবে যেন একটু রোগা হইয়া গিয়াছে।

সুশান্ত ভাবিতে লাগিল শিপ্রাকে সংভাষণ করিবে কিনা। যদি সমীর কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকে তবে হয়ত শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে এবং তখন শিপ্রা হয়ত রীতিমত বিব্রত বোধ করিবে।

সে খানিকক্ষণ শিপ্রার দিকে তাকাইয়া রহিল। পর্যবেক্ষণের পর তাহার মনে হইল, শিপ্রা একা। সে অগ্রসর হইয়া গেল।

সুদীর্ঘ তিন বৎসর পর সুশান্তর সহিত শিপ্রার দেখা, তাহার চোখের সম্মুখে দিনের আলোগুলি যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার হঠাৎ নিভিয়া গেল।

শিপ্রাই প্রথমে কথা বলিল,—সুশান্তদা!

—হ্যাঁ, আমি। তা তুমি এখানে কোত্থেকে? মিঃ রায় কোথায়?

শিপ্রা মলিনভাবে হাসিল। সীমন্তের দিকে অংগুলী নির্দেশ করিয়া বলিল,—উনি বছরখানেক হ'ল মারা গেছেন। আমি একা বিলেত চলেছি।

সংবাদের আকস্মিকতা সুশান্তকে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—তোমার বাবা-মা? তোমার—তোমার ছেলেমেয়ে?

আগেরই মত হাসিয়া শিপ্রা জবাব দিল,—বাবা-মা ওঁর আগেই চলে গেছেন। আর, ছেলেমেয়ে? আমি ত আগেই বলেছি আমি একা।

তারা দু'জন।

—তুমি কবে বিলেত যাচ্ছ? কেন? কত দিন থাক্‌বে? এক নিঃশ্বাসে সুশান্ত এতগুলি প্রশ্ন করিয়া বসিল।

—বিলেত যাচ্ছি কাল, ভিক্‌টোরিয়া জাহাজে। বৃত্তি পেয়েছি, একটা শিক্ষা-ডিপ্লোমা নিয়ে আস্‌ব। বছর দুই থাক্‌তে হবে।

সূচীভেদ্য একটা অন্ধকার যেন সুশান্তকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে বলিল,—তোমার হাতে ত সময় আছে শিপ্রা, আমার দুটো কথা বল্‌বার ছিল, আমার সংগে একটু আস্‌বে?

শিপ্রা মুহূর্তের জন্য কি ভাবিল। তারপর বলিল,—চলুন···

উভয়ে হাঁটিয়া চলিল সমুদ্রের ধারে, বড় বড় ডকগুলি যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে। একটা খোলা জায়গা দেখিয়া উভয়ে বসিল।

সুশান্তই কথা সুরু করিল,—তুমি বিলেত যাচ্ছ, বাকী জীবনটা কি তুমি শিক্ষয়িত্রী-ভাবেই কাটিয়ে দিতে চাও, শিপ্রা?

একটু যেন তিরস্কারের সুরে শিপ্রা বলিল,—তা ছাড়া আর কোন পথ আমার খোলা আছে কি, সুশান্তদা? বিধবা মেয়ের স্থান আমাদের দেশে এখনও অতি অগৌরবের। এরই মধ্যে চলনসই একটা ব্যবস্থা আমাকে ত করে নিতেই হবে, নয় কি?

লজ্জিত সুরে সুশান্ত বলিল,—সে কথা আমি অস্বীকার করছি না, শিপ্রা, কিন্তু ভাবছিলাম, আর কি কোন পথই তোমার খোলা নেই?

—দেখ্‌ছি না ত!

সুশান্ত যেন একটু ভরসা পাইল। আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল,—বিগত জীবনের স্মৃতি আমি জোর ক'রে তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই নে শিপ্রা, কিন্তু আমায় বিশ্বাস ক'রো, এই তিনটি বছর আমি কাটিয়েছি আলো-নেবানো উৎসব-প্রাংগণে ভীরু প্রহরীর মত। নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি কাজে অকাজে, বাইরে কাউকে, এমন কি,

আমার নিজের মস্তিষ্ককেও জান্‌তে দিইনি আমার অন্তরের কথা। তিন বছর আগে সাহস সঞ্চয় ক'রে যে ন্যায়সংগত দাবী জানাতে পারিনি, আজ সেটা ভিক্ষার মত তোমায় জানাচ্ছি।

—আমাকে কি কর্‌তে ব'লো? সহজ ভাবেই শিপ্রা প্রশ্ন করিল।

—বিধবাবিবাহে আমার কোন আপত্তি নেই, শিপ্রা। কম্পিতকণ্ঠে সুশান্ত বলিল।

—কিন্তু আমার আছে। সুদৃঢ় স্বরে শিপ্রা জবাব দিল।

সুশান্ত এতক্ষণ যে কল্পনা-সৌধ রচনা করিয়া তুলিতেছিল, শিপ্রার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে তাহা মুহূর্ত মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে বেদনাপাণ্ডুর মুখে বসিয়া রহিল।

শিপ্রা কথা বলিল খুব ধীরে ধীরে, খুব সংযত স্বরে,—এমন একটা দিন ছিল, সুশান্তদা, যে-দিন তোমার কাছ থেকে এই রকম একটা দাবীরই প্রতীক্ষা করেছিলাম। সে-দিন আমি ছিলাম নিতান্ত অসহায়া, সংসারে নির্মমতায় অনভ্যস্ত কিশোরী। সে-দিন যদি তুমি এতটুকুও জোর গলায় আমাকে বল্‌তে যে, আমাকে তোমার চাইই, তা হ'লে আমিও অনেকখানি জোর পেতাম; তোমার সংগে সমান ওজনে গলা মিলিয়ে আমিও বল্‌তে পার্‌তাম, সুশান্তকে আমার চাইই। তুমি তোমার দাবী জানালে না, উপেক্ষিত ব্যাহত শিপ্রা আশ্রয় খুঁজল যে তাকে আশ্রয় দিতে চাইল তারই বুকে। কিন্তু সেখানেও সে শান্তি পেল না। সুদীর্ঘ দুই বৎসরের বিবাহিত জীবন সে কাটাল অভিনয় ক'রে—মনের গভীরতম প্রদেশে তার স্বামীর রইল প্রবেশ নিষেধ, সেখানে শুধু খেলা করতে লাগল শিপ্রা আর তার কিশোরী জীবনের প্রিয়। যাক্‌ সে-কথা। দুবছর পর যখন আমি সংসারে এসে দাঁড়ালাম সংপূর্ণ একা, তখন প্রথমটা বিহ্বল হয়ে

পড়েছিলাম। সংসারের আঘাতের সম্মুখীন এরকম ক'রে ত আর কখনও হইনি! কিন্তু এই একটি বছরের মধ্যে আমার নিজেকে আমি ফিরে পেয়েছি, সুশান্তদা। আমার মনে হয় না, আর কখনও আশ্রয়ের জন্য আমাকে লালায়িত হ'তে হবে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া শিপ্রা হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

সুশান্ত চুপ করিয়া শিপ্রার কথাগুলি শুনিল, তাহার পর গভীর শ্রদ্ধায় তাহার ডান হাতখানি শিপ্রার হাতের উপর রাখিল। শিপ্রা কোন বাধা দিল না। সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছল হইয়া উঠিল, ঝির ঝির করিয়া একটা বাতাস তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া গেল, দূরে একটা বন্দর-প্রত্যাগত জাহাজের বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সুশান্ত ধীরে ধীরে বলিল,—বেশ, রাত হয়ে যাচ্ছে শিপ্রা, চলো।

যেন অশ্রুতবাণী শুনিতেছে এইভাবে অন্যমনস্ক শিপ্রা জবাব দিল,—চলো।

পরেরদিন শিপ্রা যখন 'ভিক্টোরিয়াজাহাজে ওঠে তখন জেটিতে সে একখানা পরিচিত মুখের সন্ধান করিয়াছিল, সন্ধান মিলে নাই।

আমি, সুশান্তর জীবনকার, জানি সে কোথায় ছিল। সে গিয়াছিল তাহার সেই ভূতপূর্ব সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর কাছে তাহার নিজেরই অপরাধ হইয়াছে স্বীকার করিয়া সে আবার প্রেস-ম্যানেজারের কাজে বহাল হইল।

সুশান্ত আগের মত রাতের পর রাত আবার সেই প্রেসে কাজ করিতেছে।

অভিমান

শেফালী মুখোপাধ্যায়

শেফালী মুখোপাধ্যায়ঃ জন্ম—উনিশ শ' আঠার সালে হায়দ্রাবাদে। পৈতৃক বাসস্থান—উলা, বীরনগর। ছাত্রীজীবন—এলাহাবাদ। এলাহাবাদ 'এংলো বেংগলি ইণ্টার কলেজের' প্রফেসার শ্রীযুত কালিচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও বর্ধমান নিবাসী শ্রীযুত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নী।

লক্ষ্ণৌএর রাজপথের উপর মোটর লইয়া আসিতেছি। আমার পার্শ্বে ছয় বৎসর কন্যা রিণা বসিয়া।

তাহাকে বলিলাম—"ঐ দেখ রিণা এখানকার চিড়িয়াখানা"

রিণা উৎসুক চক্ষুদুইটী চিড়িয়াখানার প্রতি রাখিয়া বলিল—"হ্যাঁ মামণি, ওখানে বাঘ আছে না? সার্কাসে যেম্‌নি দেখেছি তেমনি?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, অনেক রকমের বাঘ আছে, তোমায় একদিন দেখিয়ে আন্‌বো।"

কথা কহিতে কহিতে 'হরিমতী গার্লস স্কুলের' সম্মুখে আসিলাম। মোটর থামাইলাম ও নামিয়া অফিসগৃহে রিণাকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রধান শিক্ষয়িত্রী যখন শুনিলেন আমি রিণাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করিতে আসিয়াছি তখন তিনি দারোয়ান দিয়া উক্তক্লাসের শিক্ষয়িত্রী মিস্‌ ঘোষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মিস্‌ ঘোষ আসিতেই আমি তাঁহাকে দেখিয়া বড় আশ্চর্য হইলাম। স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া মিস্‌ ঘোষের হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম,—"আরে মিতা এখানে? কতদিন পর দেখা"

মিতা অর্থাৎ মৈত্রেয়ী বলিল—"আরে লেখা, কবে এখানে

এলি ? আমি তো আজ পাঁচ বছর হোল এখানে কাজ করছি। ওবুঝি তোর মেয়ে ?”

আমি উত্তর দিলাম—“গত সপ্তাহে এখানে এসেছি, ওঁর বদলীর চাকরী জানিস তো ভাই। রিণাকে এখানে ভর্তি কোরলাম, একটু ওকে দেখাশোনা করিস্।”

এমন সময় স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিল।

মৈত্রেয়ী একটু হাসিয়া বলিল—“এখন ভাই ক্লাস আছে। বিকেলের দিকে আসিস গল্প করা যাবে।”

আমি বলিলাম—“এখন তবে যাই, রিণাকে তোর চার্জে রাখলাম। রিণা, উনি তোমার মাসিমা হন। কোনও ভয় নেই, উনি তোমার কত বন্ধু জুটিয়ে দেবেন। আমি তবে আজ আসি।”

মৈত্রেয়ী আদর করিয়া রিণার হাত ধরিয়া অদূরে একটি ক্লাসের দিকে দেখাইয়া বলিল—“ঐ দেখ তোমার মত কত ছোট ছোট মেয়ে আছে, তুমি ওদের সংগে খেলবে, গান গাইবে, নাচ শিখবে।”

সারাটামন আজ আমার কিরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কেবলই মনে পড়িতেছে মিতার কথা, তাহার জীবনের কথা। আজিকার এই মিতার সহিত আট বৎসর আগেকার কলেজে-পড়া মিতার কত প্রভেদ। মিতা আর আমি স্কুলে ও কলেজে-একই সংগে সাতটি বৎসর পড়িয়াছি। লেখাপড়ায় মিতা আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে ভাল ছাত্রী ছিল। ছাত্রীহিসাবে সে অত্যন্ত মেধাবিনী ছিল। তার হাসিগল্পের কলরবে সারাটা ক্লাসকে মুখর করিয়া তুলিত। আমি তাহাকে বলিতাম—“মিতা তোর ছেলে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল।”

মিতা তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিত—"ঠিক বলেছিস ভাই—ভগবানের এ ভুল কিছুতেই ক্ষমার্হ নয়।"

আশ্চর্য! সেই চঞ্চল, উচ্ছ্বল কলহাসিনী মিতার আজ পরিবর্তন কত!

তাহার এই স্তব্ধ মূর্তির প্রতি চাহিয়া দেখিতে সাহস পাই না। মিতা ছিল নূতনত্বের উপাসিকা। সে বলতো—"আমি তোদের মত বিয়ে কোরে নিজের সমস্ত প্রতিভাও কর্মশক্তিতে এমন কোরে একটা ছোট্ট সংসারের মাঝে আবদ্ধ রেখে নষ্ট কোরতে দিব না। আমার এইটুকু শক্তি, আমার এইটুকু প্রতিভাই আমি সারা বিশ্বের মাঝে ব্যপ্ত করে দেব।"

মনে পড়ে একদিন সে বলিয়াছিল—"ফোর্থ ইয়ারের ফার্স্ট বয় রজত চৌধুরীর সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে। ইহাতে নাকি তাহার অংক জানিয়া লইবার খুব সুবিধা হইয়াছে।

এই রজত চৌধুরীই তার কাল হইল। দেখিলাম যেরূপে একটী ভূমিকম্পের আলোড়নে সমস্ত পৃথিবী ভূমিস্মাৎ হইয়া যায় সেরূপ এই রজত চৌধুরীর সংস্পর্শে আসিয়া মৈত্রেয়ীর সব কিছু বদলে গেল সম্পূর্ণ ভাবে। আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম সে যখন তৃতীয় বিভাগে আই-এ-পাশ করিল। আমার সে-সময় বিবাহ হয় এক বি-সি-এস্ এর সহিত। তাহার পর চলিয়া আসি সুদূর পশ্চিমে। এরপর মিতার আর কোন সংবাদ পাই নাই।

আজ আটবৎর পর অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার দেখা পাইলাম। কলেজের বিলাসিনী মিতা, যার ফ্যাসানের আমরা অনুকরণ করিতাম, সেই মিতা আজ অতি সাধারণ বেশে দেখা দিল। সহসা তাহার এই পরিণতিকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। আজ মনে পড়িতেছে

অভিমান

একদিন ফোর্থ-ইয়ারের উৎপলাদি বলেছিলেন—"মিতা, ছেলেদের সংগে পড়, অত ফ্যাশান না কোরলেই পার। বেচারী ছেলেদের যে মাঝখান থেকে প্রাণটি যায়! এমনিতেই তো চেহারাটী attractive."

মিতার ছিপ্‌ছিপে চেহারাখানি। তাহার চোখদুটী চমৎকার। তাহার কালো বড় বড় দুইটী চোখের নির্লিপ্ত চাহনিই ছেলেদের পাগল করিয়া তুলিত। কলেজের কোনও ছাত্র তাহার প্রেমে পড়িয়াছে শুনিলে সে বলিত—"আচ্ছা বল্‌তো এতে আমার কি দোষ? ওরা আমার পেছনে ছুটে মরে কেন?"

এমনি করিয়া বিগতদিন অতীত হইয়াছে।

বিকেলে চায়ের টেবিলে আমরা চা পান করিতেছি—আমি, উনি এবং কন্যা রিণা।

রিণা বলিল—"বাবা জান মাসিমা আমায় টিফিনের ছুটিতে চকোলেট, মিষ্টি দুধ খেতে দেন?"

ইতিমধ্যে উনি রিণার নূতন মাসিমার সংবাদ পাইয়াছিলেন। উনি বলিলেন—"তাহলে আর কি? বেশ চমৎকার স্কুল তো, পড়তে গেলে খেতেও পাওয়া যায়! আমিও এবার ভর্তি হয়ে যাই, কি বল রিণা?"

রিণা হাসিয়া বলিল—"ওখানে তো মেয়েরা পড়ে। তুমি তো ছেলে!"

রিণার কথা শুনিয়া আমার উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল কে একজন মহিলা আমার সহিত

দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ড্রইংরুমে বসাইতে বলিলাম।

কিছুক্ষণ পর গিয়া দেখি মিতা আসিয়াছে। তাহার পরিধানে সাদা খদ্দরের নীলপাড়ের শাড়ী ও খদ্দরের ছিটেরই একটি ব্লাউজ।

আমায় দেখিয়া বলিল—"তোকে দেখে থেকে পুরানো দিনের কথা এতবেশী মনে পড়ছিল যে শেষে এখানে এসে তবে ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেলাম।"

আমি বলিলাম—"তা বেশ করেছিস্ এসেছিস্, আজ আমাদের সংগে খাবি।"

বেয়ারা আসিয়া চা খাবার দিয়া গেল। আমি এক কাপ চা ঢালিয়া মিতাকে দিলাম।

সে একটু হাসিয়া বলিল—"ভাই আমি তো চা খাই না।"

মিতার কথায় আমি সাশ্চর্যে বলিলাম্, "সে কিরে, তুই আবার চা ছাড়লি কবে? তুই যে দারুণ চা-খোর ছিলি। হঠাৎ তোর এত পরিবর্তন হোল কেন?"

মিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া আমার প্রশ্নটা হাল্কাভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল—"বাঃ রে! চিরকালই বুঝি একরকম থাকব, ছেলেমানুষ তখন বুঝতুম না কিসে কি হয়। চা খেলে শরীর খুব খারাপ হয় সেই জন্য ওটা ছেড়েছি।"

আমি উত্তর দিলাম—"মিতা একটা কথা বল্‌বি? তোর রজত চৌধুরীর কি খবর?"

মিতা আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ওর কথা আর জেনে কি কি হবে, সে আর একদিন বলবোখন। আজ রাত হয়ে যাচ্ছে। বোর্ডিংএ বলে আসিনি, এখানে খেলে ওখানে খাবার নষ্ট হবে।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। বুঝিলাম রজত চৌধুরীর কথা উল্লেখ করিয়া তাহার মনে কত ব্যথা দিয়াছি।

একদিন বৈকালে মোটরে করিয়া মিতার সংগে গোমতী নদীর তীরে বেড়াইতে আসিলাম। তখন সূর্যাস্ত। পশ্চিম গগন লাল রং-এ রাঙাইয়াছে। নদীবক্ষে আকাশের লালিমাটুকুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া ঢেউগুলির আঘাতে ভাঙিয়া অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতেছে।

বহুক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধভাবে গোমতীবক্ষে সূর্যাস্তের সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করিলাম। স্তব্ধতা ভংগ করিয়া মিতা বলিল—"মনে পড়ে লেখা, কলেজ থেকে একদিন boating-এ গিয়েছিলুম আমরা। গীতি, প্রীতি সব কোরাস গান গেয়েছিল নৌকায় বসে বসে।"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিন ছিল আমাদের পরীক্ষার আগের ফেয়ারওয়েল পার্টি। ছেলেরাও তো ওপার থেকে নৌকা করে আসছিল। মনে নেই? রজত চৌধুরীই তো ওদের নৌকার দাঁড় টানছিল। হ্যাঁ, তুই সেদিন বলছিলি না রজতের কথা আর একদিন বল্‌বি। আজ বল্ না ভাই?"

মিতা বলিল—"হ্যাঁ ভাই, আজ তোকে আমি সবই বল্‌বো। এতখানি ভার আর নিজে বইতে পার্‌চি না। তোকে সব বলে নিজের বুকটাকে হাল্কা করবো। হ্যাঁ, বি-এস্-সি পাস করে রজত গেল বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারীং পড়তে। সেখান থেকে রজতের চিঠি নিয়মিত পেতাম। তার এক চিঠিতে জানলাম যে তার টায়ফয়েড হয়েছিল। তার বিদেশিনী বান্ধবী মিস্ ফ্লোরা তার রোগে অক্লান্ত সেবা করেছে। একরকম এই মেয়েটী নাকি তার জীবন দান কোরেছে।

সেজন্য রজত চিরদিনের জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ একমাত্র মিস্ ফ্লোরার ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ তাঁকে বিয়ে করে।" এই বলিয়া মিতা আমার হাতে একটা টান দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"লেখা, চল্ রাত হয়ে গেল।" এর বেশী মিতার কাছ থেকে কিছু জানতে পারে নি।

মৈত্রেয়ীকে সেদিন রবিবার সকালে আমি একখানি চিঠি পাঠাইলাম—

ভাই মিতা, আজ ওঁর এক বিলেতফেরতা বন্ধু আসবেন। তাই একটা ভোজের আয়োজন করেছি, তোকে আমার এই আয়োজনে একটু সাহায্য করতে হবে! তোর আসা চাই-ই চাই। আমার প্রীতি নিস্। ইতি—লেখা—

মৈত্রেয়ী আসিল এবং সাহায্য করিল।

সদ্য বিলাত প্রত্যাগত মিস্টার চৌধুরী আসিলে আমার স্বামী আমি নিজে তাহাকে সংবর্ধনা করিয়া গৃহে বসাইলাম। অদূরে বসিয়া তখন মৈত্রেয়ী ফুলদানিতে রক্ষিত রজনীগন্ধার বিষয়ে রিণাকে কি বুঝাইতেছিল। মিস্টার সান্ন্যাল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"মিস্ ঘোষ, ইনি আমার বন্ধু মিস্টার চৌধুরী। বিলাতে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। মৈত্রেয়ী মিস্টার চৌধুরীর প্রতি চাহিতেই দু'জনেই স্তম্ভিত, বিস্ময়ে নির্বাক, নিঃস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

মৈত্রেয়ী বিকৃতকণ্ঠে কহিল—"পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।"

মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া সকরুণ কণ্ঠে বলিল—"লেখা শরীরটা ভাল লাগছে না। এবার আমায় ছুটি দে ভাই। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।"

সত্যই তো মিতার মুখ ম্লান,—তাহার উদাস দৃষ্টিতে যেন কোন এক ব্যথার চাঞ্চল্য প্রকাশমান।

উনি বলিল—"কিছু খেয়ে যাও ভাই।"

মৈত্রেয়ী উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল—"না আমার একটুও খিদে নেই। বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।"

পরদিন স্কুলে মিতার খোঁজ পাইয়া জানিলাম মৈত্রেয়ী কলিকাতায় কাল রাত্রের ট্রেণেই চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় মিস্টার চৌধুরী মিস্টার সান্ন্যালের নিকট জানিলেন মিস্ ঘোষ লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইনি রজত চৌধুরী যাহাকে মৈত্রেয়ী ভালবাসিয়াছে।

মৈত্রেয়ীর লক্ষ্ণৌ ত্যাগের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে হইল অতর্কিতে দেখা হওয়ায় মৈত্রেয়ী অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছে এবং সে আঘাত হয়ত সহিতে না পারিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। তিনি অদ্যোপান্ত মিস্টার সান্ন্যালকে জানাইলেন এবং আরও জানাইলেন যে ফ্লোরা একজন ভারতীয় সিভিলিয়নকে পাইয়া তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। তিনি কোন দিনই ফ্লোরাকে ভালবাসেন নাই। শুধু কর্তব্যের দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছিলেন।

সব কথা ভাঙিয়া আমি মিতাকে লিখিলাম—"এখন চৌধুরী মিতাকে স্ত্রীরূপে পাইলে ধন্য হইবেন।" উত্তরে মৈত্রেয়ীর শুধু জানাইল—"মনের স্মৃতি হইতে যে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে নূতন করিয়া আবার কী গ্রহণ করা যায়?"

তারপর একটী ছোট্ট ঘটনা।

মিস্টার রজত চৌধুরী একদিন মৈত্রীর সহিত দেখা করিতে

আসিলেন। রজতকে প্রথম দেখিয়াই তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখে সাধারণ শিষ্টাচারের বাণীও ফুটিলনা। সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রজত চৌধুরী বলিলেন—"আমায় ক্ষমা কর মিতা। আমার ভালবাসায় বিশ্বাস না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উপর দয়া কর মিতা—আমি বড় দুর্বল মানুষ। তুমি আমার পাশে না থাকলে আমার জীবন ধারণ করা ভার হয়ে উঠ্‌বে।"

"আমার ভুল ভেঙেছে।" মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে দৃঢ়ভাবে বলিল,—"না, সে হয় না—একবার যে ভেঙেছে সে আর জোড়া লাগে না। না, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারব না।"

মৈত্রেয়ী ঘর হইতে ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল।

রজত চৌধুরী স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পথে বাহির হইয়া গেলেন।

মুক্তি

পরমেশ রায়চৌধুরী

পরমেশ রায়চৌধুরী: জন্ম—উনিশ শ' সতেরো সালে খুলনা জেলার অন্তর্গত কাড়াপাড়া গ্রামে। পৈতৃক বাসভূমি—মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর। ছাত্রজীবন—বহরমপুর ও কলিকাতা। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ও আইনের ছাত্র।

গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে স্বদেশী যুগের প্রবাহ বয়ে চলেছে। অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেশের অগণিত যুবশক্তি। অনিমেষ পারল না ঘরে থাকতে। ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের কাজে। ফলে তাকে কারাবরণ করতে হল।

অনিমেষ রায় বনেদী ঘরের ছেলে। তার পক্ষে জেলে যাওয়াটা একটা গৌরবের কথা।

গৃহে তার সুন্দরী বধূ অচলা। এই বিয়ের একটু ইতিহাস আছে।

অনিমেষ চেয়েছিল বিয়ে করে সে সংসারে বন্দী না হয়। অবশেষে পিতামাতার কাতর অনুরোধ রক্ষা করতে সে বিয়ে করল ধনীর দুলালী অচলাকে।

অচলা সুন্দরী, বিদুষী, স্নেহপ্রবণ, কর্তব্যপরায়ণ মন তার। অচলা নিজগুণে স্বামীর বহির্মুখী বিবাগী মনটাকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করতে পেরেছিল, অচলার ভালবাসায় অনিমেষকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

যৌবনের সহজাত ধর্ম হচ্ছে মিলন। এই মিলনই হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর জীবনের পূর্ণতা। জীবনের যত সুখ স্বচ্ছন্দ নির্ভর করে এক পূর্ণাংশ দাম্পত্য ভালবাসায়।

পরমেশ রায়চৌধুরী

অচলার আনন্দের দিন।

নব অতিথির শুভ পদার্পনে মন খুশীতে ভরপুর। মাতৃত্বের সলাজ আনন্দ আজ তার মনে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে—অনুরণিত হচ্ছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল ঐ নবজাত সুন্দর শিশুটিকে পেয়ে।

ঠিক এমনি সময়ে দেশে একটা প্লাবন এল স্বদেশী যুগের। দেশের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশ মাতার আহ্বানে।

অনিমেষের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে পারল না ঘরে বসে থাকতে—তার অন্তর সাড়া দিয়ে উঠল দেশের ডাকে। অচলার ভালবাসা তাকে গৃহকোণে বন্দী করে রাখতে পারল না। সন্তানের কথা মনে এলেও সে বড় কর্তব্য মনে করল, দেশের সর্বহারাদের দুঃখ দূর করার কাজ।

আজ সে জেলখানার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী। এখানে এসে মনে পড়ছে অচলার কথা। সংগে সংগে চোখের সমুখে ভাসে সন্তানের সুন্দর মুখখানি। স্বেচ্ছায় সে এই দুঃখকে বরণ করে নিয়েছে মাথায়। তার আত্মদান দেশের কাছে একটি বড় দান বৈকি! এখানে তার একটি বছর কেটে গেছে।

সেদিন সে শুনেছে অচলার অসুখ। মুক্তি তাকে সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হল।

তখন অচলার জীবন-পথ নূতন অধ্যায় রচনা করে চলেছে। অচলা পরলোকের যাত্রী। সকল মায়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলেছে সে এক অজানা দেশে। অনিমেষ এল তারপাশে। বেশী কিছু বলতে পারল না। অনিমেষের পায়ের ধুলো

সে নিল। বেদনার অশ্রুসজল চোখে অনিমেষকে ক্ষীণকণ্ঠে বলল;—খোকা রইলো—

তারপর চিরদিনতরে সে বিদায় নিল।

হয়ত এইটুকু বলার জন্য অচলা এতদিন বেঁচেছিল।

অনিমেষ তুলে নিল কুসুম কোমল স্নেহ পুত্তলী অচলার শেষ দান।

অনিমেষ মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছে—অচলার অভাব।

যতই সে ভাবে ততই মনে হয় অচলাকে সে সুখী করতে পারে নি। তার ন্যায্য পাওনা তাকে দিতে পারে নি। একমাত্র খোকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তার অপার স্নেহ প্রবণতা। খোকার আধ আধ ভাষা অনিমেষকে করে তোলে বিচলিত, করে তোলে আপনহারা।

আনমনে সে অচলার কথা ভাবে।

চোখ দুটি ভরে ওঠে জলে।

দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গালের দু'পাশ বেয়ে পরে।

অনিমেষের এই অভিশপ্ত জীবনের মুক্তি কোথায়?

বিষণ্নসন্ধ্যা

অমরেশ দত্ত

অমরেশ দত্ত : জন্ম—তেরশ' ছাব্বিশ সালে শ্রীহট্টজেলার করিমগঞ্জ মহকুমার ঈশ্বরশ্রী গ্রামে। পৈতৃক বাস—শিলচর। ছাত্রজীবন—শিলচর ও কলিকাতা। বর্তমানে কলিকাতা সিটি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

ইজিচেয়ারের উপর নিশ্চিন্ত আরামে গা এলাইয়া দিয়া বসিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ছুটিতে বেড়াইতে আসিয়াছি। এই নূতন পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে ঘনাইয়া আসা অন্ধকার দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইতে ভাল লাগিতেছিল। এই ছুটিতে ছোট বোনটিও অনেকদিন পর শ্বশুর বাড়ী হইতে দাদাকে দেখিতে ও বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহার চাঞ্চল্যে এই ছোট জনবিরল বাড়ীটি সরগরম। সুষি অর্থাৎ সুষমা ছোটবেলা হইতেই ভীষণ চঞ্চল—নির্ঝরিণীর মত মুক্ত জীবনানন্দে পূর্ণ—যেখানেই যাক্ জমাইয়া থাকা তাহার স্বভাব। আজ সে সন্তানের জননী, তবুও তার এ চপলতা গেল না। পাশে রান্না-ঘরে বৌদির সংগে তাহার কথা ও হাসির ফুলঝুরি ছুটিয়াছে। আশ্চর্য! তার বৌদিও এত অস্বাভাবিক চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সেই নিতান্ত সাদাসিদা সহজ মেয়েটি।

সুষি আমার মাত্র বছর দুয়েকের ছোট। একসংগে সমবয়সীদের মত আমরা মানুষ হইয়াছি। কেবল কালের ব্যবধানে নানা বাধা বিপত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে আমি আজ গম্ভীর, স্থির, শান্ত, কিন্তু সে যেমনটি ঠিক তেমনটিই আছে। ছোটবেলার সেই সমবয়সী সংপর্ক সুষি আজও ঠিক রাখিয়াছে। একদা সুষি ছিল আমার অন্তরতম

বন্ধু—তারপর অনেকদিন পরের দেখা সেই বন্ধুত্বের নিবিড়তাকে আজ আবার নূতন করিয়া অনুভব করিতেছি।

ঃ 'দাদা', সুষি কখন নিঃশব্দে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টেরই পাই নাই। ঃ 'কবিতার কথা ভাবচো ত—এক কাপ চা হ'লে মাথাটা খুলবে ভাল—খাবে চা?'

ঃ 'না, তোরা আমাকে অস্থির না করে ছাড়বি না।' ঝাঁঝাল স্বরের প্রতারণা করিয়া কহিলাম ঃ 'বসেছি, আর অমনি তোদের মনে হ'তে লাগল আমি কবিতার কথা ভাবতে বসেচি। কেন আমার কি আর কোন কাজ নেই?'

ঃ 'আচ্ছা নাও, তোমার বক্তৃতা করতে হবেনা। চা খাবে কি না বল?' সুষি আমার কথার আসল সুরটি ধরিতে পারিয়াছে।

তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া গিয়া চা লইয়া হাজির ঃ 'নাও, এবার তোমার যত খুসী কাব্য কর, তোমাকে আর জ্বালাতে আসব না।'

হন্‌হন্‌ করিয়া সুষি চলিয়া গেল।

তারপর আমি আবার তেমনি অলস ভাবে বসিয়া আছি। হঠাৎ সামনে দিয়া একটী নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি ঘরের ভেতর ঢুকিতেছে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এ সুষির কাণ্ড ভাবিয়া পর মুহূর্তেই আবার তেমনি দূরের দিকে প্রসারিত করিয়া চাহিতেছি এমন সময় সুষির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর কানে আসিল ঃ 'দাদা, দাদা কে এসেচে দেখ?' ফিরিয়া চাহিতেই দেখি একটা ঘোমটা আবৃত মেয়েকে আমার দিকে প্রায় টানিয়া লইয়া আসিতেছে। তারপর বৌদিকে বাতি আনিবার কথা বলিয়া নিজেই একটা বাতি লইয়া হাজির। মেয়ে মূর্তিটী ততক্ষণে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমি আকস্মিক বিস্ময়ে প্রায় চমকাইয়া গিয়াছি। ঃ 'তুমি! তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? তারপর ভাল আছো ত?' এক সংগে এতগুলি প্রশ্ন করিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়াছি।

মেয়েটি প্রত্যুত্তরে শুধু হাসিল। সেই হাসি যাহা আমার কত দিনের চেনা। সে হাসিতে আমি কতদিন বিহ্বল হইয়াছি। তারপর স্বাভাবিক ভাবে কহিতে চেষ্টা করিল ঃ 'আমরা এসেচি অনেকদিন—আর এই ত পাশের বাড়ীতেই থাকি। আমি কী জানতাম তুমি এই বাড়ীতে থাক? তুমি এতটা মুসড়ে যেতে পার, তাই বা কি করে জানব বল? আজকে কথায় কথায় তোমার নামটা বেরিয়ে পড়ল। নইলে হয়ত দেখাই হত না—কালকেই আমরা চলে যাব কিনা?'

ছোট্ট একটা 'হু' দিয়া প্রতুত্তরের কাজ সারিলাম।

তারপর অনেকগুলি মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। সুষিকে কহিলাম ঃ 'যা তোর বৌদির সংগে পরিচয় করিয়ে দে।' তারপর সুষিকে কোন অবসর না দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি ঃ 'ফুল, ফুল দেখ এসে, কে এসেচে ওখানে, চুপটি করে বসে আছে?'

সুষি তাহাকে রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল।

হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—এই আকস্মিকতার আঘাত হঠাৎ সামলাইয়া লইতে পারিতেছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে বদলাইয়া গিয়াছি—কোথায় বা সেই নিশ্চিন্ত আরাম আর কোথায়ই বা সেই ভাববিহ্বলতা। অন্তহীন চিন্তা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সুষি, কি ভীষণ মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! এতদিন পর বন্ধুর সংগে দেখা কেনইবা করিবেনা। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল—সুষি এবং

প্রতিমার বন্ধুত্বের কথা বিশেষ করিয়া। একজনের সংবন্ধে কোন মন্তব্য করিলে আর একজন রাগিয়া কাঁদিয়া কী অদ্ভুত কাণ্ডই না করিয়া বসিত! দিনরাত্রি একজন আর একজনকে কাছে পাইলে যেন আর কিছুই চায় না। কোন দিন যে তাহাদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠিবে—একথা ভাবিতেও তাহারা ব্যথা পাইত। কিন্তু তবুও ব্যবধান ঘটিয়াছে। জীবনের টানে দুইদিকে যখন দুইজন ছিটকাইয়া পড়িল তখন অন্তরটা ব্যথায় যতই না মোচড় খাইয়া উঠুক বাহিরে ইহাকে লইয়া ক্ষোভ করিবার অবসর তাহাদের ছিলনা। আজ দুজনেরই জীবনের গতিই নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে তাই একটা নিবিড়তার রেশ আজ মিলাইয়া যায় নাই। কিন্তু যাক এসব কথা। সুষির মারফতেই প্রতিমার সংগে আমার প্রথম পরিচয়। তারপর পরিচয়টা ক্রমে খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। হ্যাঁ, সেই ভালবাসা এত গভীর যে বলা চলে না। আরও বছর সাতেক আগে আমাদের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের কাল যবনিকা টানা পড়িয়া যাইবে একথা কল্পনাও করিতে পারি নাই। আজকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ব িয়া সেই সমস্ত খুটি-নাটি বিচিত্র অনুভূতি একে একে মনে পড়িতে লাগিল।

পাশে শোবার ঘরেই প্রতিমা কথা কহিতেছিল। তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। অনেকদিন তাহার কথা শুনি নাই।

ঃ 'তোমার নাম ফুল বুঝি? বেশ নামটী তো!' প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিতেছে অতসী অর্থাৎ স্ত্রীকে।

ঃ 'দূর, তাই বুঝি! আমার নাম হচ্ছে অতসী। তবে উনি আমাকে 'ফুল' বলে ডাকেন,—বলেন সব্বাই যে নামে ডাকে সে নামে তোমাকে

ডাকতে ভাল লাগে না।' অতসী বেশ স্বাভাবিক সুরে কথা কহিতেছে।

প্রতিমা উত্তর করিল না—শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। কোন হারানো কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে হয়ত।

খানিকটা নীরব অবসর। সুষি কী জানি কেন হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। নীরবতা ভংগ করিয়া অতসী কহিলঃ 'আপনার কথা এত শুনেছি ওঁর কাছে—প্রায়ই আপনার কথা বলেন। তখন আমার ভারী দুঃখ হয়—আপনাদের এরকম ছাড়াছাড়ি হওয়াটা মোটেই উচিত ছিল না।' আশ্চর্য! অতসী এরকম কথা কহিতে পারে। আমার কথা শুনিয়া শুনিয়া যে গোপন ইচ্ছা তাহার অন্তরে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল কোনদিন ত আমাকে এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলে নাই। হয়ত ইহার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু তবুও এরকমটি সে বলিতে পারে তাহা যে আমার ধারণারও অতীত!

ঃ 'তোমার হিংসা হত না?' প্রতিমা অদ্ভুত ভাবে প্রশ্ন করিল।

ঃ 'বাঃ রে! হিংসে হ'বে কেন আবার!' বুঝিলাম অতসী কথাটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। সুষির এ প্রসংগ হয়ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের এই বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনেও যে একটা বেদনা জাগিয়া নাই তাই বা কে জানে। অন্য প্রসংগে তাই সে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরাইল। আমার আর ইচ্ছা ছিল না কান পাতিয়া থাকিবার। মনটা কেমন যেন ব্যথাতুর হইয়া উঠিয়াছে। বিগত দিনের অনেক কথা যা এতদিন বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়িয়াছিল—আজ তাহারা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি সেই চিন্তার মাঝখানে নিজেকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিয়াছি। হঠাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল আবার তেমনি করিয়া

বিষণ্ণসন্ধ্যা

প্রতিমার সংগে কথা কই। দুইজনে মুখোমুখী বসিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করি। আবার সে পুরানো নাম ধরিয়া ডাকি : 'ছন্দা গো তুমি আমার জীবনের ছন্দ।'

অস্থির হইয়া উঠিলাম। অতীত তাহার পুঞ্জীভূত স্মৃতির ডানা মেলিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে! মনে হইল আমি ঠিক তেমনটী রহিয়াছি—ছন্দার দীপ তেমনি চঞ্চল—তেমনি প্রেমবিহ্বল। মাঝখানের এই ব্যবধানে শুধু একটা মিথ্যা মায়া। একমাত্র সত্য সেই দীপ-ছন্দার উচ্ছ্বসিত জীবনানন্দ। অবলীলাক্রমে ভুলিয়া গেলাম। ছন্দা আজ আর তেমনটি করিয়া বাঁচিয়া নাই। সে আজ বিবাহিত, গৃহিণী—প্রৌঢ়ত্বের আবছায়া তাহার দেহের আড়ে ঘনাইয়া আসিতেছে।

অসহ্য ঠেকিতেছিল, হঠাৎ ডাকিয়া উঠিলাম : 'ছন্দা—ছন্দা।'

প্রতিমা চমকাইয়া উঠিল কিনা জানিনা—কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

: 'এসেচ?' আবেশের ঘোরে কহিলাম: 'বস, হ্যাঁ, এখানে ঠিক আমার পাশটিতে বসো।'

নির্বিকার ভাবে প্রতিমা বসিল।

: 'ছন্দা, মনে পড়ে সেই অতীত দিনের কাহিনী?' আমি আবেগ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলাম।

প্রতিমা কথা কহিল না। নিরুত্তরে মুখ নামাইয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু আমি তেমনি ভাবে কথার জের টানিয়া লইয়া চলিয়াছি : 'আচ্ছা ছন্দা, আমাদের জীবনের এ'সবের কিছু প্রয়োজন ছিল কি? এতখানি নিবিড় মাখামাখি তারপর এতবড় একটা দুঃসহ বিচ্ছেদ। তুমি বলবে এ আমাদের অদৃষ্ট—কিন্তু তাই কি সত্যি, এর জন্যে আমরা নিজেরা কী দায়ী নই? তুমি চিরদিন থাকলে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে।

তোমার ভালবাসার সম্পদকে অন্ধের মত তুমি দিলে ভাগ্যদেবতার পায়ে সঁপে। আর আমাকে পংগু করে রাখল দারিদ্র। কিন্তু তবুও ত আমি এগিয়ে এসেছিলাম, যেমন করে হ'ক একটা কিছু জোগাড় করে নিতে পারতাম যেমন আজ পেরেছি। কিন্তু তুমি আমার ডাকে সাড়া দিতে পারলে না। তুমি ছিলে সমাজ ভীরু, দুর্বল। হয়ত তুমি আজ অনেক সুখেই আছ। আমার জীবনের সংগে বাঁধা পড়ে গেলে আর এতটা আনন্দ হয়ত তুমি পেতে না। তুমি আজ একজন বিশিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী। তোমার চারিদিকে আজ স্বাচ্ছন্দ, জীবন উপভোগের প্রচুর অবসর। অথচ আমার 'ফুলের' দিকে চেয়ে দেখ অসংখ্য কর্ম-ব্যস্ততা নিয়েই তার জীবন। কিন্তু তবু এমনি করে পেছিয়ে পড়াটা তোমার উচিত ছিল না।'

প্রতিমার সংগে বিচ্ছেদের পরেই অনেকদিন এই কথাগুলি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম; কোন দিন মনের এই গোপন কথাটুকু প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিবে ভাবি নাই। যদিও এর জন্য প্রায়ই মন আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিত। কথাগুলি সম্পূর্ণ অভিমানের মত শুনাইল—সেই চিন্তার সুর ইহাতে যেন হুবহু জড়াইয়া আছে। খানিকটা থামিয়াছিলাম, হঠাৎ প্রতিমা কহিল: 'এই হয়ত ভালই 'হ'ল দীপ; ঘনিষ্টতম সংস্পর্শে এলে আমাদের এ ভালবাসার সৌন্দর্য হয়ত অনেকখানি নষ্ট হয়ে যেত। তুমি কি মনে কর আমাদের ভালবাসা মরে গেছে? আমার ত কখন তা মনে হয়না, দৈহিক মিলনকে তুমি ভালবাসা বলবে?' প্রতিমার কথা গুলি তার্কিকের মত শুনাইতেছে।

উঃ! কী আবেগহীন, দরদহীন! তাহার কথাগুলিতে রাগিয়া উঠিতেছিলাম।

: 'কিন্তু ছন্দা, একথা গুলো তুমি আজকেই বলতে পারলে, যথাসম্ভব

আত্মগোপন করিয়া কহিলাম: 'বিয়ের আগে বলতে পারতে না আর বল নি, কিন্তু ভালবাসা কি তা নিয়ে তর্ক করে কি লাভ বল। তুমি যে সুখে আছ সেই যথেষ্ট।' কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করিলাম, আর জের টানিয়া চলিতে অসহ্য লাগিতেছিল।

কিন্তু প্রতিমা থামিতে দিল না: 'আমাদের এ বিচ্ছেদের অন্য কারণও ত ছিল। আমি তোমাকে যেমন ভাবে নিঃশেষে আপনার করে চেয়েছিলাম তুমি কি আমাকে তেমনি করে চেয়েছিলে?'

: 'ছন্দা, আমিই তোমাকে সত্যি করে চেয়েছিলাম, আমি জান্‌তাম্ তুমি আর যাই হও মানুষ, তোমাকে নিয়ে যতই না কেন কল্পনার জাল বুনি—কখনও একথা ভুলে যাইনি—তুমি নারী! এই হয়ত আমার অপরাধ। আর তুমি আমাকে বসিয়েছিলে দেবতার আসনে—বিশ্বের বিশাল জীবনস্রোত হ'তে তুমি আমাকে টেনে নিতে চেয়েছিলে স্বার্থপরের মত, কেবলি তোমার দিকে, জীবনের পথে তুমি আমায় অনুপ্রেরণা দাওনি এগিয়ে দেবার—টেনেছ পেছন পানে। কিন্তু এত আমি তোমার কাছ থেকে চাইনি। কিন্তু ছন্দা, তবু আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ! অনেক কিছু আমি পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। চির জীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কার কথায় কি এসে যায় ছন্দা, আমার কাছে মনটাই সব। কিন্তু এটা ঠিক—প্রেম, ভালবাসা যাই বল না কেন, মানুষের জীবনধর্ম'ই সবচেয়ে বড়। জীবনের গতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে একান্ত কাউকে তুমি পাবে না—পেত পার না। একথার খানিকটা হয়ত তুমি বুঝতে পেরেছ। না পারলেও একদিন বুঝবেই—আমাদের চাওয়া আকাংখা সবই জীবনের খাতিরে। কিন্তু যেতে দাও এসব কথা, কী দরকার

মিছামিছি বকে মরার। কাজের কথা বলি, তারপর হ্যাঁ, তোমার খবর টবর কী? ছিলে পিলে হয়েচে তো? মিঃ সেন ভাল আছেন নিশ্চয়ই?' অন্যকথায় পিছলাইয়া পড়িবার অদ্ভুত চেষ্টা করিলাম—আবার যেন হুবহু বদলাইয়া গিয়াছি।

প্রতিমা কোন কথা কহিল না। প্রত্যুত্তরে মুখ নামাইয়া কী যেন চিন্তা করিতে লাগিল। আমার শেষের কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

ঃ 'কী মিসেস সেন? হাসি টানিয়া কহিলাম ঃ 'চুপটি করে বসে রইলে যে, কথাবার্তা একটু বলই না ছাই! হ্যাঁ, তারপর তোমরা কালকেই যাচ্ছ বুঝি?

ঃ 'আচ্ছা দীপ,' ছন্দা হঠাৎ বলিয়া উঠিল ঃ 'একবার ভুল হলে কী জীবনে কখন তা শুধরে নেওয়া যায় না?' একী কথা! আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছি! কিন্তু প্রতিমা তেমনি বলিয়া চলিয়াছে ঃ 'দীপ, আমি বুঝেছি তুমি যা বলেচ আমি তা ঠিক বুঝতে পেরেচি। দীপ, আজকে কী তোমার কাছে কোন দাবী জানানো চলে না? আমায় তুমি নাও দীপ!' আবেগে, উচ্ছ্বাসে প্রতিমা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমার হাতখানি সে নিবিড় আবেশে চাপিয়া ধরিয়াছে।

ঃ 'না ছন্দা.' উদাসীনের মত কহিলাম ঃ 'আজ আর তা হয় না। মিঃ সেনের কাছ থেকে তুমি চলে আসতে পার হয়ত, কিন্তু আমার 'ফুল'কে আমি এতটুকু আঘাত দিতে পারবনা।'

তারপর একটা সংকীর্ণ নীরব অবসর।

প্রতিমা ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি সরাইয়া লইল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল ঃ 'ও! সর্বনাশ, আটটা বেজে

গেল বোধ হয়। মিঃ দত্তের ওখানে যে আজকে আটটায় চায়ের নেমন্তন্ন। এই ছ্যাখ ভুলেই গেচি! আমার ত আর এখন কিছুতেই অপেক্ষা করা চলেনা। আচ্ছা, তা হলে আসি মিঃ ঘোষ, নমস্কার।'

হন হন করিয়া প্রতিমা চলিয়া গেল। তাহার কথাবার্তায় এতটুকু অস্বাভাবিকতার রেশও খুঁজিয়া পাইলাম না।

অবাক বিস্ময়ে ইজিচেয়ারের উপর আবার গা এলাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িয়াছি। আমি অনেকটা স্তম্ভিত—তন্ময়।

ঃ 'দাদা, প্রতিমা চলে গেছে?' সুষির কথায় চমক্ ভাঙিল।

'হু।'

ঃ 'দেখলে, আমার সংগে একবার দেখাটা পর্যন্ত করে গেল না! এদিকে চা নিয়ে আমরা বসে আছি।'

সুষির অভিমানের কথাগুলি এই নিঃশব্দ রাত্রির বুকে গুমরাইয়া উঠিল।

বৈচিত্র

হরেন বসু

হরেন বসুঃ জন্ম—তেরশ' তেইশ সালে খুলনার বাগেরহাট মহকুমার বিছট গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান—খুলনা, ঘাটভোগ গ্রামে। ছাত্রজীবন—খুলনা, দৌলতপুর। বর্তমানে ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট আছেন।

বেলা সাতটা।

নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলাম। জমিদার বাড়ীর কাছে আস্‌তেই অনেকগুলো লোকের ব্যগ্র ও ব্যস্ত কলরব কানে যেতেই এগিয়ে গেলাম একটু দ্রুতপদে। গেটের কাছে পৌছে দেখলাম প্রশস্ত চত্বরে বহুলোক জমা হ'য়ে পড়েচে, কারও কারও হাতে লাঠি সোটা ইত্যাদি সাধারণ মারণ অস্ত্র।

ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

জমিদার সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে নীচে ফরাসের উপর এসে বসেছেন। তন্দ্রার আবেশ তখনও তার চোখে মুখে পরিস্ফুট। হঠাৎ একটা বিরাট গোখ্‌রো সাপ তক্তপোষের পায়ে লেজ জড়িয়ে সুবিশাল ফণা উদ্যত ক'রে জমিদার বাবুর ঠিক সম্মুখে উদয় হয়েচে, ভয়ে জমিদার বাবুর মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গ্যাছে—আর লোকগুলো চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, সবারই মুখে চোখে ফুটে উঠেছে আতংকের ছাপ। একটা কিছু কোরবার জন্যে সবাই ব্যগ্র, কিন্তু কি যে কোরবে কিছুই তারা ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছে না। সাপটাকে মেরে ফেলবার কোন সুযোগ নেই, সে এমন কৌশলে জড়িয়ে আছে যে তাকে আঘাত করা খুব নিরাপদ নয়। যদি আঘাত ব্যর্থ হয় তাহলে জমিদার বাবুর প্রাণবায়ু যে এক ছোঁবলেই উড়ে যাবে এ সুনিশ্চিত। উপস্থিত বীরকুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন

কথা বলা দূরে থাক্, জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও তাদের সাহস হচ্ছে না। এদিকে কিন্তু নাগরাজ তার বিরাট ফণা জমিদার বাবুর সাম্‌নে ইতস্ততঃ আন্দোলিত করছে!

হঠাৎ দোলন থামাতেই সবার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—'গেল, গেল'। ঠিক এমনি সময় দেখা গেল একজন লোক ভিড় ঠেলে বেরিয়ে দ্রুত সাপটির কাছে গিয়ে অদ্ভুত কৌশলে তার ফণা ধরে ফেল্‌ল। তারপর সাপটিকে বাইরে এনে লেজটি পা দিয়ে চেপে ধরে একটা টান দিয়ে তার গলা ধরে আস্তে আস্তে বার হ'য়ে গেল। সবাই বিস্মিত আতংকে এতক্ষণ এই ব্যাপার দেখছিল। সম্বিৎ ফিরে পেতে দেখা গেল লোকটা কোন্ ফাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গ্যাছে। একটু পরে ভীড়ের ভেতর থেকে একজন বলে উঠলো—'পাগলের খেয়াল! ভাল লোকের কি একাজ করা সম্ভব হ'তে পারে?'

আর একজন বল্‌ল—'পাগল হোক্ আর যাই হোক্, ও না এসে পড়লে জমিদার বাবুর প্রাণরক্ষা হ'ত না একথা খুবই সত্যি!'

পাশ থেকে একজন বৃদ্ধ বল্‌লেন—'ভগবান্ যদি রাখেন তা হ'লে মারে কার সাধ্য?'

সত্যিই লোকটার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! ওর সংবন্ধে জানবার জন্যে কৌতূহলও হ'ল, গাঁয়ের লোকের কাছে খবর নিয়ে এইটুকু মাত্র জানা গেল যে, সে একটা পাগল, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে হঠাৎ এগ্রামে দেখা যায়, এখানে এলে সে থাকে পঞ্চানন তলার শিবমন্দিরের বারান্দায়, খায় মাধব মণ্ডলের বাড়ীতে। আরও শুন্‌লাম—মাধবের মেয়ে লক্ষ্মী নাকি তাকে খুব যত্ন করে!

প্রায় দু'মাস কেটে গেল পাগলটার আর কোন খোজ নেই। যার

কাছে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে—'কৈ, তাকে ত আর দেখি না? একদিন মাধবের সংগে দেখা হ'ল রাস্তায়, তার কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু মাধবের সাথে দেখা হতেই মনে হ'ল—ওর কাছে হয়ত কোন খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। জিজ্ঞাসা করতেই মাধব যা বল্‌লে—মাস ছয়েক আগে ওই 'পাগলাটা' একদিন তার বাড়ীতে এসে খিদে পেয়েচে বলে কিছু খেতে চায়, তখন তার মেয়ে লক্ষ্মী তাকে ভাত এনে দেয় এবং সেই থেকে সে এ'গাঁয়ে আসলেই এখানে আসে। দুবেলা খাবার সময় ছাড়া অন্য সময় বড় তাকে কেউ দেখতে পায় না। জমিদার বাড়ীর ওই ব্যাপারের পর আর তাকে দেখা যায় নি।

দুপুর বেলা যাচ্ছিলাম মাধবের বাড়ীর পাশ দিয়ে কি একটা কাজে। বাড়ীর ভিতর চোখ পড়তেই দেখলাম উঠোনের এক পাশে একখানা ছোট্ট চটের ওপর একটা লোক বসে আছে। তার সামনে ভাতের থালা,—একখানি কলাই করা টিনের বাসন—আর লক্ষ্মী বাটীতে কি নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দেখেই বুঝতে পারলাম, যাকে এতদিন ধরে খুঁজছি এ-ই সে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে তার চেহারা সম্পূর্ণ দেখা গেল,—লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, তার কতকগুলো পেছনদিকে, কতকগুলো কানের ওপর, আর কতকগুলো কপালের ওপর দিয়ে এসে চোখ দুটো প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সেই চুলের ভেতর থেকেও দুটো বড় বড় কালো চোখ জ্বলজ্বল্ করছে,—মেঘের ফাঁক থেকে উজ্জ্বল তারার মত! আমি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। লক্ষ্মী বল্‌ছে—'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? ভাতটা ভাঙ, ডাল দিয়ে যাই।' সে মাথা নীচু করে' আস্তে আস্তে বল্‌ল—'রোজ কলাপাতায় খাই, আজ থালা কেন?' মৃদু হেসে লক্ষ্মী বল্‌ল—তাতে হয়েছে কি?'

তবুও সে ভাতে হাত দেয় না দেখে লক্ষ্মী বল্‌ল—'ওখানা মাজবে কে ভাব্‌ছ? নাও, তুমি এখন ভাতে হাত দাও ত দেখি।' সে একবার মাথা তুলে লক্ষীর দিকে চাইল তারপর নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ করল।

সেখানে দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখ্‌তে লাগ্‌লাম কিন্তু তার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে সে উঠোনটার এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। লক্ষ্মী তার হাতে জল ঢেলে দিলে। খাওয়া শেষ হ'লে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সোজা চল্‌তে লাগ্‌ল পঞ্চাননতলার দিকে। আমিও তার পিছু পিছু চল্‌লাম। শিবমন্দির কাছে এসে দাঁড়ালো। পরে ছোট একটা পুট্‌লী খুলে একখানা ময়লা ছেঁড়া চাদর সেখানে পেতে বসে পড়ল। তারপর পুঁট্‌লির ভেতর হাত দিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগ্‌ল। একটু পরে ছোট একখানা আয়নার মত কি বার করে এক মনে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার যেন কোন খেয়াল নেই। একটু পরে বল্‌লাম—'ওহে শুন্‌ছ?' সে চম্‌কে উঠ্‌লো। হাতের জিনিস্‌টা পুট্‌লির ভিতর রেখে দিয়ে আমার দিকে চাইল।

তখন জগার চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

আমি বল্‌লাম—'তোমার নাম কি?' তার ওষ্ঠ পুটে ম্লান হাসি ফুটে উঠ্‌ল। বল্‌ল—'কেন?'

'এমনি জিজ্ঞাসা করছি?'

'জগা পাগ্‌লা'—বলে আবার হাস্‌ল।

আবার একটা প্রশ্ন করে বস্‌লাম। কোন জবাব না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। উত্তর না পেয়ে অসহিষ্ণু ভাবে বল্‌লাম—'জবাব দিলে না যে?'

'আর একদিন বল্‌ব।' বলে সে পাশ ফিরল। আশ্চর্য হলাম! বল্‌লাম—মাত্র একটা কথার জবাব দাও। সেদিন জমিদার বাড়ীতে…' আমার কথা শেষ না হতেই সে আমার দিকে ফিরে হাত জোর করে বল্‌ল—'আমি একটা পাগল, আমার খোঁজে আপনার কি দরকার? আর যদি দরকারই হয় আর একদিন আস্‌বেন। দোহাই আপনার, এখন আমার ভাল লাগ্‌ছে না।' বলে সে আবার পাশ ফিরল। আমি অবাক হলাম!

ওর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে ফিরলাম্‌।

মাধব কোথায় ভাল ছেলের সন্ধান পেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে।

অনেকদিন পর জগার হঠাৎ আবির্ভাব হল। লক্ষ্মী বোধ হয় এতদিন তার পথ চেয়েই ছিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই সে জগার আহার্য একখানা থালায় সাজিয়ে হাজির হলো। জগা উঠোনে নেমে তার সেই আগের স্থানটিতে গিয়ে বস্‌ল। কিন্তু সে দিনের মত সে মাথা নীচু ক'রে খেতে পারলো না। এক একবার এদিক ওদিক চাইতে লাগ্‌লো। জগার কৌতূহলে লক্ষ্মীর গণ্ডস্থল কুমারী সুলভ ব্রীড়ায় আরক্ত হ'য়ে উঠেছে। জগা কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা না করে খাওয়ার মাঝে দু' একবার লক্ষ্মীর দিকে চাইতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ব'ললে—'এরপর তোমার খাওয়ার কি হবে? আমি ত আর থাক্‌বো না' সে খুব নীচু গলায় কথাগুলো বল্‌লে। কথাটা শুনে জগার মুখে প্রথমটা একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠ্‌লো। সে ভাতগুলো হাত দিয়ে নাড়তে লাগলো। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার অজানিতে।

তারপর মুখ তুলে চাইল লক্ষ্মীর দিকে। একটা ম্লান হাস্যে তার ওষ্ঠপুট একটু বিস্তারিত হয়ে উঠ্‌লো।

লক্ষ্মীর বিয়ের রাতে জগা খুবই কর্মব্যস্ত। সে যেন বাড়ীর একজন। যে যখন যেটা চাইছে জগা ছুটে গিয়ে এনে দিচ্ছে।

পরদিন।

বধূ বিদায়ের পালা।

বাইরে সজ্জিত পাঁলকীর পাশে চারজন বেহারা সজ্জিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁনাইয়ের করুণ সুর সবার মুখে ফুটিয়ে তুলেছে একটা বেদনার ছায়া। বরের পেছনে পেছনে লক্ষ্মী বার হ'য়ে এল ঘর থেকে। সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তার মুখখানি আবৃত। তবুও নির্লজ্জের মত কি যেন খুঁজে বেরাতে লাগলো কারও কথা তার কানে যাচ্ছে না এমনি তার ভাব। মন্থর গতিতে সে এগিয়ে চল্‌লো পালকীর দিগে। বর পাল্‌কীর ভেতর প্রবেশ করলো। লক্ষ্মী কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। অবগুণ্ঠন মাথার ওপর তুলে দিয়ে সে এইবার ভাল ক'রে চারদিকে চাইল। কিন্তু যাকে খুঁজ্‌ছে তাকে কোথাও দেখ্‌তে পেল না। লক্ষ্মীর মা ছুটে এল তার পাশে। মা ভাবলো—প্রথমবার শ্বশুর বাড়ী যেতে মেয়ের খুবই কষ্ট হ'চ্ছে। তাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে নানা রকমে বোঝাতে লাগ্‌লো। একটু পরে লক্ষ্মী নীচু হ'য়ে মাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে অস্তে আস্তে ব'ললো—'সেই পাগলাটা যদি আসে তাকে খেতে দিও।'

বধূ বিদায়ের পালা শেষ হ'লো।

জগার কোনই খোঁজ নেই। কেউ ব'লতে পারে না সে কোথায় গেছে। ভোর থেকে বৃষ্টি নেমেছিল। ঘরে বসে একখানা ইংরেজী নভেলের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। পাড়ার একটা ছেলে ছুটে এসে বল্লে—'হরেনদা, জগা বোধ হয় ম'রে গেছে!'

কথাটা কানে যেতেই চ'মকে উঠ্‌লাম। ছেলেটা বল্‌লো—'এই মাত্র ওপাড়ার রমেশ দেখে এসেছে; শিবমন্দিরের বারান্দায় জগা শুয়ে আছে।'

বই বন্ধ করে বেড়িয়ে এলাম।

সত্যি মরে গেছে। কিন্তু মৃতের মত তার মুখের চেহারা নয়। মুখখানায় যেন তখনও হাসি মাখানো আছে, কিন্তু তার সর্বাংগে কে যেন নীল কালি ঢেলে দিয়েচে বলে মনে হ'ল। অনেক লোক জমে গিয়েছিল তাকে দেখতে। সবাই বল্লে—'কোথায় গিয়েছিল সাপ ধর্তে, সাপের ছোঁবলে এরকম নীলবর্ণ হ'য়ে গেছে।'

আমি এদিক ওদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। দেখ্‌লাম একটু দূরে সেই পুঁটুলীটা প'ড়ে আছে। একজন লোককে ব'লতে সে সেটা এনে খুলে ফেলতেই দেখা গেল—ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভর্তি। সে গুলো নাড়াচাড়া কর্তে একটু পরে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো ছোট্ট একখানি ফটো—দু'জনের ছবি একসংগে, একজন জগা, আর একটী মেয়ে। ছবিটি দেখে আমার পাশ থেকে একজন ব'লে উঠ্‌লো—'এ আমাদের মাধবের মেয়ে লক্ষ্মী না!'

আমি তখন ছবিখানি হাতে করে একান্ত ভাবে দেখছিলাম। ভিড়ের ভেতর কে একজন ব'লে উঠ্‌লো—'হয়ত ওরই বৌ হবে।'

স্পর্শদোষ

অদ্বৈত মল্ল বর্মন

অদ্বৈত মল্ল বর্মন: জন্ম—তেরশ' বিশ সালে, ত্রিপুরা জেলার গোকনঘাট গ্রামে। পৈতৃক বাসস্থান—ত্রিপুরা, গোকনঘাট গ্রামে। ছাত্রজীবন—ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় ও কুমিল্লায়। বর্তমানে 'নবশক্তি' সম্পাদনা করছেন।

দরিদ্র হওয়াটাই কষ্টকর নয়। দারিদ্রের কুয়াশার ফাঁক দিয়া প্রাচুর্যের প্রতি ব্যর্থ চাহনিটাই জ্বালাময়। যে মানুষ সারাদিনের উপার্জনের সংবল দুইএক বোঝা তাচ্ছিল্য ও অনাদরের সহিত দুইএক পয়সা লইয়া শহরের খোলা রাস্তা দিয়া নির্বিকারচিত্তে পথ চলিতে পারে, তাহাকে দেখিয়া আমাদের দৃষ্টি বেশী ভারাক্রান্ত হয় না, মনও বেশী পীড়াবোধ করে না—মনে হয় শহরেরই সে একটি অপরিহার্য অংগ। কিন্তু যে-ব্যক্তি কৃচ্ছ্রতার ছিটানো কালির তিলক পরিয়া ও বুকজোড়া বুভুক্ষা নিয়া কাঁচের দরজার ফাঁকে রেস্টুরেন্টের সুখাদ্যের দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া কিছুকাল কাটাইয়া দেয়—তাহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা খচ্ করিয়া উঠে বৈকি!

পল্লীর যে-বধূ শাশুড়ীর গঞ্জনামাত্র ভক্ষণ করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত উদরটাকে দিনের পর দিন শূন্য রাখিয়া নির্বিবাদে চলে—তাহাকে দেখিয়া যতটা ব্যথা না পাই, যে-বৌ শাশুড়ী-রক্ষিত সুখাদ্য চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে সে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে বেশী।

অভাব লইয়া যাহারা বাঁচে, অভাব তাহাদের গা-সহা। বৈদান্তিকের তাহারা নির্মল প্রশংসার অধিকারী। অভাব লইয়া যাহারা কাঁদে মানুষের বুকে দেয় তাহারা আঘাতের পর আঘাত।

কে জানিত উপরের কথাগুলি দুইটি জীব অন্তত, তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া ছাড়িবে।

বুভুক্ষা শুধু উদরের নিজস্ব জিনিষ নয়। মনেরও বুভুক্ষা বলিয়া একটা কিছু আছে। মনের বুভুক্ষা চাহে প্রেম, প্রেম চাহে স্পর্শ—বাস্তব জীবনে ইহাই স্বাভাবিক। আবার কালির আঁচড়ে যাহারা চরিত্র সৃষ্টি করে, আচম্কা প্রচণ্ড স্পর্শ হইতে প্রেম ও প্রেম হইতে বুভুক্ষার উন্মেষ—তাহাদের নিরূপিত এই সিদ্ধান্তও অনেক সময় বাস্তবক্ষেত্রে চোখে পড়িয়া যায়।

নিউপার্ক স্ট্রীটের উত্তর দিকের ফুটপাথ আর বাঁ-দিক হইতে আগত একটি অতি সরু গলি—তারই সংযোগস্থলে দুই প্রাণীর অভাবিত সংঘর্ষ গুটিকয় দর্শকের মনে যে অদ্ভুত হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নিতান্তই সাময়িক।

ফুটপাথ দিয়া একজন যাইতেছিল রাস্তার পাশের গাছের মাথায় কচিকিসলয়ের উপরে অকালবর্ষণের আয়োজনের দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে। অন্যজন আসিতেছিল বাঁ-দিকের সরু গলি হইতে অতিবেগে ছুটিতে ছুটিতে, সম্ভবতঃ পশ্চাদ্দিক হইতে তাড়িত হইয়া। উভয়েই আত্ম-অসংবৃত। তাহাদের একজনের হাঁটুতে এবং অন্যজনের থুত্‌নিতে লাগিয়া গেল প্রচণ্ড ধাক্কা। তাহাদের একটিকে কুলী মজুর বা ভিখারী, বেশভূষা দেখিয়া ইহাদের যে-কোন একটি ভাবিয়া নেওয়া যায়। নাম কাহারও জানা থাকিবার নয়। ইচ্ছামত ভজা বলিয়া ধরিয়া নিলেও কাহারও আপত্তি উঠিবার নয়। অন্যটি একটি কুকুর। বড়লোকের বাড়ীর নয় যে, আদর করিয়া একটা ভাল নাম দিবে। নিতান্তই পথের খেঁকী কুত্তা। দর্শকদের উচ্চ হাসির মধ্যে ইহারা বড় অপ্রস্তুত হইল।

খেঁকী তাহার লম্বা থুত্‌নি নীচু করিয়া প্রশস্ত ফুটপাথ ধরিয়া ভজার সোজা পশ্চাতের বিপরীত দিকে চলিল। একটু দূরে আসিয়া সে ঘাড় বাঁকাইয়া সংঘর্ষের সাথীকে বার বার দেখিয়া দেখিয়া চলিল। সংঘর্ষের চোটে সে কিঞ্চিৎ দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল।

স্তম্ভিত ভজাও হাঁটুর আঘাতের স্থানে একটু হাত বুলাইয়া লইল এবং খেঁকীর দিকে চাহিতে চাহিতে গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। পার্ক স্ট্রীট যেখানে সার্কুলার রোডে মিশিয়াছে তাহারই নিকটে একটি জনবিরল স্থানে গাছের ছায়াটি দূরাগত আলোর অত্যাচারে আবছা ফ্যাকাসে হইয়া উঠিয়াছে। শ্রান্ত ভজা মাথার মোটটা নামাইয়া বসিয়া পড়িল। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কাগজের কুচি সংগ্রহ করিয়াছে সে। দীর্ঘ দিনের সঞ্চয়ের পাশে হয়ত সে সংকীর্ণ গরমের রাত্রিটা কাটাইয়া দিবার জন্যই বসিয়াছে। পথের মালিক তো ইহারাই!

মোটের একদিকে খাবারের একটি ঠোংগা গুঁজিয়া রাখিয়া ভজা অদূরের দুইতিনখানা খাবারের দোকানের সামনা দিয়া ঘুরিয়া আসিতে গিয়াছিল। মোটের সন্নিকটে দ্বিতীয় প্রাণীর আগমন তাহার সন্ধানী দৃষ্টি দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেঁই হেঁই করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া সে অপহারকের মুখ হইতে খাবারের ঠোংগাটি উদ্ধার করিয়া লইল। চাহিয়া দেখে—একদা দেখা সেই লম্বা থুত্‌নী। বিকট ধমক খাইয়া খেঁকী নড়িল। কিন্তু অল্প একটু দূরে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

খেঁকীর লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে দেখাইয়া দেখাইয়া ভজা সব খাবার শেষ করিয়া ঠোংগাটা খেঁকীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিতেই খেঁকী সশব্দে

ভজার দিকে আক্রমণের সবকয়টি চিহ্ন প্রকটিত করিয়া ছুটিয়া আসিল।

ভজা টুকরা কাগজের মোট ছুঁড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। খেঁকীর যুদ্ধের নেশা কিন্তু কমে নাই। দ্বিগুণ বিক্রমে সে স্বভাবসুলভ শব্দ করিয়া উঠিল। ইহার পর ভজাকে এমন এক ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা গেল—এমন এক রূপ পরিগ্রহ করিতে দেখা গেল যে, ইহাতে খেঁকী প্রথমটায় হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে পারিল না। আক্রমণে শক্তিসঞ্চয়ের পূর্বে সে অপ্রস্তুত হইয়া তিন পদ পশ্চাদপসণ করিল। ভজা গোড়ালী কোমর পর্যন্ত নত করিয়া কনুই পর্যন্ত হাতদুইটি ভূমিতলে স্থাপন করিল। তারপর খেঁকীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া থুত্‌নী বাড়াইয়া বিকট এক শব্দ করিয়া উঠিল। খেঁকী উহার মধ্যে নিজের স্বরূপ দেখিয়া পিছাইয়া গেল। কিন্তু ভজার পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার আক্রমণোদ্যত হইল। ভজা তাহার দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার পূর্বকার্যের অনুকরণ করিল। খেঁকী রণে পৃষ্ঠভংগ দিল।

তাহাদের দ্বিতীয় মিলন এইরূপ বিয়োগান্ত।

ইহার পর কিছুদিন কাটিয়া যায়। খেঁকী সম্ভবত খেঁকীদের দলেই মিশিয়া বেড়ায়, ভজার সংগে সংঘটিত একরাত্রির এক ঘটনাকে হয়ত তাহার মনেও নাই। সমব্যবসায়ীদের সংগে কাগজের কুচি কুড়াইতে কুড়াইতে খেকীর কথা ভুলিয়া যাওয়া ভজার পক্ষেও হয়ত অসম্ভব নয়।

হিটলার প্রতিবেশীদিগকে আক্রমণ করার সংগে সংগে বাংলাদেশে কাগজের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। কুড়ানো কাগজের

কুচির চাহিদাও বাড়িয়াছে। ভজার ও তাহার সমব্যবসায়ীদের আর অবসর নাই।

জৈষ্ঠ্যের দুপুরে রোদের বাড়াবাড়ি—রাস্তার কলগুলির জলে আগুন লাগিয়াছে। ভজার দল খোলা রোদে একটি কলের পাশে বোঝা নামাইয়া সেই জলই পান করিল। অন্যান্যেরা মাথায় নিজ নিজ বোঝা উঠাইয়া ভজার দিকে চাহিয়া দেখে, সে এক তেলে-ভাজা-ওয়ালার ডালার প্রতি তন্ময় হইয়া চাহিয়া আছে।
পঁয়ত্রিশ বছরের ভজা খাবার দেখিলেই পাঁচ বছরের বালকটি হইয়া যায়।

চকিত হইয়া মাথায় বোঝা উঠাতেই দেখে একদল কুকুর মন্থর গতিতে ফুটপাথের রৌদ্র অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে খেকীকে সে অনায়াসেই চিনিয়া লইল। সহযাত্রীদিগকে চমকিত করিয়া ভজা মাথার মোট ফেলিয়া দিল—কুকুর-বাহিনীর সম্মুখে গিয়া চলমান খেকীর কাছেই গোড়ালী-অবধি কোমর নীচু করিল, কনুই-অবধি হাতদুইটি প্রসারিত করিল তারপর সমস্ত কুকুর জাতিটাকে ব্যংগ করিয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—ঘেউ। খেঁকী কী ভাবিল জানিনা। হতভম্ব অন্যান্য খেকীদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখেই সে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিকটবর্তি সরুগলির ভিতরে আত্মগোপন করিল। 'অন্যান্য খেকীদের কেহই তাহার পশ্চাতে ধাওয়া করিয়া আসিল না, বা ভজার দিকেও কথাটি বলিল না—তাহাদের অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ।

যুদ্ধহেতু দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। লোকের কর্মব্যস্ততাও বাড়িয়াছে। সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যা অনেক আগেই কমিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে পরিত্যক্ত অব্যবহার্য কাগজেরও শেষে অভাব হইয়া উঠিল—ভজার সমব্যবসায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে।

অদ্বৈত মল্ল বর্মন

দীপ্ত দুপুরে দমকা বাতাস যেন কোন্ সুদূর দেশের আকুলতা জানাইয়া দিয়া যায়। হিট্‌লার হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আয়ত্তে আনিয়া প্যারিস আক্রমণ করিয়াছে—মিত্রপক্ষের জয় ঘোষণারত খবরের কাগজগুলিতে পাবলিক আর মৈত্রীর সন্ধান খুজে না। এক পয়সার টেলিগ্রাফের উৎপাত কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। জনমনের নিভৃত কন্দরে একটি কথা অনুক্ষণ অনুকরণ দিয়া যায় যদি বোমা ফাটে। নিবিড় শীতের সর্পস্পর্শের মতই কানের ভিতর দিয়া হাড়ে একটি করাল শিহরণ জাগায়—তাহা হইলে না জানি কেমন হয়। তাহা ছাড়াও আছে অদূর ভবিষ্যতের উদর চালানোর চিন্তা। রাস্তায় আর কাগজের কুচি পাওয়ার উপায় নাই। এক টুকরা কাগজ দেখিলে তিনজনে কুড়াইবার জন্য হাত বাড়ায়। ভজার সমব্যবসায়ীদের অনেকেরই ভাত উঠিয়াছে। যাহাদের উঠিয়াছে তাহারা সাংপ্রতিক উপবাসকে বরণ করিয়া কার্যান্তরে আত্মনিয়োগের চেষ্টায় আছে। ভজা তাহা পারে নাই, তাই অসহায়ের শেষ পথ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া সে আর গত্যন্তর দেখিল না।

সার্ধদিবসের গলাবাজির ফলে একটি পয়সা সে পাইয়াছে। হয়ত তাহাও পাইত না। হাজারখানেক লোকের কাছে হাত পাতিয়া একই উত্তর সে পাইয়াছে। কিন্তু হাজার লোকের মধ্যে ভিন্ন প্রকৃতির দুইএকটা লোকও অন্ততঃ আছে বলিয়াই ভজার দল টিকিয় থাকে।

পশ্চিমা লোক হইলে এক পয়সার ছাতু ও তিনঘটি জল খাইয়া দিন কাটাইয়া দিত। বিলাসী ভজা ঢুকিল তেলেভাজার দোকানে।

সেই দোকানেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে খেঁকীর সংগে দেখা হইয়া গেল।

খেঁকীর চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। না খাইতে পাইয়া হাড়পাঁজরাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অস্বাভাবিক তেজবিশিষ্ট চক্ষু দুইটিতে অকারণ কষ্ গড়াইতে গিয়া শুকাইয়া দাগ পড়িয়াছে। দোকানের ছাঁচে খাবারের এঁটো টুকরীগুলি সে অলসভাবে শুকিতেছিল।

বুভুক্ষু সংসারের পরিতৃপ্ত বলিয়া কিছু নাই। দোকানের মাইনেকরা বালক মালিকের চক্ষু বাঁচাইয়া একখানা জিলিপী মুখে পুরিবার জন্য একটি কেরোসিনকাঠের বাক্সের আড়ালে মাথা গলাইল।

নোংড়া সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াইয়া খেঁকী হরিজনের মত ব্যাকুলচোখে ভজার দিকে একবার তাকাইয়া চোখ নত করিল। হাতের কাছেই একখানা তক্তার উপর মোটা মোটা একতাল রুটি। অন্যমনস্কতার ভান ও কনুইএর এক ধাক্কা—রুটির কাঁড়ি ড্রেনে গড়াইবার পূর্বেই সন্ধানী খেঁকী মুখ বাড়াইয়া তালশুদ্ধ রুটি লইয়া নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল। কয়েকটি মিষ্ট সম্ভাষণের অধিক কিছু ভজার ভাগ্যে ঘটিলনা অবিলম্বে সে খেঁকীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

খেঁকীর ভয় ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। অভিজ্ঞ সে। বুভুক্ষু স্বগোত্রের সতর্ক দৃষ্টি আর ভিখারীদলের কাড়াকাড়ি সবকিছু বাঁচাইয়া সে বিলাতী কবরের দেওয়াল ঘেষা এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসিয়া পড়িল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভজা গিয়া দেখে সে কুণ্ডলী পাকাইয়া কোলের মাঝে রুটিগুলি লুকাইয়া একখানা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে।

মানুষের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য জীবনে ভজা অনেক পাইয়াছে। অবস্থা বিপর্যয়ে মানুষ তাহাকে পর করিয়াছে। এখন ইতর জীবের সংগে বন্ধুত্বে তাহার আপত্তি নাই ক্ষুধার্ত সে, পরম আগ্রহে অগ্রসর হইয়া খেঁকীর কোলের কাছে তাহার ব্যাকুল হাতখানা বাড়াইল। খেঁকী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া এমন ভাব দেখাইল যেন লুণ্ঠিত মালের অংশ

দিতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়। সে একখানা থাবা উঠাইয়া মুখব্যাদন করিয়া নখ ও দাঁত দেখাইল এবং মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া অসন্তোষ জানাইল। জোর জবরদস্তি করিলে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হইবে বুঝিয়া ভজা পৃষ্ঠভংগ দেওয়াই শ্রেয় মনে করিল।

অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত। ভজা খেঁকীর নিকট হইতে এতখানি দুর্ব্যবহার আশা করে নাই। তাই খেঁকীর ব্যবহারটা তাহার মাথায় দাগ কাটিয়া বসিয়া গেল। সেদিন আর সে কিছু খাইবার চেষ্টাও করে নাই। খেঁকীর উপর একটা পৈশাচিক আনন্দ-পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

উক্ত ঘটনার পর খেঁকীর সংগে যতবারই রাস্তায় দেখা হইয়াছে—কটিদেশ গোড়ালির নিকট আনিয়া, কনুই পর্যন্ত হাতদুইটা ভূমিতলে স্থাপন করিয়া ভজা কেবল খেঁকীকে ভয়ই দেখাইয়াছে। খেঁকী প্রথম প্রথম নীরবেই সরিয়া গিয়া দাঁড়াইত—তাহার শীর্ণ চেহারাতেও এই ভাব ফুটিয়া উঠিত যেন ভজার নাটুকেপনাতে সে বরং কৌতুকই উপভোগ করিয়াছে। এবং ইহাও সে বুঝিতে পারিত বলিয়া মনে করিত যে, ভজাও তাহার সহিত নেহাৎ কৌতুক ভিন্ন আর কিছুই করিতেছে না। কিন্তু রৌদ্রঝলকিত দ্বিপ্রহরে ঘর্মাক্তকলেবর ভজা যখন খেঁকীর দেখা পাওয়া মাত্রই মাটীতে বসিয়া তাহাকে অভ্যস্ত উপায়ে ভয় দেখাইত, আবার সন্ধ্যার ছায়ালোকে ভজা যখন খেঁকীর প্রতি পূর্বোক্ত উপায়ে ভয় দেখাইয়া বিকৃত কণ্ঠে 'ঘেউ' করিয়া উঠিত খেঁকী তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইত, এতো নেহাৎ খেলা নয়—ঠাট্টা নয়—ভজার চোখদুইটা অস্বাভাবিক তীব্রতায় ঝলসাইয়া উঠিতেছে—দাঁতগুলি কড়্ কড়্ করিয়া মানবিকতার সীমা অতিক্রম করিতেছে। সে তখন ক্ষণমাত্র ভজার হিংস্র

চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া ভয়ে ছুটিয়া পলাইত। তাহাকে পুনরায় ভয় দেখাইবার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিতে ভজাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত।

ক্রমে ভজার অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, খেঁকীকে সে দিনমানে কয়েকবার ভয় দেখাইতে না পারিলে সে যেন উপবাস থাকিত। সারাদিন সে এতটুকু সোয়াস্তি পাইত না। সে অস্থির হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিত।

খেঁকীর দিনরাত্রির শান্তি যেন ভজা চুষিয়া খাইয়াছে। ভজার এ কয়দিনের অত্যাচারে খেঁকী আরও শুখাইয়া গিয়াছে। পথ চলে সে সন্তর্পণে—পাছে ভজার সংগে মুখোমুখী হয়। পথ চলিতে ভজার ছায়ামাত্র দেখিলে খেঁকী ছুটিয়া পালায়। আবার, খেঁকীর ছায়ামাত্র দেখিলে ভজা তাড়া করিয়া যায়—দৌড়াইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া আসে। ক্রমে খেঁকীর সহনশক্তি সীমা অতিক্রম করিল। রাস্তায় বাহির হওয়াই সে বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ভজা তাহাকে বৃথাই খুঁজিয়া মরে।

এই বিপুল জনারণ্যে কাহারও মাথা ভাঙিলে জানিবার লোকের অভাব হয় না—কিন্তু কাহারও বুক ভাঙিলে, সে খোঁজ কেহই রাখে না। মনের দিক দিয়া শুখাইতে শুখাইতে যাহার দেহ কাঠ হইয়া যায়—অনাহারের দোষই তাহার প্রতি আরোপিত হয়, কিন্তু না খাইয়া মরার অপেক্ষা সে তো আরও সাংঘাতিক।

এই দুইটি প্রাণীর জীবন-পথে চলার ইতিহাস নিতান্ত তুচ্ছ। তাই আর মাত্র একটি দিনের কাহিনী বলিয়া এ গল্পে ছেদ টানা যায়।

সেদিন সকালে একবার ও দুপুরে দুইবার ভজার নিকট হইতে অমানুষিক তাড়া খাইয়া শ্রান্ত খেঁকী ভজার জ্বলন্ত চোখ দুইটি এড়াইবার জন্য একদিকে ছুটিয়া চলিল। বড় বড় দুইতিনটা রাস্তা ছাড়াইয়া

সে এক বড়লোকের বাড়ির বাড়তি ভূমিতে কতকগুলি আগাছার আড়ালে আত্মগোপন করিল। একটুখানি ছায়া—একটুখানি ঝির্ ঝিরে বাতাস। সে আর পারে না—শ্রান্ত সে, সে চায় নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম।

অনেক রাস্তা খুঁজিয়া সন্ধ্যার কিছুপূর্বে ভজা খেঁকীর দেখা পাইল। এবার খেঁকী উঠিলনা, ভাষাহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ভজার চোখ-দুইটির দিকে।

ভজা পৈশাচিক ব্যগ্রতায় আগাইয়া আসিল। দৈহিক অসামর্থ খেঁকীর মস্তিষ্ককে গরম করিয়া দিল। মগজ বুঝি আর তাহার বুদ্ধি-বৃদ্ধির আয়ত্তে থাকিতে চাহে না।

খেঁকীর চোখদুটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল, ঢুকিয়া পড়িল,—এক অস্বাভাবিক মাদকতায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল—এবার সত্যসত্যই তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল এবং ভজা তাহার স্বাভাবসিদ্ধ মূর্তিতে বসিয়া 'ঘেউ' করিবার পূর্ব্বেই খেঁকী উঠিয়া একলাফে পথে নামিল এবং সম্মুখের এক পথবাহী যাত্রীর পা কামড়াইয়া দিয়া মধ্যরাস্তা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল।

পরদিন সন্ধ্যায় একটি কুকুরের মৃতদেহের চারিপাশে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছিল। বীরবরদের লাঠির আঘাতে কুকুরটির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, জমাট রক্ত তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। জিহ্বাটা অনেকখানি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। একখানি লোহার শলার খানিকটা চক্ষুকে ফুঁড়িয়া দিয়াছে। রণজয়ের আনন্দে গর্বিত লোককয়টির একজন উৎসুক জনতাকে বলিতেছে, মশায়, এ কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়েছিল, অনেক লোককে কাম্‌ড়ে দিয়ে তবে ব্যাটা নিজে মারা পড়ল।

ক্ষুদ্র জনতার এক কোণ ভাঙিয়া ভজাও আগাইয়া আসিল। ঘেঁকীকে চিনিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। প্রথমে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, যেন তাহার প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে— ভাবে সে জ্ঞানহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িতে পড়িতেও সামলাইয়া লইল। তারপর বিস্মিত স্তম্ভিত জনতাকে ভাবিবার অবসর না দিয়া সে ঘেঁকীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে চলিয়া গেল। কেহ বাধা দিল না, কেহ কিছু বলিলও না।

জনতার মধ্য হইতে একজন হিন্দুস্থানী আধাবাংলায় শুধু বলিল, এ ভি পাগল হোয়ে গেছে।

আগুন

লীলাময় বসু

লীলাময় বসু : জন্ম—তেরশ' আঠার সালে হুগলি জেলায়। পৈতৃক বাসস্থান—চন্দননগর। ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন কলিকাতায়। বর্তমানে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

ট্রেনের শার্সির গায়ে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা, বাতাসের আর্দ্র কাৎরানি। বাইরে যতদূর দৃষ্টি যায়—মাঠভরে সূচীমুখী বৃষ্টির দানবীয় উৎফুল্লতা। আবহাওয়া বুঝে সৌমিত্রি একটা সিগ্রেট ধরালে। এসময়ে সিগ্রেট ছাড়া অন্য কোন কিছু সহায় বা সংগী হতে পারে না সিগ্রেটের ধোঁয়ার স্তম্ভ ছেড়ে ছেড়ে ফাঁকা মনকে ব্যস্ততায় ভরিয়ে তুললে। এধারে যাত্রীদের আলাপ আলোচনার একঘেয়েমিত্ব—অনেকটা কেটে গেছে। কুণ্ডলাকৃতি একরাশ ধোঁয়াড়েছেস সৌমিত্রি চিঠির কথা ভাবতে থাকে—জয়ন্ত জানিয়েছে শিকারের পক্ষে এই উপযুক্ত সময়। মাছ ধরার কোন অসুবিধা ঘটবে না। না এসে যেন কোন অজুহাত না দেখাই। একমাসের জন্যে এখানে না এলে তোমার পক্ষে খুবই বোকামি হবে। তাছাড়া এখানে একজন রিটায়ার্ড সাব্‌জজ আছেন, খুব সুন্দর লোক, তোমায় পেলে খুব খুসী হবেন। এখানে এলে তাঁর বিষয়ে আরো অনেক কিছু জান্‌তে পার্‌বে।

ট্রেন চলেছে, বৃষ্টিস্নাত হয়ে, সবুজ মাঠ চিরে। লাইনের দুপাশে চিক্‌চিকে জলাশয়। আর সেই চিকনতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটার নর্তন। ট্রেন ছুটে চলেছে স্‌টেশনের পর স্‌টেশন পেরিয়ে। সহরের কোলাহল ছেড়ে সৌমিত্রি চলেছে গ্রাম্য জীবনের অসহ্য একঘেয়েমিতার মধ্যে।

খানিক পরেই ট্রেনটা ক্রুদ্ধ জন্তুর মত গর্জন কর্‌তে কর্‌তে

এসে স্টেশনে থেমে ক্লান্তভাবে হাঁপাতে লাগ্‌লো। সমস্ত স্টেশনটা পরমুহূর্তে ব্যস্ততার চাঞ্চল্যে হয়ে উঠ্‌লো মুখর।

সৌমিত্রি ট্রেন থেকে নাম্‌লো। প্লাট্‌ফর্মের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অব্দি দৃষ্টি চালিয়েও সে জয়ন্তকে দেখ্‌তে পেলো না। এমন কি কোন পরিচিত মুখও তার দৃষ্টিপথে এলো না।

এমন সময়ে রেন্‌কোট পরা একটী স্মার্ট মেয়ে এগিয়ে এসে নিশ্চিন্ত সহজ গলায় শুধোলে: আপনার নাম কি সৌমিত্রি বোস্?

বিস্ময়ে সৌমিত্রি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে পরে বল্‌লে: এটা কি আপনি অনুমান করে বল্‌ছেন, না—

—দেখুন, একটা হাসি ফুটিয়ে মেয়েটী বল্‌লে: সেকেণ্ড ক্লাস আরোহী হয়ে আপনি আসবেন—জয়ন্তদা একথা বলেছে। তারপর ছবিও দেখা আছে।

সৌমিত্রি একটু হেসে বল্‌লে: তাহলে আপনি জয়ন্তর প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন।

—তিনি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। সত্যই আমি দুঃখিত যদি আপনি হতাশ হয়ে থাকেন।

—মোটেই না। মেয়েটীর সুন্দর কাল চোখের নমনীয়তা লক্ষ করে সৌমিত্রি একটা হাসি ফোটালে: তাছাড়া আপনি আমার বন্ধুর বন্ধুনী!

—আমি গীতারই বন্ধু!

—জয়ন্ত তো আপনার হাসির অংশ পায়। এখন দেখছি, আমার গ্রামের ডাক্তার হওয়া উচিত ছিল আর বিশেষ করে এইখানে প্র্যাকটিশ্‌ করা।

পরমুহূর্তে মেয়েটী ঘুরে দাঁড়ালো, বল্‌লে: চলুন তাহলে, এখানে দাঁড়িয়ে কুলীদের আগ্রহ বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে যে আমার জন্যে এতটা কষ্ট করে এসেছেন ?

সুটকেশটা হাতে নিয়ে মেয়েটীর সংগে সৌমিত্রি স্টেশনের বাইরে এসে পড়্‌লো। আর খানিকটা এগিয়ে প্রতীক্ষমান মোটরে উঠে চালকের জায়গায় তারা পাশাপাশি বস্‌লো।

মোটর ছুট্‌লো গ্রামের পথে। কঠিন লাল মাটির পথ। দুপাশে সবুজ ধানক্ষেত মাটির শ্যামল স্নেহ যেন। মেঠো হাওয়ার সংগে পাল্লা দিয়ে মোটর ছুটেচে। চারিধার ছেয়ে একটা সুগন্ধশ্বাস।

একসময়ে মেয়েটী বল্‌লে: মোটর ড্রাইভিং অলস মনের একটি টনিক্‌। এখন নিজেকে বেশ সতেজ মনে হচ্ছে।

সাহস করে সৌমিত্রি বল্‌লে: এ বিষয়ে আমারও ওই মত। দুটী পৃথক মন কিন্তু চিন্তা এক, এটা বেশ প্রমিসিং নয় ?

ঈষৎ স্টিয়ারিং নেড়ে মোড় ঘুরে মেয়েটী বল্‌লে: কোন বিষয়ে ?

—এই আমাদের বন্ধুতার ব্যাপারে। সাধারণ কোন একটা জিনিষ নিয়ে আরম্ভ করা ভাল।

সৌমিত্রি পুনরাবৃত্তি কর্‌লে: আপনার পিতাই কি এখানকার রিটায়ার্ড সাব্‌জজ। জয়ন্ত একথা লিখেছিল বটে।

—তিনি যে রুগ্ন নিশ্চয়ই জয়ন্তদা একথা জানিয়েছেন। মেয়েটী বল্‌লে।

—তাহলে আপনার ওপরই তাঁর দেখাশুনার ভার।

—হ্যাঁ, তাঁকে নিয়েই আমাকে একরকম ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। কারো সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি ওঠা বসা কর্‌তে পারেন না।

মাঝারি গোছের একটা বড় বাড়ীর সাম্‌নে এসে মোটর থাম্‌লো।

মেয়েটী বিনীত ভাবে বল্‌লে: এই জয়ন্তদার বাড়ী।

আগুন

সৌমিত্রি মোটর থেকে নেমে দাঁড়ালো।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে মেয়েটা বল্‌লে : নমস্কার সৌমিত্রি বাবু। পরে আবার দেখা হবে আশা করি। বলে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সৌমিত্রি চল্‌লো লাল কাঁকর ঢালা রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দুপাশে মরসুমী ফুলের গাছ। বাড়ীর কোল ছুঁয়ে সবুজলন।

সৌমিত্রি ড্রইংরুমে এলো। সেখানে দাঁড়িয়ে সে ডাক্‌লে : বৌদি ভেতরে যেতে পারি কী?

ডাক শুনে গীতা বেরিয়ে এলো : এসো ঠাকুরপো, গাইড্‌টী গেল কোথায়?

—আমাকে বাড়ী চিনিয়ে দিয়ে সরে পড়্‌লেন।

—পীড়িত বাপকে নিয়ে বেচারী মহামুস্কিলেই পড়েছে।

সেই সময় জয়ন্ত ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লে : মুস্কিলটা আবার কী হলো? তবু ভাল কম্প্যানি তো ও এখানে পাবে। পরে সৌমিত্রির দিকে চেয়ে বল্‌লে : কেমন লাগ্‌ছে বল্?

—সুন্দর! সৌমিত্রির গলা আবেগে ঝংকৃত হলো। এ জায়গার চেয়ে যে-মেয়েটীকে পাঠিয়েছিলে তাকে আরো ভাল লাগ্‌লো।

—বেশ জায়গায় আছিস্ জয়ন্ত! হ্যাঁ, মেয়েটী কি তার বাপের সংগে এখানে একলা থাকে?

—কে জ্যোৎস্না? মেয়েটাকে তাহলে তোর বেশ ভাল লেগেছে বুঝ্‌তে হবে।

—এ এমন কোন কারণ নয় যে তুমি এরকম একটা মন্তব্যে লাফিয়ে পড়্‌বে। সাধারণদের সংবন্ধে আমার একটা কৌতূহল আছে।

—যদি আমার ড্রাইভার্ পাঠাতাম তাহলে তার প্রতি এই কৌতুহলটা দেখাতে? থাক্‌গে, এখন জামা কাপড় ছেড়ে ফেল্?

সৌমিত্রিকে নিয়ে গিয়ে জয়ন্ত একটা ঘর দেখিয়ে দিলে।

জয়ন্ত বললে: তোর যা কাজ সেরে নে। ইতিমধ্যে আমি একটা কল্ সেরে আসি।

সেদিন জ্যোৎস্নার কথা সৌমিত্রি আর মোটেই তুললো না। চায়ের টেবিলে বসে তাদের আলোচনা চললো গ্রাম্য জীবন নিয়ে, পুরানো বন্ধুদের বিষয় আলোচনা করে, গ্রামের একঘেয়েমি নিয়ে, আর শহরের বিচ্ছিন্ন আনন্দের টুক্‌রো নিয়ে। সমস্ত সময় কিন্তু সৌমিত্রির চোখ পড়ে রইলো টেবিলের ওপর রাখা জ্যোৎস্নার ছবির ওপর।

—ভাল কথা, জয়ন্ত বললে: কাল তাহলে শিকারে যাচ্ছো তো?

—এখান থেকে কতদূর?

—বেশীদূর নয়, বাস্‌এ করে তুমি সেখানে যেতে পারো। তারপর চারটের সময় তোমাকে তুলে নিয়ে আস্‌বো।

—ওই চারটে অব্দি আমাকে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হবে। ওরকম শিকারে কোন দরকার নেই।

—শিকারে তো তোর আগে খুব ঝোঁক ছিল।

—এতটা নয়।

—বেশ। তাহলে এই গ্রামের পাশে একটা জলা আছে। সেখানে ঘুরে দেখ্‌তে পারো। রাত হয়েছে আজ শুয়ে পড়্। বলে জয়ন্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন রাস্তায় জ্যোৎস্নার গাড়ী যেতে দেখে সৌমিত্রি পাশের বন থেকে বেরিয়ে এলো।

সৌমিত্রিকে সাম্‌নে দেখে জ্যোৎস্না মোটরের ব্রেক্ কষ্‌লো।

—সুপ্রভাত, সৌমিত্রি বললে।

—সুপ্রভাত। এত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন ব্যাপার কী?

—কিছু না, এমনি শিকারে বেরিয়েছি।

—শিকারে বেরিয়েছেন তো আপনার বন্দুক কই?

সৌমিত্রি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো: গুড্‌ হেভেন্‌স!

কব্জি-ঘড়ির দিকে চেয়ে জ্যোৎস্না বল্‌লে: আমাকে এখুনি যেতে হবে, পাশের গ্রামে একটু দরকার আছে।

—ভালোই হলো, চলুন আপনার সংগে পাশের গ্রামটা দেখে আসি।

—বেশ আসুন। বলে জ্যোৎস্না মোটরের দরজা খুলে দিলে।

মোটর ছুট্‌লো গ্রামের পথ ধরে, তাদের মধ্যে বয়ে চল্‌লো স্তব্ধতার স্রোত। হাওয়ায় মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নার রুক্ষ চুলগুলো এসে সৌমিত্রির চোখে মুখে উড়ে পড়ছিলো। সৌমিত্রি বসে বসে জ্যোৎস্নার চুলের গন্ধ প্রাণভরে টান্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ একসময় জ্যোৎস্না সলজ্জ হেসে বল্‌লে: আপনি কী বিনা বন্দুকে শিকার করেন?

—হ্যাঁ, কতকটা সেইরকম বটে।

—আপনার তো বড় ভুলো মন। হাসিতে জ্যোৎস্নার ঠোটদুটো ভরে উঠ্‌লো।

জ্যোৎস্নার মুখের ওপর একবার দৃষ্টি ফেলে পরে নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে: আপনার দেখা পাব বলে বিনা বন্দুকে গ্রামের মধ্যে শিকারে বেরিয়েছিলুম।

জ্যোৎস্নার মুখচোখ লাল হয়ে উঠ্‌লো।

সৌমিত্রি পুনরাবৃত্তি করলে: কাল সমস্ত রাত শুধু আপনার কথা ভেবেই কেটে গেছে।

জ্যোৎস্না বাধা দিলে: অন্য কিছু আলোচনা করা যাক্‌। বড় একঘেয়ে ঠেকছে—।

সৌমিত্রি বল্‌লে : মাসখানেক এখানে থাকবো মনে করছি, সেই ক'টাদিন আপনার কম্প্যানি পেলে বড় সুখী হবো।

—দুঃখিত। আপনার কথা বোধ হয় রাখ্‌তে পারবো না। গ্রামে এরকম অবাধ মেলামেশা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

—গ্রাম একে বলা চলেনা, সহরের সুবিধে এখানে যথেষ্ট ভোগ করছি।

জ্যোৎস্না মোটর থামিয়ে দিয়ে বল্‌লে : আমার পিতার কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাক্‌বেন, বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকদের মন সন্দেহে পূর্ণ। যদি তিনি একটা মন্দ ধারণা করে বসেন। তিনি বড় রাগী লোক। যদি কোনরকমে মেলামেশার খবর পান তাঁর যে কী অবস্থা হবে জানিনা।

—তিনি জান্‌বেন কী করে?

—এরকম একটা গ্রামের মধ্যে কোন বিষয়ই ঢাকা থাকেনা। তাছাড়া তিনি আমার প্রতিপদক্ষেপে বোঝেন।

—অন্য ব্যবস্থা করলেই হয়। আমরা রাত্রে মিলিত হতে পারি।

জ্যোৎস্না কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্‌লে : বেশ, আজ অদিমকালের অভিসারে বেরুবো—।

—সত্যিই বলছেন ?

—আজ রাত্রি আট্‌টার সময় আপনি আস্‌ছেন তো?

—ধন্যবাদ। সৌমিত্রি গাড়ী থামাতে বল্‌লে। মোটর থেকে নেমে সৌমিত্রি বল্‌লে : এবার আপনি আপনার কাজ সেরে আসুন।

—আপনি এখান থেকেই বাড়ী ফিরবেন।

—এটুকু পথ বেশ চলে যেতে পারবো।

সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে নানা আলোচনার পর সৌমিত্রি বল্‌লে : মিস্ রায় তো একটা নার্স রাখলেই পারেন?

—জ্যোৎস্না তা পছন্দ করে না। পরে জয়ন্ত বল্‌লে : জ্যোৎস্না তার পিতাকে যথেষ্ট ভালবাসে ও ভক্তি করে। জ্যোৎস্নার মত অত সরল মেয়ে তুমি দেখ্‌তে পাবে না। যদিও সে বোঝে না—তার পিতার সত্যই কোন অসুখ আছে কী না!

—তাহলে তুমি বল্‌তে চাও, তাঁর কোন রকমের ব্যাধি নেই।

—যদিও আমি তার বাড়ীর ডাক্তার নই, কিন্তু একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি, তাঁকে যে ডাক্তার দেখে, সে শুধু মোটা ফী নিয়ে নিজের পকেট ভর্তি করে আসে।

—এ তুমি কী বল্‌ছো? সৌমিত্রি বল্‌লে।

—ওটা অসুখের ভান। মতলব এই—জ্যোৎস্নাকে একটা কর্তব্যের মধ্যে আট্‌কে রাখা। কারণ, এই জ্যোৎস্না আগে একবার প্রেমে পড়েছিল বিয়ের সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে মিঃ রায় হৃদরোগের ভান করে বিছানা নিলেন। পরে ছেলেটা একটা অন্য মেয়েকে বিয়ে কর্‌লো। সেই থেকে মিঃ রায় অসুখের ভান করেই আছেন।

—একথা তুমি জ্যোৎস্নাকে জানাওনি কেন?

—অসম্ভব। সাধারণ ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে তো!

টেবিলের টাইম্‌পিস্‌-এর ওপর নজর ফেলে সৌমিত্রি উঠে দাঁড়ালো।

জয়ন্ত জিগ্যেস করলে : কোথায় চল্‌লে?

—জ্যোৎস্নার সংগে আমার এই আটটার সময় দেখা করবার কথা আছে। বলে সৌমিত্রি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফটকের সাম্‌নেই কিন্তু জ্যোৎস্নার সংগে দেখা। সৌমিত্রি বল্‌লে মিস্‌ রায়, আপনার ভয় করছিলো না একা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে?

—ভয় শুধু, আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে বাবা আবার মাথা খারাপ করে না বসেন।

—মিস্ রায়, আপনার বাবার জন্যে তো একটা নার্স ঠিক করলে পারেন।

—অন্য লোক দেখলে তিনি আরো রেগে ওঠেন। আমি ছাড়া অন্য কারো সেবা তিনি পছন্দ করেন না। আমাকে দেখতে না পেলে তিনি যেন আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন।

—আচ্ছা, সৌমিত্রি দৃঢ় গলায় বললে: মনে করুন, তিনি বেশ সেরে উঠেছেন। আর যদি কালই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে কী আশা করতে পারি?

—আপনি যা চাইবেন!

—ধরুন, যদি আপনাকে চাই, তার কী-ব্যবস্থা করবেন।

—কেন, একটা অনুষ্ঠান করে বিয়ের তোড়জোড় লাগিয়ে দেব।

—বেশ! সৌমিত্রি গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল: তিনি বেশ সুস্থ আছেন এ আমি বেশ জোর করে বলতে পারি। আজ থেকে সাতদিনের মধ্যেই আপনাকে দেখিয়ে দেব তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারেন।

—কিন্তু আপনি তো ডাক্তার নন!

—টোট্‌কা ওষুধ ডাক্তারে দিতে পারে না।

—তা হতে পারে। কিন্তু আপনি রোগী না দেখে ওষুধ দেবেন।

সহজ গলায় সৌমিত্রী বললে: রোগী দেখবার আমার দরকার করে না। আমার কাজ তাঁকে সুস্থ ও সবল করে তোলা। দেখিয়ে দেব, তিনি কেমন হেঁটে বেড়াতে পারেন। আর তাড়াতাড়ি একাজ চুকিয়ে ফেলাই ভাল।

—সৌমিত্রি বাবু, এ যে একটা রহস্য গোছের মনে হচ্ছে।

—এ আর এমন কী আশ্চর্যের ব্যাপার! আপনাকে জ্যোৎস্না

বোস-এ রূপান্তরিত করবার জন্য আমি অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারি।

—একটাই যথেষ্ট। রাত হয়ে গেল। চলি সৌমিত্রিবাবু। বলে জ্যোৎস্না অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সৌমিত্রি ছুটলো ঘরের দিকে। অনুভব করলে কী যেন একটা ভারি দায়িত্ব সে ঘাড় পেতে নিলে। সাত দিনের মধ্যে মিঃ রায় শারীরিক ক্ষমতার বলে বেড়াবে এ দায়িত্ব সে নিয়েছে।

সেই মুহূর্তেই তার গতি গেল বেড়ে। প্রতিটী মুহূর্ত এখন তার কাছে মূল্যবান। বাড়ীতে এসে সৌমিত্রি একেবারে বিছানায় আশ্রয় নিলে। কারো সংগে আর সে দেখা করলে না। তারপর একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে টেবিলে বসে চা খেতে খেতে গীতা বললে: ঠাকুরপো, আজ তোমাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই কাল তোমাদের কোন আনন্দের মুহূর্ত গেছে।

জয়ন্ত বললে: সৌমিত্রি, হঠাৎ আজ রহস্যময় হয়ে উঠো না।

গীতা বললে: তোমাকে যেন আজ একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে। কী হয়েছে তোমার, জ্যোৎস্না নিশ্চয় কোন আভাষ দিয়েছে।

সৌমিত্রি বেশ সহজ গলায় বললে: একটা সাফল্য দেখিয়ে খুব শিগগির জ্যোৎস্নাকে লাভ করবো।

—মানে? সমস্বরে গীতা ও জয়ন্ত বলে উঠলো।

—আমাদের বিয়ে।

জয়ন্ত বললে: তুমি বলতে চাও তার বুড়ো বাপকে ছেড়ে আসতে জ্যোৎস্না রাজি হয়েছে।

—এই সর্তে, সৌমিত্রী বল্‌লে : যদি সাত দিনের মধ্যে মিঃ রায়কে সুস্থ ও সবল করে দিতে পারি।

—তাহলে তুমি এমন কিছু কর্‌ছো যা ওধুধের নাগালের বাইরে।

—হঁ্যা, ভাল কথা। আমাকে কাহন তিনেক্ খড় যোগাড় করে দিতে হবে।

গীতা জিগ্যেস্ কর্‌লে : এই খড় তোমার ওষুধের কাজ কর্‌বে না কী!

—এতো একটা অংশ গেল। বাকি অংশ হচ্ছে একজনকে দিয়ে মিঃ রায়কে সংবাদ পাঠানো।

গীতা বল্‌লে : তোমার মতলবটা কী বলতো?

—যদি আগে থাকেতে বলি প্ল্যান্ নষ্ট হয়ে যাবে। আর আজ বিকেলেই তা দেখ্‌তে পাবে। বলে সৌমিত্রি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত তুপুরটা গীতা ভাব্‌লে, খড় নিয়ে সৌমিত্রী কী কর্‌বে। বাড়ীতে আগুন লাগাবার অভিসন্ধি তার আছে না কী? আর একটা বাড়ী থেকে পাঁচটা বাড়ীতে যে আগুন ছড়িয়ে পড়্‌বে। ভয়ে গীতা শিউরে উঠ্‌লো—সৌমিত্রি কী নিজের সাধারণ বুদ্ধিটুকু হারিয়ে ফেলেছে? সামান্য একটা মেয়ে একজন পুরুষকে এমনি দানবীয় করে তুল্‌তে পারে! না, আজই সৌমিত্রিকে এখান থেকে চলে যেতে বল্‌তে হবে।

ঠিক ছ'টা। গীতা আর নিজেকে সামলাতে পার্‌লো না। ছুট্‌লো মিঃ রায়ের বাড়ী। বাড়ীর সাম্‌নে এসে দেখ্‌লে—মিঃ রায়ের বাড়ীর পাশেই আগুন লেগেছে। বাতাস অব্দি সেখানকার তপ্ত হয়ে উঠেছে। আর বৃদ্ধ মিঃ রায় সাধারণ মানুষের মতো ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌ছেন।

গীতা স্তম্ভিত হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

তারপর মিঃ রায় যখন দেখ্লেন আগুন তার বাড়ীর পাশে লেগেছে। তখন তিনি তার দৃষ্টি নিয়ে গেলেন সাম্নে দণ্ডায়মান সৌমিত্রি ও জ্যোৎস্নার ওপরে।

মিঃ রায় দৃঢ় গলায় বল্লেন: জ্যোৎস্না এ ছেলেটী কে?

সৌমিত্রি বল্লেন: আমিও ঠিক আপনাকে ওই কথা জিগ্যেস্ করতে পারি।

মিঃ রায় বল্লেন: আমি এখানকার রিটায়ার্ড সব্জজ!

—তা হতে পারে না, তিনি তো ইন্ভ্যালিড্?

মিঃ রায় চীৎকার করে বল্লেন: বল জ্যোৎস্না, এ কে?

উভয়েই নীরব ও নিরুত্তর।

আজ এই প্রথম মিঃ রায় বুঝ্লেন, সত্যই তিনি অকর্মণ্য।

পাশ থেকে গীতা দৌড়ে এলো: মিঃ রায়, ব্যাপার কী?

মিঃ রায় রেগে চীৎকার করে বলে উঠ্লেন: ওই রাস্কেলটা জ্যোৎস্নাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। গীতা, আমার বন্দুকটা এনে দিতে পারো?

গীতা তখন সৌমিত্রিকে বল্লে: চল ঠাকুরপো, চা খাবে কখন?

আগুনের শেষ শিখাটি তখন আস্তে আস্তে নিভে গেল।